

[illegible]

– [illegible] –

[illegible]

[illegible]





ঘুম ভেঙে ভাবি, রাত্রি রয়েছে—এখনও হয়নি ভোর,
সহসা সমুখে বাতায়ন-ফাঁকে দৃষ্টি মিলিল তোর।
নিমেষে টুটিয়া তন্দ্রা-জড়িমা নবজাগরণ-পথে
পূর্ব্ব-তোরণে ভৈঁরো শুনিনু দিগন্ত-নহবতে।
দীপ্তির দূত, হে নব প্রভাত, স্বাগত জানাই তোরে,
আলোর মন্ত্রে, প্রাণের যন্ত্রে দে রে দে অমৃতে ভরে'।

পার হয়ে আয় অন্ধকারের বন্ধ দ্বারের পথ,
রুদ্ধ কারার বক্ষে হাঁকায়ে মুক্তধারার রথ;
যা-কিছু মন্দ দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব, আত্মবোধের মানা,
ভাঙিয়া সবলে দুর্ব্বলতার দ্বারে-দ্বারে দে রে হানা।
দূর করি' যত উচ্চ-তুচ্ছ লাঞ্ছনা, ক্ষতি, ভয়,
দেশের ললাটে দে রে দেগে তোর টিকা মৃত্যুঞ্জয়!

আয় রুদ্রের দক্ষিণ-দান, শুভাশিস্ বিধাতার,
হে পরম জ্যোতিঃ, মাভৈঃ তোমার শুনাও পুনর্ব্বার।
বলহীনে দাও বলের মন্ত্র, আশাহীনে দাও আশা,
জড়ত্ব-মূঢ় কণ্ঠে জাগাও তোমার বজ্র ভাষা ;
শিখাও তাদের, তোমার বিশ্বে কোথা নাই কারও ভয়,
অমৃতের বরে অমৃত-পুত্র, অমৃতেরই হবে জয়!

সবিতা দেবতা, দয়া করে যদি দিলে ফিরে জাগরণ,
শুনাও তাদের—অধর্ম্ম-সাথে চিরদিন মাগ রণ ;
পাপের আঁধার ক'দিন টিকিবে ? আলোকেরই জয় হবে,
দীপ্ত জগৎ জাগিবে আবার দীপালি-মহোৎসবে।
যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা-কিছু তুচ্ছ, পুড়ায়ে কর তা ছাই,—
যুগ-যুগ-জমা জঞ্জাল যত—ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই।



—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সন্ধে হতেই কুয়াসা। স্টিমার দু'ঘণ্টার উপরে লেট। পারে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। ছাড়বার সময় কখন উৎরে গেছে! কতক্ষণ আর দাঁড়ায় ঠিক কি!

কিন্তু কি আশ্চর্য, একটাও কুলি নেই! তেমন একটা হাঁক-ডাক সোর-গোল পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না! ব্যাপার কি?

হ্যাঁ, সিঁড়ি দিয়েছে কখন! একে-একে নেমে যাচ্ছে যাত্রীরা। অথচ জেটিতে কুলির টিকি দেখা যাচ্ছে না একটাও!

'এ কি, কুলি আসবে না?' নিজের মনে রাজীববাবু প্রশ্ন করে উঠলেন।

'আসবে।' পাশ থেকে বললে কে একজন লোক: 'নিজের মাল নিজে হাতে করে যারা যেতে পারছে, তাদের আগে নামবার পালা। তারা নেমে গেলেই দুদ্দাড় করে এসে যাবে কুলির দল। ওদের সর্দার ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে নেটের কাছে।'

রাজীববাবু ভাবলেন, একটা তো সুটকেস আর বিছানা, নিজেই নিয়ে যাবেন নাকি হাতে করে? পরক্ষণেই ভাবলেন, এত আমিরি করে ফার্স্ট ক্লাশে এসে এখন কুলিগিরি করবেন এটা ভাল দেখায় না।

'কুলি এসে পড়লেই বা কি! যা হাঁকে আজকাল ব্যাটারা!' রেলিঙ-ধরা পাশের লোকটা আবার টিপ্পনি কাটল।

লোকটাকে রাজীববাবুর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। কান পর্যন্ত গোঁফ, কেমন দুষমনের মত চেহারা। যাচ্ছে হয়তো থার্ড কেলাশে, একেবারে দাঁড়িয়েছে এসে ফার্স্ট ক্লাশের গা ঘেঁসে। কি মতলব, কে জানে?

রাজীববাবু বুকের উপর হাত রাখলেন। না, ঠিক আছে।

আপিসের জরুরি কাজে রাজীববাবু কলকাতা চলেছেন। সঙ্গে একটা সাংঘাতিক দলিল। স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে এই হুকুম হয়েছে তাঁর উপর।

শার্টের বুক-পকেটে দলিল। বেশি সাবধান হবার জন্যে শার্টটা উলটো করে পরা। তার উপর গলা-বন্ধ পুল-ওভার। তার উপরে কোট—ওভারকোট। শীত কিংবা চোর, কেউ ছুঁতে পারবে না তাকে।

'একটু যদি দেরি করতে পারেন শস্তায় মিলে যেতে পারে দু'একজন—' গুঁফো লোকটা আবার টিপ্পনি কাটল।

রাজীববাবু সরে গেলেন।

হুদ্দাড় করে এসে পড়েছে কুলির দল।

'এই দিকে, এই দিকে।'

না বললেও আসত প্রথমেই ফার্স্ট ক্লাশের দিকে। এইখানেই খেচাখেচি কম, দরাদরির দরকার হয় না। ভারি হাতে বকশিস মেলে।

'কত নিবি?' ইন্টারক্লাশী অভ্যাস ছাড়তে পারেননি রাজীববাবু।

'পাঁচ সিকে।'

'এই হাল্কা একটা সুটকেস আর বেডিং পাঁচ সিকে? ডাকাতি সুরু করেছিস নাকি আজকাল? নে, চার আনা পাবি।'

'সেই সব দিন আর নেই সাহেব। এখন এক মাথা এক টাকা।' কুলিটা ঘাড় মোটা করে রইল।

না, ট্রেনটা আজ আর ধরা যাবে না। যা থাকে অদৃষ্টে, বিছানাটা বগলে চেপে

ডান হাতে সুটকেস নিয়ে নিজেই চলে যেতে পারবেন। স্বাবলম্বী হবার মত সুখ নেই সংসারে।

সেই নিজেই যদি মোট বইবেন, তবে এত দেরি করতে গেলেন কেন? প্রথম



'ভিক্ষে না করে মোট বইতে পারিস না!' [পৃঃ ৮

ধাক্কাতেই তো নেমে যেতে পারতেন। এত দেরি করে ফেলে এখন ফের কুলি না নেওয়ার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু ট্রেন ওদিকে ছাড়ে!

হঠাৎ ক্যাবিনের পাশে কাতর চেহারার একটা ছেলের দিকে নজর পড়ল রাজীববাবুর। বয়স বারো-তেরো। রোগা, কঙ্কালসার চেহারা। পরনে একটা টেনি। গায়ে একটা ছেঁড়া খোঁড়া আঁচড়ানো-খুবলানো জামা। এতটা শীর্ণ ও কুঞ্চিত, যার পরে আর শীতবোধ বা ক্ষুধাবোধ কিছু থাকতে পারে না।

'ভিক্ষে না করে মোট বইতে পারিস না?' ধমকে উঠলেন রাজীববাবু।

ছেলেটা বললে ভীত মুখে, 'ভিক্ষে করি না আমি।'

'কুলি তুই? বোঝা নিস্?' রাজীববাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'খবরদার নরোত্তম—' যে কুলিটা মাল ধরেছিল সে চোখ পাকিয়ে উঠল।

'নিশ্চয়ই। মাল তোমার হাত-ধরা থাকতে আমি একটি কথাও কইব না।'

'আচ্ছা বাবু, এক টাকা দেবেন। বকশিস যদি না দেন, কি আর করি! চলুন।' কুলিটা নিচু হল মাল তুলতে।

'না।' রাজীববাবু বললেন দৃঢ়কণ্ঠে।

কুলিটা নরোত্তমের দিকে জ্বলন্ত চোখে ঘুসি পাকিয়ে চলে গেল।

'কুলি তুই?' রাজীববাবু জিগগেস করলেন নরম গলায়।

'কুলি নই বাবু, আমরা মুটে, মাথা-মুটে।'

সংক্ষেপে ইতিহাসটা সেরে নিল নরোত্তম। সে ঘাটের কুলি নয়, সে বাইরের কুলি। মানে, সর্দারের তাঁবে যে সব কুলি থাকে সে তাদের দলে নয়, সে ভিন্ন গুষ্টির। সে ছুটো, উটকো। কুলিতে সে কুলীন নয়। তাই ও-সব মার্কা-মারা কুলির সঙ্গে তারা আসতে পারে না। অনেক দেরি করে, লুকিয়ে-চুরিয়ে, অনেক পাহারা ডিঙিয়ে আনাচ-কানাচ দিয়ে তাদের ঢুকতে হয়। যে মালে ঘাটের কুলি হাত দেয়, তাতে তারা চোখ পর্যন্ত দিতে পারে না। যে মাল তাদের পরিত্যক্ত, তাতেই তাদের দাবি চলতে পারে। কিন্তু তাদের জন্যে কে বসে থাকবে?

'কুলীন কুলিতে আমার দরকার নেই। কত নিবি তুই বল্ চটপট?'

নরোত্তম হঠাৎ তার টেনির প্রান্ত থেকে কতগুলি পয়সা বের করল। সিকি-

দু'আনি-আনি-ডবল পয়সা। বাঁ-হাতের চেটোর উপর রেখে গুণতে লাগল ডান হাতের আঙুলে করে, সরিয়ে-সরিয়ে একটি-একটি করে।

ওর সঙ্গে-সঙ্গে রাজীববাবুও গুণলেন। সাড়ে এগারো আনা।

'আর দশ পয়সা। আর দশ পয়সা হলেই আমার চলে যায়। আমি তবে চলে যেতে পারি।'

ইতিহাস শোনবার আর সময় নেই। রাজীববাবু বললেন, 'আচ্ছা, দেব এখন চার আনা।'

নরোত্তম টলতে-টলতে বাক্স-বিছানা তুলল মাথার উপর।

'দেখিস ফেলে দিস নে যেন—' টালটা ঠেকিয়ে দিলেন রাজীববাবু।

'এর চেয়ে কত ভারি-ভারি মোট নিই! তবে কিনা কাকার অসুখ হবার পর থেকে—আমাকে খালি-খালি দেখতে চাচ্ছেন বলে—'

কে শোনে তার ইতিবৃত্ত? ভালয়-ভালয় মালটা গাড়িতে তুলে দিলেই এ যাত্রার মত নিশ্চিন্ত। কে মাল বয়ে নিয়ে এসেছিল—ঘাটের কুলি না আঘাটার কুলি, কিছু এসে যাবে না।

তেমনি বোধহয় এসে যায় না তিনি ফার্স্ট ক্লাশে এসেছিলেন, না থার্ড ক্লাশে!

গ্যাংওয়ের মুখে ভীষণ ভিড়। থামতে হল নরোত্তমকে। মোট মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকতে তার আপত্তি নেই। বরং এই ফাঁকে একটু কথা বলবার সময় পাবে হয়তো। কোথায় একটু সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়েছে অমনি ছুটে বেরুচ্ছে কথার তারাবাজি!

অনেক কথা।

এবার সে যেতে পারবে তার কাকার কাছে। এতদিনে ট্রেন-ভাড়াটা তার জোগাড় হল। কাকা যেখানে আছে,—জয়চণ্ডীপুরে আড়িদের ধানের গোলায় সে কাজ করে—সেখানকার রেলের ভাড়া চৌদ্দ আনা। কাকার সেখানে ঘোরতর অসুখ। বাঁচবে না নাকি। তাকে দেখতে চাচ্ছে একবার। সংসারে বাপ-মা নেই, এই কাকাই তার সব কিছু। কাকীর সঙ্গে রাগ করে চলে আসে সে এই শহরে,

আঘাটের কুলি হয়ে। কিন্তু যেই খবর পেয়েছে কাকার ধাক-ধাক অসুখ, তাকে দেখতে চায়, সেই থেকে তার খাওয়া নেই। আজ চার দিন।

ভাঙা-ভাঙা শুনছিলেন রাজীববাবু। কোনোটা কানে ঢুকছিল, কোনোটা ঢুকছিল না। হঠাৎ শেষের কথায় তিনি চমকে উঠলেন, 'না খেয়ে আছিস এই চার দিন?'

'নইলে রেলভাড়া জমাব কি করে? খেতে পাই না শুনলে লোকে তবু দু'চার পয়সা দিলেও দিতে পারে, কিন্তু রেলে চড়ে জয়চণ্ডীপুর যাব শুনলে লোকে টিটকিরি দেবে—'

তন্দ্রার পথটা খানিকটা খোলসা হয়েছে। নড়বড়ে ঘাড়ে চলতে-চলতে নরোত্তম বললে, 'খেতে পাই না বললেও আজকাল কেউ পয়সা দেয় না। বলে, কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সব দিকে, ভাতের দুর্ভিক্ষ আর কোথায়! তুই যে এখনো সেই সাবেক কথাই বলছিস! সবাই ঠাট্টা করে। তাই পেটের খিদের কথা কাউকে বলিনি হুজুর। পড়ি-মরি করে দিন-রাত্তির কুলিগিরি করেছি। ঘাটের কুলির ছাড়া-মাল ধরেছি। চার দিনে মোটে এই সাড়ে এগারো আনা হয়েছে। চৌদ্দ আনা হলেই চলে যাব জয়চণ্ডীপুর। কাকার চোখ বোজবার আগে—'

'সে কি কথা!' রাজীববাবু বললেন অন্যমনস্কের মত: 'আগে খাওয়া, পরে অন্য সব। খেয়ে নিয়ে গায়ে জোর পেলে, চাই কি, ঐ চৌদ্দ আনার রাস্তা তো তুই হেঁটেই মেরে দিতে পারিস! লোকে তো কত চালাকি-ফিকির করেও—এই গাড়ি, এই কামরা—এই যে টিকিট লাগানো আছে।'

মাল তুলে দিল নরোত্তম। তারপর অন্ধকারে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! বিছানাটা পেতে নিয়েই রাজীববাবু তাকিয়ে দেখলেন, নরোত্তম নেই।

বুকের উপর হাত রেখে দলিলের খাঁজটা অনুভব করতে পারলেন না। দেখলেন, স্টিমারের সেই গুঁফো লোকটা প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করছে।

সর্বনাশ হয়েছে তা হলে! ঐ আঘাটের কুলিটাই তা হলে ওর সাকরেদ। কিন্তু ভোজবাজিতে দলিল উড়ে যেতে পারে নাকি কাপড়ের পাহাড় ভেদ করে?

গাড়িতে উঠে একের পর এক জামা খুলে দেখতে লাগলেন রাজীববাবু। না,

ঠিকই আছে দলিল। শার্টটা উলটো করে পরেছেন বলে বুকের উপর হাত রাখা উচিত ছিল তার ডান দিকে, বাঁ দিকে নয়।

কিন্তু ভাড়া না নিয়ে কুলি-ছোঁড়াটা হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল কোথায়? জয়চণ্ডী-পুরের ও টিকিট কিনবে না? পুরো পয়সা কই ওর কাছে?

নিশ্চয়ই কোনো সূক্ষ্ম মতলব আছে ঐ গুম্ফবানের। তখন থেকে হাঁটছে প্ল্যাটফর্মে আর আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে।

গার্ড যাচ্ছিল কাছ দিয়ে হেঁটে, রাজীববাবু জিগগেস করলেন, 'কত দেরি আর ছাড়বার?'

'বিয়াল্লিশ মিনিট।'

মনে-মনে হাসলেন রাজীববাবু। নেমে পড়লেন, ব্ল্যাক-আউটের স্টেশনে তাকাতে লাগলেন ইতি-উতি। নরোত্তমের সন্ধানে নয়, রেস্টোর‍্যান্টের সন্ধানে। ভয় নেই, ঠিক সময়ে ঠিক হাজির হবে নরোত্তম।

খাবার অর্ডার দিলেন। কি অসম্ভব দাম! তবু ফার্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার হয়ে ডিনার না খেয়ে নিলে মান থাকে না।

সর্বনাশ! ঐ গুঁফো লোকটাও আরেকটা টেবিলে খেতে বসেছে। বুকের ঠিক জায়গায় হাত রাখলেন রাজীববাবু। ঠিক আছে দলিল।

আরো একজন খেতে বসেছে। খেতে বসেছে স্টিমারঘাটের হোটেলে। সবচেয়ে রদ্দি ও শস্তা যে খাবার, তারই দাম আট আনা। শুধু ভাত, ডাল আর একটা ঘ্যাঁট।

'মাছের টুকরো কত একখানা?'

'দু আনা!'

'দাও, দিয়ে দাও। যা থাকে বরাতে, খেয়ে নি। আগে খাওয়া, পরে অন্য সব। আর, ঐ টকটা কত করে?'

'হাতা ছয় পয়সা করে।'

সব মিলে সাড়ে এগারো আনাই হল। চেটে-পুটে পেট ঢাক করে খেয়ে নিল নরোত্তম।

এঞ্জিন এসে লেগেছে গাড়িতে। গলগলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। টিকিট কিনল কই আর নরোত্তম? তবে কি যাবে না সে জয়চণ্ডীপুর? ভুলে গেছে সে তার কাকাকে? সে কি এখন ঘুমুবে নাকি?

যদি সে খোঁড়া হত, লাঠি চেপে-চেপে ভিক্ষে করতে-করতে চলে যেত। যদি কাণা হত, যেত হাঁড়ি বাজিয়ে গান করে-করে। যদি ফিরিঅালা হত, দাঁতের মাজন আর হাজা-পোড়ার ওষুধ বিক্রি করতে-করতে।

ভিক্ষুকের ছাড়পত্র তার নেই। নেই তার ফিরিঅালার লাইসেন। সে এই জীবনের আঘাটের কুলি।

গাড়ি ছাড়ে, তবু নরোত্তম এল না তার পয়সা চাইতে। রাজীববাবু চিন্তিত হলেন, এ কি নতুন ষড়যন্ত্র!

গাড়ি ছেড়ে দিল। আলো নিভিয়ে ওভারকোটের উপর লেপ চাপিয়ে রাজীববাবু শুয়ে পড়লেন।

ছ-ছ করে গাড়ি চলেছে।

ঘুমোবেন না, ঘুমোবেন না, করেও ঘুমিয়ে পড়লেন রাজীববাবু।

কতদূর চলে এসেছেন কে জানে! হঠাৎ তার ভয়ানক শীত করতে লাগল। যার যত কাপড়, তার তত শীত। বুঝলেন, গা থেকে লেপটা নিচের দিকে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে। শুধু লুটিয়েই পড়েনি, লেপটা সরে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। সরে যাচ্ছে বেঞ্চির নিচের দিকে। দস্তুরমত হাঁটতে-চলতে নড়তে-চড়তে সুরু করেছে।

'চোর! চোর! ডাকাত! ডাকাত! মার্ডার! মার্ডার!' রাজীববাবু গর্দভ-মর্দিত কণ্ঠে চেঁচাতে সুরু করলেন।

কোথায় আলো, কোথায় এলার্ম-চেন, রাজীববাবু পাগলের মত এলোধাবাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগলেন। শিয়রের কাছেই যে আলোর সুইচ আর হাতের কাছেই যে ঝুলন্ত এলার্ম-চেন, নজরেই এল না। চিরকাল ইন্টারে চড়েছেন, হাতড়াতে লাগলেন দরজার উপরের দেয়ালটা।

না, পেয়েছেন এলার্ম-চেন।

● অলিখিত দলিল
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

টানতেই গাড়িটা থামল না। থামল আরো অনেকটা দূর হেঁটে গিয়ে। কিন্তু থামবার আগেই দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে লোকটা নেমে গেছে কায়দা করে।



'চোর! চোর! ডাকাত! ডাকাত!'

[পৃ ১০

লোকটা নেমে যেতেই রাজীববাবু নিঃসংশয় হয়ে আলো জ্বালাতে পারলেন।

সব জিনিসই ঠিক আছে। কিন্তু তাঁর দলিল? বুক হাতড়ে দেখলেন, সব সমতল, খাঁজ নেই।

● অলিখিত দলিল
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আমার দলিল—দলিল নিয়ে পালাল! ধরো, ধরো—'

সবাই ধরে ফেলল সহজেই। নরোত্তম শুয়ে আছে পুলের কাছে। মুখে রক্ত ওঠেনি, সদ্য-খাওয়া ভাত উঠে এসেছে।

না, ঠিক আছে দলিলটা। তাড়াতাড়িতে আবার পকেটের দিকভ্রম হয়েছিল তাঁর।

'এই সেই ছোঁড়াটা। চুরি করতে ঢুকেছিল আমার কামরাতে। লুকিয়েছিল বেঞ্চির তলায়। গা থেকে লেপ টেনে নিচ্ছিল। তাড়া করতেই লাফ দিয়েছে মরিয়ার মত।'

'নিয়েছে কিছু?'

'পারেনি নিতে। মণিব্যাগটা ছিল বালিশের ওয়াড়ের খোলে—'

চোর ছাড়া আর কি! এই মস্তবড় ট্রেনের সংসারে কেউ তার আপনার নেই, কেউ তাকে চেনে না। চেনে বলে স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়। সঙ্গে তার একটা ফুটো পয়সাও নেই। কোথাও তার পাওনা আছে কিনা সে-হিসাবেরও নিকাশ মেলে না কোথাও।

লাশ রইল সামনের স্টেশন-মাস্টারের জিম্মায়।

ফের চলল গাড়ি। কিন্তু রাজীববাবুর কেবলই সন্দেহ হতে লাগল তাঁর দলিল আর অটুট নেই পকেটে। যেন পালটে হয়ে গেছে! যা আছে তা শুধু শূন্য, শাদা কাগজ।

এক-এক করে জামা খুলে বার করলেন সে-দলিল। ঠিক আছে! কিন্তু এ কি, শাদা উলটো পিঠে এসব কি লেখা, বাঙলা অক্ষরে, কাঁচা আঁকাবাঁকা হরফে!

স্পষ্ট পড়লেন রাজীববাবু:

> তুমিই আমাকে চোর বানিয়েছ। শুধু তাই নয়, আমার চার আনা পয়সা নিয়েছ চুরি করে।

হঠাৎ গাড়ি থেমে পড়ল।

স্টেশন। জয়চণ্ডীপুর।

এই সামনের স্টেশন। এইখানেই লাশ নামিয়ে দিল স্টেশন-মাস্টারের হেপাজতে।



মশা

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

গল্পটাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা, সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে পারছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ান, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্দ্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই সুরু করা বোধ হয় উচিত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড় বার-করা এমন এক রকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁইত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোন বয়সই তাঁর হ'তে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, "দুনিয়াময় টহলদারী করে বেড়াতে বেড়াতে বয়সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি! তবে—" বলে ঘনাদা যে গল্পটা সুরু করেন, সেটা কখনো সিপাই মিউটিনির, কখনো বা রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার। সুতরাং ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দু'শ বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই।

এক বছর হ'ল, কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা' ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটিছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, কিন্তু সাধারণতঃ সেটা মাসের শেষে, মেসের চার্জের তাগাদা পড়বার সময়। মুখে শুনে কিংবা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিতভাবে সব চেয়ে ভালো আরাম-কেদারাটায় বসেন, যার ভাগ্য যেদিন ভালো থাকে, তার কাছে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ বুজে প্রায় ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়ত আমাদের কোন একটা কথায় বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়ে চড়ে উঠে বসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, "কি কথা হচ্ছিল—বন্যার ?"

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান যে, মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল! তারপর জিজ্ঞাসা করেন, "টাইডাল ওয়েভ কাকে বলে জান ? দেখেছ কখনো, সেই প্রলয়ের ঢেউ—যাকে বলে সমুদ্র-জলোচ্ছ্বাস !"

সঙ্কুচিত ভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বলেন,—"কেমন করে আর থাকবে! তাহলে শোন। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি দ্বীপে গিয়ে উঠেছি…"

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কি করে এই রকম এক 'টাইড্যাল ওয়েভ'র মাথায় এক বেলায় তিনি তাহিতি থেকে একেবারে ফিজি দ্বীপে গিয়ে উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনবার পর আমাদের অবস্থা কি হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্য্যের সামনে মিটমিটে লণ্ঠনের মত আর কি!

ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়; কিন্তু আটঘাট বেঁধে যতই সাবধানে কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায়, ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন!

হয়ত কথায় কথায় কে বলেছে, যে আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা—চোখের জোর আর বড় বেশী নেই। ঘনাদা তাঁর মার্কা-মারা হাসিটি হেসে অমনি গিয়ে উঠলেন একেবারে অ্যাণ্ডিজ্ পাহাড়ের চূড়োয়, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পাখী 'কণ্ডর' শকুনের বাসার খোঁজে।

"হ্যাঁ, চোখের জোর দেখছি বটে সেবার! অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার যোগাড়, সঙ্গে একজন আর্জেনটাইন শিকারী আর 'বোরোরো' জাতের

● বন্যা
প্রেমেন্দ্র মিত্র

এক সাড়ে ছফুট লম্বা রেড ইণ্ডিয়ান গাইড্। সন্ধ্যা হয় হয়, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়ার নিচেকার খানিকটা মেঘ একটু ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কি আর দেখা যাবে! কিন্তু তখনো 'বোরোরো' জাতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা ত জানি না! হাত দুটো দূরবীণের মত করে সে একবার চোখের সামনে ধরলে, তারপর বল্লে, 'বাস আর ভয় নেই!'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় ত নেই, কিন্তু কি দেখতে পেলে তুমি?'

সে হেসে বল্লে, 'কেন ওই ত নিচে, শিকারীদের তাঁবু ফেলা রয়েছে, বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট পরা এক শিকারী এই মাত্র তাঁবুতে ঢুকল'—শুনে আমি ত অবাক্!"

ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততোধিক অবাক্ হয়ে বল্লাম, "বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রংের কোট পর্যান্ত দেখতে পেলে!"

"তা না হলে আর চোখের জোর কিসের! শকুনের চোখ কি রকম জানো? তুমাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গরুর লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোরো শিকারীদেরও চোখ তেমনি।"

এর পর আমরা যে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম তা বলা বাহুল্য।

প্রায় নির্ব্বাক হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কি থেকে বুঝি মশার প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছেন নি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরী হলো না। বিপিন সবে তাদের গাঁয়ে কি ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে, হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব।

"কি কথা হচ্ছিল হে?"

আমরা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলি,—"নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।"

বিপিন তাড়াতাড়ি আরাম-কেদারাটা ছেড়ে সসম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে বিপিনের কাছেই একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বলেন, "ওঃ, মশা!"

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক্ ঘনাদার দৃষ্টি তাহলে মশা পর্য্যন্ত পৌঁছোবে না! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একেবারে 'অ্যাটমিক'!

● মশা
প্রেমেন্দ্র মিত্র

"হ্যাঁ মেরেছিলাম একবার একটা মশা।"

আমরা স্তম্ভিত! ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, স্তম্ভিত, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশাই যদি মারতে হয়, তাহলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন, এযে কল্পনাও করা যায় না!

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল—"একটি মশা মেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ, একটি মাত্র মশাই জীবনে মেরেছি।" আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চল্লেন,—"মেরেছি ১৯৩৯ সালের ৫ই আগষ্ট, সাখালিন দ্বীপে!"

আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে থেকে আবার বল্লেন, "সাখালিন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানোনা—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মত উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিকটা জাপানীদের আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পূব-দিকের সমুদ্রকূলে তখন 'অ্যাম্বার' সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানীর হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডব-বর্জ্জিত জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। বছরের অর্দ্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে আর বাকি অর্দ্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষার-ঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াশা। কোন রকমে দামী কিছু 'অ্যাম্বার' সংগ্রহ করেই সে মুখো আর হব না এই ছিল মতলব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানীর তান্‌লিন নামে এক চীনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ, তার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত যা 'অ্যাম্বার' যোগাড় হয়েছিল, তার সেই মহামূল্য থলিটাও।

সাখালিন দ্বীপটি ত নেহাৎ ছোটখাট নয়, তার বেশীর ভাগই আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মত দামী বস্তু চুরি করে সাখালিন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর কোন লাভ নেই। সে চোরাই মাল বেচতে তাকে সভ্য কোন বড় দেশে যেতেই হবে। আর সাখালিন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রোভস্ক্ থেকে ভ্লাডিভস্টকের ষ্টীমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পর অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা শ্লেজ করে পালান সম্ভব। কিন্তু প্রধান ষ্টীমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে তার আগে চোর কিছুতেই সাখালিন থেকে বেরুতে পারবে না। অক্টোবর পর্য্যন্ত তাকে খুঁজে 'তার' করবার সময় অন্ততঃ আমরা পাব।

● মশা
প্রেমেন্দ্র মিত্র

বেতারে আলেকজ্যানড্রোজ্‌সকে পুলিশের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মিঃ মার্টিন দুজন কুলি নিয়ে তানলিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিশ পেয়ে গেলাম।

টিয়ারা পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁবু ফেলেছি। ওখানকার আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারীর কাছে সকাল বেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক দিয়ে একজন চীনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মত কোন প্রমাণ পাই নি।

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোন এক রকম অসম্ভব। সাখালিন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শুধু ভালুক ছাড়া আর কিছু নেই। সাধারণতঃ তারা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে, তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মিঃ মার্টিন তাই কোন রকমে ঘুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বল্লাম, 'দেখেছেন মিঃ মার্টিন!'

মিঃ মার্টিনের দৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক্ হয়ে তিনি বল্লেন, 'হ্যাঁ! বেশ জোরালো আলো মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ও রকম আলো আসছে কোথা থেকে? ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি?'

খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে বল্লাম, 'না ভূতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দূরের ওই পাহাড়ে টিবিটার পেছনে নিশ্চয় কোন একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।'

মিঃ মার্টিন অবাক্ হয়ে বল্লেন, 'কিন্তু এখানে সখ করে অমন বাড়ি করবে কে? গিলিয়াক, ওরোক বা টুঙ্গুস্ জাতের অসভ্য শিকারী ছাড়া এ অঞ্চলে ত কেউ আসে না। এদিকে কোন খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল যত বেশীই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমানুষিক চীৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মিঃ মার্টিন দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম, তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বার করে এনে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র যে আমরা ছিলাম না, তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। দুজনের কোমরবন্ধেই পিস্তল আঁটা ছিল।

● ক্রমশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যে পাথুরে টিবিটার পেছন থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা খুব বেশী দূর নয়, প্রায় শ-তিনেক গজ হবে। টিবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার পরই দেখা গেল আমাদের অনুমানে ভুল হয় নি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ির একটা জানলা থেকেই উজ্জ্বল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অমানুষিক যে চীৎকার আমরা শুনেছিলাম, তা একবার উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিধার এমন শান্ত যে, দুজনে এক সঙ্গে সে শব্দ না শুনলে মনের ভুল বলেই সেটা গণ্য করতাম।


"প্রাণে বাঁচতে চাও ত হাত তোল।"

বাড়িটার কাছে এসে তখন আমরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছি। এখন করা যায় কি! অজানা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়িতে হঠাৎ মাঝ-রাতে এসে ডাকাডাকি করাটা যে মোটেই সুবিধের হবে না, তা বুঝতে পারছিলাম; কিন্তু ফিরে যাওয়াও তখন আর যায় না।

যে জানলাটা দিয়ে আলো আসছিল, সেখানে গিয়ে সাবধানে একবার উঁকি দিলাম। মস্তবড় একটা ঘর, মিউজিয়মে যেমন থাকে অনেকটা সেই রকম। প্রকাণ্ড একটা কাঁচে ঘেরা টেবিল ঘরটার মাঝখানে বসান। সে কাঁচের ভেতর কি আছে দেখতে পেলাম না। লোকজনও কেউ সেখানে নেই। এত রাত্রে থাকবার কথাও নয়।

সেখান থেকে সরে এসে দরজায় ধাক্কা দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে সরু অথচ তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ইংরাজিতে এক আদেশ শুনলাম, 'প্রাণে বাঁচতে চাও ত হাত তোল—'

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, বেঁটে গোছের জোয়ান একটি লোক আমাদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে লম্বা-চওড়া যমদূতের মত চেহারার এক প্রহরী; তারও হাতে পিস্তল।

● ক্রমশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যাপারটা বেশ নাটুকে হয়ে জমে উঠেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের পরিচয় পাওয়ার পর সব আবার থিতিয়ে সহজ হয়ে গেল।

পিস্তল হাতে যিনি আমাদের হাত তুলতে বলেছিলেন, জানতে পারলাম তিনি মিঃ নিশিমারা নামে একজন জাপানী কীটতত্ত্ববিদ্। সাখালিনের কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে এই ঘাঁটিটি বসিয়েছেন। আমরা কি উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়াছিলাম শোনবার পর লজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কয়েকদিন তাঁর ওখানে থেকে তাঁর কাজ-কর্ম দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে, আমাদের পলাতক চীনা মজুরের সন্ধান তাঁর লোকজনের মারফৎ তিনিই করিয়ে দেবেন। এ অঞ্চল তাঁর এক রকম হাতের মুঠোয়। তাঁর লোকজনের হাত এড়িয়ে কারুর পালাবার ক্ষমতা নেই।

কথাটা যে কতখানি সত্য, একদিন পার না হইতেই বুঝতে পারলাম। পরের দিন সকালেই মিঃ নিশিমারা তাঁর গবেষণাগার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণ কীটতত্ত্বের গবেষণা তিনি যে করেন না, তাঁর ল্যাবরেটরির নানা বিভাগ দেখেই তা অবশ্য বোঝা যায়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, কীটপতঙ্গ লালন-পালন ও পরিবর্দ্ধন করবার জন্যে রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরিতে আছে।

মিঃ মার্টিন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোকামাকড়ের ভেতর মশাই দেখছি আপনার গবেষণার প্রধান বিষয়।'

মিঃ নিশিমারা একটু হেসে বল্লেন, 'তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে? মানুষের সভ্যতার মশাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাখালিন দ্বীপ থেকে সুরু করে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ম্যালেরিয়ার বাহন হিসাবে মশা কি পরিমাণ ক্ষতি প্রতিনিয়ত করছে, ডাক্তার হিসেবে তা আপনার নিশ্চয় অজানা নয়!'

মিঃ মার্টিন বল্লেন, 'কিন্তু আপনার গবেষণাগারে ত দেখছি মশার লালন-পালনই হ'ল আসল কাজ। এর দ্বারা ম্যালেরিয়ার কি প্রতিকার হবে বুঝতে পারছি না।'

নিশিমারা আবার হেসে বল্লেন, 'না বোঝবারই কথা। শুধু মশা মেরে নয়, মশা যাতে আর ম্যালেরিয়ার বাহন না হতে পারে, সেই চেষ্টা করে আমি ম্যালেরিয়া-সমস্যার নতুনভাবে সমাধান করতে চাই।'

আমাদের একটু অবাক্ হতে দেখে তিনি বল্লেন, 'মশা কি করে রোগের বীজাণু ছড়ায়, তা আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারী যন্ত্রের বাক্স বল্লেই হয়। গায়ের ওপর

বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এর পর তৃতীয় যন্ত্র-নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়।

আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর কোন উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন যদি করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তাহলে মশা হাজার কামড়ালেও আর আমাদের কোন ভয় নেই। আমার গবেষণাগারে মশার লালা-পরিবর্ত্তনের সেই চেষ্টাই আমি করছি।'


"এর মানে?" [পৃঃ ২১

বিশ্বাস করি না করি, নিশিমারার কথায় প্রতিবাদ কিছু করিনি। সমস্ত গবেষণাগারটা আমাদের কাছে তখনই কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে। আগের রাত্রের সেই অমানুষিক চীৎকারের শব্দের কথা তখনও ভুলতে পারিনি। নিশিমারাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেটা কোন বন্য জন্তুর আওয়াজ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয়েছে কিছু যেন তিনি গোপন করে যাচ্ছেন।

সেই গোপন রহস্য যে কি, সেই দিন রাত্রে টের পেলাম। নিশিমারা আমাদের যত্ন-আতিথ্যের কোন ত্রুটি করেননি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তখন আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুতে এসেছি, হঠাৎ মিঃ মার্টিন বল্লেন, 'এরি মধ্যে শুয়ে কি হবে? আসুন, একটু বাইরে ঘুরে আসি।' তাঁর কথায় রাজি হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। আমাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ!



তিনটে মানুষ উন্মাদ হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। [পৃঃ—২২

'এর মানে ?' মিঃ মার্টিন অত্যন্ত চিন্তিতভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

মানে ঠিক বুঝতে না পারলেও এই দরজা বন্ধ করার পেছনে যে কোন শয়তানী মতলব আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তখন আর আমাদের নেই।

কিন্তু এত সহজে আমরা হার মানব কেন ? ছাদের কাছে হাওয়া-চলাচলের একটা ছোট ভেন্টিলেটর ছিল। কোন রকমে তারই পাল্লা ভেঙে দুজনে সেখান দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে নামলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি! শুধু ল্যাবরেটরির একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। সন্তর্পণে সেই ঘরটার পেছনে একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সেই কালকের রাতের মত রক্ত জল-করা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানলা বেয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু একি ব্যাপার! যার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি, সেই তানলিনই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে অসীম যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। তার এক পাশে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম, সেই যমদূতের মত কাফ্রী প্রহরী দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে ফাঁপা একটা কাঁচের মোটা নলের মত জিনিষ হাতে করে মিঃ নিশিমারা।

'ব্যাপার কি মিঃ নিশিমারা ?' বেশ একটু উত্তেজিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম।

মিঃ নিশিমারা আমাদের দেখে রাগে ও বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বল্লেন, 'আমার আতিথেয়তার ওপর একটু বেশী অত্যাচার করছেন নাকি আপনারা ? এ ঘরে আসতে কে আপনাদের অনুমতি দিয়েছে ?'

'কেউ দেয়নি, এখন বলুন এখানে হচ্ছে কি ?'

মিঃ নিশিমারা অদ্ভুতভাবে হেসে বল্লেন, 'যা হচ্ছে তা'ত দেখতেই পাচ্ছেন। এ লোকটাকে সাপে কামড়েছে, তারই চিকিৎসা করছিলাম।'

মিঃ মার্টিন তখন মেঝের বসে পড়ে তানলিনকেই পরীক্ষা করছিলেন। তিনি মুখ তুলে কঠিন স্বরে বল্লেন, 'এ ত মারা গেছে ! আর সাপেও একে কামড়ায়নি। বলুন, কি করেছেন একে।'

'কি করেছি, জানতে চান ?' নিশিমারা কখন এরি মধ্যে কোথা থেকে একটা পিস্তল হাতে নিয়েছেন লক্ষ্যই করিনি। সেইটে আমাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে তিনি বল্লেন, 'বেশ, সেই কথাই বলব তাহলে, শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য্য আবিষ্কারের কথা শুনে মরার সৌভাগ্য আপনাদেরই হোক। আপনাদের তানলিন সাপের কামড়ে মারা যায়নি—মারা গেছে মশার কামড়ে—সামান্য একটা মশার কামড়ে !'

● মশা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নিশিমারা তীক্ষ্ণ, উচ্চ অট্টহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন, 'বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা,—কেমন? কোন ভাবনা নেই, এখুনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম, মনে আছে ত? সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে সুরু করে মশা যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্য্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে যে চীৎকার শুনেছিলেন, সে এমনি একজনের ওপর মশার কামড়ের পরীক্ষার ফল। তানলিনের অবস্থা ত সামনেই দেখতে পাচ্ছেন—এইবার আপনাদের পালা।'

নিশিমারার ইঙ্গিতে সেই যমদূত তখন মিঃ মার্টিনকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশিমারা বল্লেন, 'এই যে কাচের নল দেখছেন, এর ভেতর একটিমাত্র বিষাক্ত মশা ভরা আছে। এই একটি মশা কিন্তু এখনো আপনার মত জন-বিশেক জোয়ানকে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি বিজ্ঞানের পীঠস্থান, সভ্য মার্কিন মুলুকের লোক। তাই আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রাণ দেওয়ার গৌরব আমি আপনাকেই আগে দিতে চাই। বেশী কিছু আপনাকে করতে হবে না। এই নলটি এমন কায়দা করে তৈরী যে, গায়ে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঢাকনাটা ভেতর দিকে খুলে যায়,—হিংস্র মশাটাও উড়ে এসে কামড়ে দিতে দেরী করে না……'

সমস্ত মাথার ভেতর কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছিল! মনে হচ্ছিল আর যেন দাঁড়াতে পারব না! কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সজোরে একটা ঘুসি ছুঁড়লাম। নিশিমারা আচমকা ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কাঁচের নলটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা কর যে, ভাঙা নল থেকে বেরিয়ে সেই সাক্ষাৎ শমন ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে আর তিনটে মানুষ উন্মাদ হয়ে তাকে এড়িয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছে—ঘরের মাঝখানে আবার তানলিনের মৃতদেহ!

কোন রকমে দরজার কাছে পৌঁছে খিলটা খুলে বেরুতে যাব, এমন সময় সেই বিশাল কাফ্রী বাঘের মত আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

আর বুঝি আশা নেই! মশাটা ঠিক আমার নাকের কাছে একবার ঘুরে গেল। তারপরেই সেই কাফ্রী এক সঙ্গে পাঁচটা রেলের ইঞ্জিনের মত চীৎকার করে আমার ঘাড়ের ওপর থেকে নেতিয়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, মশার দংশন-জ্বালার সঙ্গে সব জ্বালা তার জুড়িয়েছে।

● মশা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আলপনা

কিছু ভাববার আর সময় নেই। উঠে পড়ে আবার পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, মিঃ নিশিমারা যুযুৎসুর প্যাচে মিঃ মার্টিনকে চিৎ করে ফেলে দিয়েছেন আর মশাটা ঠিক তাঁর মাথার কাছে উড়ছে। ছুটে গিয়ে হেঁচকা টান দিয়ে মিঃ মার্টিনকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিশিমারার আর্তনাদ শোনা গেল! মশাটা ঠিক তাঁর গালের ওপর গিয়ে বসেছে।

এবার আর এক মুহূর্ত দেরী হ'ল না। আমার প্রচণ্ড এক চাপড় গিয়ে পড়ল নিশিমারার গালে। মশা আর নিশিমারার ভবলীলা একসঙ্গেই সাঙ্গ হয়ে গেল।"

মশা মারবার পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘনাদা বলেন, "জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয়নি!"

আঁধারে আলো

● আজকে যে স্বাধীনতা-আন্দোলন সব প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—আমি অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি না—বাঙলার যুবকদিগকে কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছি—সে স্বাধীনতার আন্দোলন ১৯০৫ সালে এই বাঙলার মাটিতে সুরু হইয়াছিল।

বাঙলার যুবক-যুবতীদের যদি দেশের সম্মুখে পরিচিত হইতে হয়, তবে প্রতিকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হউক—আমার রক্তের প্রতি বিন্দু ভারতের স্বাধীনতার বীজ বপন করুক।

—শরৎচন্দ্র বসু

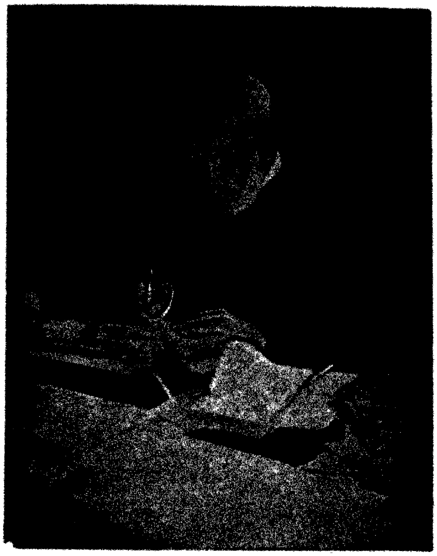
সুদূরের বাণী

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ ব্যতীত এমন আর কোনো দেশ আছে কি, যে-দেশ অধিকতর সেবার যোগ্য ও যে-দেশের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে? পৃথিবীতে আর কোন্ দেশ আছে, যে-দেশ ভারতের অপেক্ষা অধিকতর মনোরম ও অতীতে অধিকতর পূজিত হইয়াছে? দুইটি ধর্ম্মের ইহা জন্মস্থান এবং প্রাচ্যের ইহা পবিত্র ভূমি।

● সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলপনা—



আকাশে-বাতাসে বাংলার জলে
প্রথম চেতনা আনিলে তুমি,
তুমি শিখায়েছ সুরেন্দ্রনাথ,
বাংলা আমার জন্মভূমি !



অমরেশের পরীচালনা

—শ্রীবিণায়ক ভট্টাচার্য্য

—এক—

[পর পর তিনবার থিয়েটারে ব্যর্থকাম হইয়া অমরেশের মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাই এবার পূজায় দিদির বাড়ী হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আসা সত্বেও সে উহার জবাব দেয় নাই। পরিশেষে স্বয়ং ভগ্নীপতি যখন তাহাকে যাইবার জন্ত লিখিলেন, তখন সে বাধ্য হইয়া উত্তর দিল যে, গত তিন বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বৎসরান্তে একবার গ্রামে গিয়া যদি থিয়েটারই করিতে না পারিল, তবে এ জীবন রাখিয়া লাভ কী? কাজেই তাহাকে বার বার অনুরোধ করিয়া কোন লাভ নাই। এবার পূজায় সে দেশে বেড়াইতে যাইবে।

অমিয় কলিকাতায় থাকিয়া থার্ড-ইয়ারে পড়ে। পিতার নিকট হইতে অমরেশকে লইয়া দেশে আসিবার আদেশপত্র পাইয়া, সে হোষ্টেল হইতে মামার সন্ধানে বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, সে একখানি টাইম-টেবিল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। অমিয়কে একবার দেখিয়া লইয়া সে আবার উহাতে মন দিল।

অমিয় দু'একবার ইতস্ততঃ করিয়া ডাক দিল]

অমিয় :—মামা!

অমরেশ :—(না চাহিয়া) কী?

অমিয় :—বাবা লিখেছেন—

অমরেশ :—জানি। [চুপচাপ। একটু পরে]

অমিয় :—মামা!

অমরেশ :—বলতে পারো।

অমিয় :—বলছিলাম কি, তুমি না গেলে মা খুব কান্নাকাটি করবেন।

অমরেশ :—বোলো—তীর্থে গেছি।

অমিয় :—কিন্তু এই বয়সে তীর্থভ্রমণ,—মা বিশ্বাস করবেন কেন ?

অমরেশ :—না বিশ্বেস করে—আমি নাচার।

অমিয় :—কোন্ তীর্থে যাবে ?

অমরেশ :—কিছু ঠিক নেই! কামরূপ থেকে কেপ্ কমোরিন্ অবধি চলে যেতে পারি! আমার মনে বৈরাগ্য এসেছে।

অমিয় :—বৈরাগ্যটা পূজোর পরে এলে হোত না মামা? চলোই না একবার বাপু! বছরে একবার আনন্দ করা। সকলে মিলে—

অমরেশ :—তোরা যা না—

অমিয় :—তাই কি হয়! তুমি হ'লে আমাদের পরিচালক। কোচ্ করবে কে? এ্যাক্টিং করবো বললেই তো হ'ল না! সেবার ওই কেলেঙ্কারীটা না হ'লে—

অমরেশ :—শুধু সেবার? তার আগের বার? তারও আগের বার? বারে বারে এই ধ্যাষ্টামো কি ভাল লাগে? গেঁইয়ার কারবারই আলাদা!

অমিয় :—যাই হোক, এবার চল। আগে থেকে স্টেজ্-রিহারস্থাল দিয়ে সব ঠিক-ঠাক ক'রে নামা যাবে।

অমরেশ :—না।

অমিয় :—লক্ষ্মী মামা, আর না বোলো না। আজ দুপুরের ট্রেণে পতিত-টতিত ওরা সব দল বেঁধে কোলকাতায় এসেছে।

অমরেশ :—কেন ?

অমিয় :—তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য! তুমি বাবাকে লিখেছিলে—যাবে না। তাই বাবা ওদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তোমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে।

অমরেশ :—তোর বাবার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! যত সব! যাক্‌গে, ওরা কোথায় ?

অমিয় :—হোস্টেলে। আসছে।

অমরেশ :—কিন্তু আমি যে তীর্থে যাওয়া প্রায় ঠিক করে ফেলেছি।

অমিয় :—পূজোর পরে যেও মামা।

অমরেশ :—হুঁ!

[উঠিয়া দুই হাত পিছনে রাখিয়া পায়চারী করিতে লাগিল; মাঝে মাঝে থামিয়া ভ্রুকুঞ্চন করে, আবার চলে। হঠাৎ অমিয়র দিকে চাহিয়া কহিল]

অমরেশ :—কিন্তু একটা কথা আছে।

অমিয় :—বলো।

অমরেশ :—আচ্ছা, পরে বলবো।

[আবার পায়চারী করিতে লাগিল। ঘরে প্রবেশ করিল পতিত, ভুবন, পতিতের মামা পরিতোষ, পরাণ ইত্যাদি। অমরেশ সেই-দিকে চাহিয়া কহিল]

অমরেশ :—এসেছিস?

পতিত :—হ্যাঁ। আমরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছি। কোন কথা শুনবো না—যেতে তোমাকে হবেই!

অমরেশ :—হুঁ। (পরিতোষকে) আছেন এখনও?

পরিতোষ :—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমরেশ :—এবারেও কি বাসনা আছে নাকি?

পরিতোষ :—কিসের?

অমরেশ :—থিয়েটার করবার?

পরিতোষ :—হ্যাঁ, ওরা বলছিল—

অমরেশ :—ওরা তো বলবেই! গেঁইয়ার কারবারই আলাদা। যাকগে! কী বই হবে?

● অমরেশের [illegible]
শ্রী[illegible]

ভুবন :—পণ্ডিত বলছিল সা—সা—সাজাহান।

অমরেশ :—না। অতবড় বই ধরা এখন সম্ভব নয়। ওতে পরিচালনার খাটুনি অনেক। ছোট-খাটো ব'য়ের নাম করো।

পরিতোষ :—আমার মনে হয়—বিল্বমঙ্গল এবার ধরলে হয়! বইটাও ভালো,—তাছাড়া পূজোতে বেশ একটা ধর্ম্মমূলক—

অমরেশ :—কেন? এর আগে অধর্ম্মমূলক কিছু হয়েছে কি?

পরিতোষ :—না, আমি বলছিলাম—

অমরেশ :—তাই বলুন, আপনি বলছিলেন। আপনি কি নাটকের অথরিটি? যা বলবেন, তাই করতে হবে? কোলকাতায় তো এসেছেন, যাবেন নাকি একদিন থিয়েটারে? গিয়ে একবার দেখে আসুন, কী কাণ্ডটা হচ্ছে—সেখানে!

পণ্ডিত :—তোমার যা ইচ্ছে, আমাদেরও সেই ইচ্ছে মামা।

অমরেশ :—শোন্! আমি নিজে একটা নাটক লিখেছি।

অমিয় :—কই, একথা তুমি তো আমায় বলনি মামা।

অমরেশ :—সাস্‌পেন্স্। নাটকের গোড়ার কথাই হ'ল তাই। ছবিদা নাটকখানা করবেন বোধহয়। তিনি তো আমার আইডিয়া শুনে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন!

পরিতোষ :—কী রকম?

অমরেশ :—একেবারে নতুন, যাকে বলে টাট্‌কা, তাজা, আন্‌কোরা, নতুন আইডিয়া!

অমিয় :—একটু বলো না মামা!

অমরেশ :—আজকাল থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার কথা শুনছিস তো?

অমিয় :—হ্যাঁ।

অমরেশ :—আমার আইডিয়া হচ্ছে যাত্রাটিক্যাল থিয়েটার!

পণ্ডিত :—সে কি!

অমরেশ :—হ্যাঁ। ষ্টেজের ওপর আসর হবে। পাবলিক ষ্টেজে যাঁরা এই আসরের

ওপর বসবেন, তাঁদের পঞ্চাশ টাকা ক'রে টিকিট ; আর মফস্বলে যাঁরা এই আসরে থাকবেন, তাঁরা নিমন্ত্রিত বিখ্যাত গণ্যমান্য লোক! যেমন—জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জমিদার ইত্যাদি।

অমিয় :—কিন্তু মামা, শেষকালে যাত্রা!

অমরেশ :—দেশের জিনিষ। আমোদ-প্রমোদের জন্যও কি আমাদের বিলেতের কাছে হাত পাততে হবে? থিয়েটার তো বিলিতী! খাঁটি যাত্রা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে সে হবে জীবন্ত!

ভুবন :—তা' কী বই হবে?

অমরেশ :—বিশ্বামিত্র! নবসৃষ্টির ধ্যানে নিমগ্ন বিশ্বামিত্র। আজকে রাত্রেই তোদের বইটা শোনাবো। প্রথম সিন্‌ই হচ্ছে—ধ্যান-আচ্ছন্ন বিশ্বামিত্র ব'সে আছেন। সামনে অপ্সরা তাঁর চিত্ত চঞ্চল করবার জন্য নৃত্য-গীত করছেন। অমিয়, তুই সেই পার্টটা করবি!

অমিয় :—গীত করতে পারি, কিন্তু নৃত্য তো পারবো না মামা!

অমরেশ :—বকাস্‌নি। কী এমন নাচ, শুনি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীরটা একটু দোলাবি, অবিশ্যি তালে তালে। তারই নাম তো ওরিয়েন্টাল ডান্স্‌। হাতি-ঘোড়া এমন কিছু না। ওই এক সিনেই নাচ। তারপরে আছে—এ্যাক্টিং! সাংঘাতিক এ্যাক্টিং! ফার্স্ট এ্যাক্ট গেল এই। তারপর সেকেণ্ড এ্যাক্টে শকুন্তলার ব্যাপার এসে গেল, দুষ্মন্ত-ফুষ্মন্ত নানান ঝামেলা।

পরাণ :—তাহ'লে এবার সিন লাগবে না মামাবাবু?

অমরেশ :—ওই একখানা তপোবনের দৃশ্য পেছনে ফেলে রাখবি, ব্যস্‌!

পরাণ :—আর তরোয়াল-টরোয়াল?

অমরেশ :—না-না, শুনছিস—তপোবনের ব্যাপার। তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে রে? এবার খালি জটা আর সামগান। কিন্তু আর একটা কথা আছে!

পণ্ডিত :—কী?

অমরেশ :—দুটো পরী চাই যে!

● অমরেশের পরিচালনা
শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য

অমিয় :—পরী ! পরী কি হবে মামা ?

অমরেশ :—স্বর্গ থেকে নেমে আসবে, গান গাইতে-গাইতে।

ভুবন :—সে-সেরেছে !

অমরেশ :—কিসে সারলো ?

ভুবন :—ওপর থেকে প-পরী কি ক'রে নামবে মামা ?

অমরেশ :—ব্ল্যাক্-লাইন দিয়ে বাঁধা থাকবে ! সেইটে ধ'রে নেমে আসতে হবে। দড়িকে কালো রং ক'রে নিতে হবে, তাহ'লে আর কেউ দেখতে পাবে না ! আড়াআড়িভাবে ওপরে-নীচে দড়ি বাঁধা থাকবে, সেইটে ধ'রে সর-সর ক'রে চ'লে আসবে। পতিত আর ভুবন—দু'জনে পরী সাজবি।

পতিত :—তুমি দেখিয়ে দেবে তো মামা ?

অমরেশ :—আলবাৎ ! এবারে এক কাজ কর ! কোলকাতা থেকে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে নিয়ে যা। লেখা থাকবে—এবার পূজোয় **পরিচালক অমরেশের পরী চালনা। শেষের পরীটা দীর্ঘ-ঈ দিবি, বুঝেছিস ?**

অমিয় :—হ্যাঁ।

অমরেশ :—আরম্ভের আগে আমি একটা বাণী দেবো। যে যুগান্তরকারী টেকনিক্ এবার সুরু হলো, সমস্ত পৃথিবী তা' একদিন মাথা পেতে নেবে। বুঝলি ? চল্ ! একটু চা-টা খাবি।

পতিত :—শেষকালে পরী সাজতে হবে মামা ?

অমরেশ :—ভয় নেই, ডানা থাকবে—দু'হাতের সঙ্গে বাঁধা। মাটিতে নেমেই চট্ ক'রে গুটিয়ে নিবি। আয় !

[সকলের প্রস্থান]

—দুই—

[মহাসপ্তমীর রাত্রি ! ষ্টেজের উপর আসর বিছানো হইয়াছে। চারিদিকে কনসার্টের বাদকরগণ বসিয়া। মঞ্চের দক্ষিণ দিকের উপর হইতে বামদিকের উইংসের নীচে, এবং বামদিকের উপর হইতে দক্ষিণ দিকের নীচে অবধি দুইটি দড়ি টাইট্ করিয়া বাঁধা। নরেশবাবু, মহকুমার এস-ডি ও সাহেব এবং আরও দু'চারজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহাদের গলায় ফুলের মালা। মঞ্চের চারদিকে টবেপোঁতা গাছের ভীড়—অর্থাৎ তপোবন।

যবনিকা অপসারিত হইতেই দেখা গেল নরেশবাবু দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিতেছেন]

নরেশ :—আজ এই তরুণ নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে একটি কথা নিবেদন করবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। যে নাটকখানি আজ আপনারা দেখবেন, সেখানি রচনা করেছেন আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান অমরেশ। নাটকখানির নাম **বিশ্বামিত্র**। দেশে নতুন নাট্যকারের প্রয়োজন আছে, একথা আশা করি আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। ইনি এই নাটকখানি একটি নতুন টেক্‌নিকে অভিনয় করবেন, যে টেক্‌নিকের কথা আপনারা তাঁর মুখ থেকেই এখনি শুনতে পাবেন। প্রতি বৎসরই পূজোর সময় এঁরা আমাদের আনন্দ দান ক'রে থাকেন, আপনারা এঁদের আশীর্ব্বাদ করুন। এই সঙ্গে আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় মহকুমা-হাকিম মহাশয়কেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যিনি তাঁর সহস্র কাজ ফেলেও আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। কই, অমরেশবাবু, এগিয়ে আসুন।

[বিশ্বামিত্রবেশী অমরেশের প্রবেশ। সঙ্গে অপ্সরাবেশিনী অমিয় ও বিশ্বামিত্রের শিষ্যবেশী পরিতোষ। অমরেশের হাতে একখানি কাগজ। সে উহা পড়িতে যাইবে এমন সময় অপ্সরা-বেশিনী অমিয় ডাকিল]

অমিয় :—দাদা ! (চাপা গলায়)

● অমরেশের পরিচালনা
[illegible]

অমরেশ :—(ভীষণ চটিয়া) মামা কী রে উল্লুক, মামা কী ? দেখছিস বিশ্বামিত্র সেজে রয়েছি !



"মামা কী রে উল্লুক, মামা কী ?"

অমিয় :—না, বলছিলাম কী, —পতিত আর ভুবন তো পরী সেজেছে, ওদের কি খাচায় তুলে দেব ?

অমরেশ :—ওঃ ! এখনও জিসনি ?

অমিয় :—না তো !

অমরেশ :—তাহ'লে কী হবে ? পরী-চালনাই যদি বাদ গেল, তবে থিয়েটার করবার দরকার কী ?

● অমরেশের পরীচালনা
শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য

অমিয় :—এক্ষুনি তুলে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

[অমরেশ সমবেত দর্শকবৃন্দকে নমস্কার করিয়া]

অমরেশ :—

সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে
শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী
নারায়ণী নমোঽস্তুতে।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, মায়েরা, বোনেরা এবং ভায়েরা, অভিনয় আরম্ভের পুণ্যপ্রাক্কালে আমার প্রণতি গ্রহণ করুন। আজ আপনারা যে নাটকের অভিনয় দেখতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তার নাম—

[উত্তেজিত ভুবনের প্রবেশ]

ভুবন :—(চাপা গলায়) মা-ম্মা-ম্মা মামাবাবু!

অমরেশ :—কী?

ভুবন :—আম্-আম্-আমি অত উঁচুতে উঠতে পারবো না।

অমরেশ :—আমি উঠবো?

ভুবন :—কী-কী-ওলছেন?

অমরেশ :—বলছি, তাহ'লে কি আমি ওপর থেকে নামবো, নীচে তুই তপস্যা করবি?

ভুবন :—তা-তা-তা কেন?

অমরেশ :—তাহ'লে যা। এখন বিরক্ত করিসনি।

ভুবন :—মো-ম্মো-মই দিচ্ছে না যে!

অমরেশ :—মই না দিলে উঠবি কি দিয়ে?

ভুবন :—বো-বো-ওলছে—ঘাড়ে পা দিয়ে উঠতে। পো-প্পোতে তাই উঠে গেল।

অমরেশ :—আমার নাম ক'রে পরাণকে বলগে যা। সে মই এনে দেবে।

ভুবন :—তাই যা-যাচ্ছি। মো-ম্মোট কথা—

● অমরেশের পরিচালনা
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

অমরেশ :—গেলি ?

[ভুবন চলিয়া গেল। অমিয় আসিয়া যথাস্থানে দাঁড়াইল। অমরেশ প'ড়িতে লাগিল]

অমরেশ :—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, নাটকের নাম বিশ্বামিত্র। নতুন সৃষ্টি-রচনার কামনা নিয়ে বিশ্বামিত্র কঠোর তপে নিমগ্ন। স্বর্গে দেবতাবৃন্দ ত্রস্ত ভীত হ'য়ে উঠলেন, তাঁরা তখন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে পাঠালেন তাঁর তপোভঙ্গের জন্য—

পরিতোষ :—উর্ব্বশীকে নয়, মেনকাকে।

অমরেশ :—আজ্ঞে ?

পরিতোষ :—বলছি, উর্ব্বশীকে নয়—মেনকাকে পাঠানো হয়েছিল, তপোভঙ্গের জন্য।

অমরেশ :—দেবতারা আপনাকে জানিয়ে পাঠিয়েছিলেন ?

পরিতোষ :—তা কেন ? ব'য়ে তাই লেখা আছে।

অমরেশ :—লেখকরা কী ক'রে জানলেন ?

পরিতোষ :—তাঁরা ধ্যানে জানতে পেরেছিলেন।

অমরেশ :—সেটা পদ্মার ওপারের ধ্যান। ওপারের ধ্যানে যিনি মেনকা, এপারের ধ্যানে তিনিই উর্ব্বশী। মক্কার ধ্যানে যিনি আল্লা, মথুরার ধ্যানে তিনিই কৃষ্ণ। বিলেতের ধ্যানে যিনি খৃষ্ট, বেনারসের ধ্যানে তিনিই বিশ্বনাথ। বুঝেছেন ?

পরিতোষ :—আজ্ঞে হ্যাঁ। না বুঝে উপায় কী ?

অমরেশ :—তাহ'লে চুপ করুন। আমাকে কাজ করতে দিন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দেবতারা তখন ভীত হ'য়ে উর্ব্বশীকে পাঠালেন মহামুনি বিশ্বামিত্রের ধ্যান-ভঙ্গ করতে।

মরেশ :—অমরেশ !

অমরেশ :—কী চাই ? (দেখিয়া) ও। আপনি। কী বলছেন ?

মরেশ :—হাকিম সাহেব বলছেন, ওটা মেনকাই হবে।

● অমরেশের পত্নী চারুলতা
শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য

অমরেশ :—তাহ'লে মেনকাই হবে। কেন না, মেনকা না হ'লে উনি কথনোই বলতেন না। অমিয়! তাহ'লে তুমি উর্ব্বশী নও, মেনকা। মনে রেখো।

অমিয় :—আচ্ছা।

অমরেশ :—দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যে টেকনিকে এই নাটকটি অভিনীত হবে, তার নাম যাত্রাটিক্যাল থিয়েটার টেকনিক; অর্থাৎ যাত্রার অনুকরণে থিয়েটার। পশ্চিমের নকল ক'রে ক'রে আজ আমরা প্রায় অস্ত যাবার উপক্রম করেছি, তাই পূবে ফিরে আসতে হবে। আমাদের আদি হ'ল যাত্রা।···এই সম্পর্কে আমি সুবিখ্যাত অভিনেতা প্রভাতদাকে কিছু বলেছি, তিনিও বোধ হয় পাব্লিক স্টেজে এই টেকনিক প্রবর্ত্তন করবেন।

অমিয় :—প্রভাত সিংহ?

অমরেশ :—অবিকল। আর একথাও আমি সগর্ব্বে উচ্চারণ করতে পারি যে, এই যাত্রাটিক্যাল থিয়েটার করতে পারলে তাঁর নাম নাট্য-ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকবে। আপনারা আমাদের এই উৎসবকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই নাটকে আরও দেখবেন, আকাশ থেকে দুটি পরী কেমন ক'রে অবলীলাক্রমে মাটিতে নেমে এসে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করছে। ব্যস্! আমার বক্তব্য শেষ হ'য়ে গেছে। এইবার নাটক আরম্ভ হবে। কই হে, কনসার্ট বাজাও।

[প্রায় মিনিট দুই কাল পূর্ণোদ্যমে কনসার্ট বাজিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সকলে ভিতরে চলিয়া গেল। দর্শক ও বিশ্বামিত্র আসরে রহিলেন। বিশ্বামিত্র ধ্যানে বসিলেন। কনসার্ট থামিল]

বিশ্বামিত্র :—এই পৃথিবীর যত পাপ, যত পঙ্কিলতা, হানাহানি, মারামারির ঊর্দ্ধলোকে আমি নবসৃষ্টি সৃজন-কামনায় যোগাসনে উপবেশন করলাম। হে দেব, হে দেবীগণ, আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। যতদিন না আমার মনস্কামনা

● অমরেশের পরিচালনা
[illegible]

পূর্ণ হয়, ততদিন যেন কেউ আমার ধ্যানভঙ্গ না করে। ওঁ নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ নারায়ণ ব্রহ্ম।



"কোথায় আছ অপ্সরাগণ! নেমে এস।" [পৃষ্ঠা—৩৭

[সমাধিস্থ হইলেন। ধীরপদে মেনকার প্রবেশ।
সে আসিয়া সুমিষ্ট কণ্ঠে কহিল]

মেনকা :—জীবনের সর্ব্ব-আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে কেন এই নির্জ্জন তপোবনে এহেন কঠোর তপস্যা যোগিবর! জীবন কি তোমার কাছে কিছুই নয়? এই কল-

● অমরেশের পরিচালনা
শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য্য

ফুল-লতাপুষ্প-শোভিত কাননভূমি, এই সমুদ্রমেখলা সুন্দরী পৃথিবী, ওই অবিরাম ঘূর্ণায়মান সূর্য্য-চন্দ্র-খচিত সুবিশাল সৌরমণ্ডল, চেয়ে দেখ ঋষি—এরা কি আপন আপন কর্তব্য করছে ভোগের মধ্য দিয়ে, না ত্যাগের মধ্য দিয়ে ?

তবু নীরব ? তবে তোমার ধ্যানভঙ্গের জন্য আমি আমার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করবো। দেবতা-আদিষ্টা আমি, দেখি তুমি কেমন ক'রে ধ্যানে অচঞ্চল থাকতে পারো ?

কোথায় আছ অপ্সরাগণ! নেমে এস স্বর্গের নন্দনকানন ছেড়ে, তোমাদের হাস্যে লাস্যে সঞ্জীবিত করো এই কাননভূমি। আমি নৃত্যচ্ছন্দে এই মুনির মনোহরণ করবো।

[মুহূর্ত্তমধ্যে চৈত্র নীল আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে পতিতের কণ্ঠ শোনা গেল]

পতিত :—মামা গো! বাঁশ মট্‌মট্ করছে, নামবো কি ক'রে ?

[ধ্যানে বিশ্বামিত্র চঞ্চল হলেন, কিন্তু চোখ খুলবার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভুবনের গলা]

ভুবন :—ঠে-ঠ্যা-ঠ্যালছিস কেন ? প-প্পড়ে যাব যে !

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—ভুবন আর পতিত দুইদিক হইতে দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে নামিয়া আসিয়েছে। তাহাদের ডানা খোলা]

ভুবন :—(নামিতে নামিতে) প-প্নোতে রে! আমি ত-তখনই বলেছিলাম—দড়ি ছিঁড়বে। ওই শোন্, শব্দ হচ্ছে। এই—মা-ম্মাগো!

● অমরেশের পরিকল্পনা
শ্রীবিশ্বরূপ ভট্টাচার্য

পতিত :—বাবা গো !

[দড়ি ছিঁড়িয়া ভুবন পড়িল বিশ্বামিত্রের ঘাড়ে, আর পতিত পড়িল এস·ডি·ওর ঘাড়ে। দুইজনেই বিকট চীৎকার করিয়া ধরাশায়ী]



নরেশ :—জল—জল—একটু জল !

[নরেশবাবু উঠিয়া এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিল]

● অমরেশের পরিচালনা
শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য

[পরিতোষ একখানি ভাজা পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল। অমিয় বোকার মত চাহিয়া রহিল। পরাণের প্রবেশ]

পরাণ :—ফাস্‌টো এ্যাক্টো তো হ'য়ে গেল, ড্রপ্‌ ফেলে দেবো কী ?

অমিয় :—তাই দে।

পরাণ :—সেকেণ্ডো এ্যাক্টে পেছনে কী সিন দেব ?

অমিয় :—জেলখানা। পরীরা বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙতে গিয়ে হাকিমের ঘাড় ভেঙেছে !

পরাণ :—বেশ।

[সেইখানে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে হুইসল বাহির করিয়া সজোরে ফুঁ দিল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ্‌ নামিয়া আসিল]

আঁধারে আলো

● কোন কারাগারই কখনো কোন সত্যকে ধ্বংস করিতে পারে না। ইহা হয়ত কিছুক্ষণের জন্য বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, খানিকটা বিলম্ব ঘটাইতে পারে; কিন্তু অন্ধকার কারাগৃহে এই সত্য, বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধি পায়, এবং তাহা বিশ্ব আলোড়িত করিয়া তোলে।

—চার্লস্‌ ব্র্যাডল' (এম্‌-পি)

সুদূরের বাণী

অসহযোগিতা

যদি বিখ্যাত ভারতীয়দের মতামতও ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা হয়, যষ্টি-বিতাড়িত মূক পশুদের অপেক্ষা বেশী সম্মান যদি ভারতীয়দিগকে দেওয়া না হয়, যে সকল ব্যক্তিকে অপর দেশ সম্মান করিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যায় তাঁহারাও যদি স্বদেশে চূড়ান্ত অপমান ও অসহায় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে শাসকবর্গের প্রতি আমার একমাত্র বক্তব্য হইবে, "বিদায় বন্ধু, বিদায়! সাধারণের হিতার্থে তোমার সহিত যাবতীয় সহযোগিতার আশা এইখানেই সমাপ্ত!"

● গোপালকৃষ্ণ গোখেল

আলপনা—



বাংলারে যেই বেসেছিল ভালো
বাঙালীরে দিলো মান,
সেই মহামনা গোখেলে প্রণমি
উজাড়ি' সকল প্রাণ!



দুর্গেশ্বরী

—শ্রীকালিদাস রায়

বেলভাডি গড়ে দুর্গেশ্বরী হুঙ্কারি' কয়—"রাঘব রাও,
লুণ্ঠন করি' কারা চ'লে যায় সন্ধান নিয়ে মোরে জানাও।
নিরীহ শান্ত গ্রামবাসিগণ,
তাদের অন্ন করি' লুণ্ঠন,
কোন্ দস্যুরা গর্জ্জিয়া চলে? পথ রোধ কর, ত্বরায় যাও।"

গ্রামের প্রহরী নিবেদিল এসে ভয়-কম্পিত স্খলিত স্বরে,
"কর্ণাটপুরী নির্জ্জিত করি' শিবাজীর সেনা ফিরিছে ঘরে।
পথের দুধারে লুটিছে রসদ
প্রতিরোধীদের করিতেছে বধ,
বীর রঘুনাথ আগে আগে চলে গৈরিক কেতু তাহার করে।"

কহিল রাঘব, "নিরুপায় মোরা, শক্তি মোদের মুষ্টিমেয়।
শিবাজীর সেনা দক্ষিণাপথে কে না জানে মাগো অপরাজেয়!
সিংহের সাথে শিবার লড়াই
চালাতে পারিব, করি না বড়াই,
বন্যা ঝঞ্ঝা সম জেন এরে, নীরব থাকাই মোদের শ্রেয়।"

গর্জ্জি' উঠিল সাবিত্রী বাঈ, "একি কথা শুনি বীরের মুখে?
সিংহের সাথে সিংহী লড়িবে, সাজ রণ-সাজে দাঁড়াও রুখে।
প্রজা কি আমার হয়েছে মা-হারা?
যারই সেনা হোক, দস্যু তাহারা,
যুঝিব, বুঝিব কত বল ধরে, শৌর্য্য উঠুক গর্জ্জি' বুকে।"

এত কহি' দেবী সাবিত্রী বাঈ চর্ম্ম-বর্ম্মে আসিল সাজি',
বাহিরিল দ্রুত দুর্গ হইতে তরবারি করে আরোহি' বাজি।
গড়ের চূড়ায় উড়িল নিশান,
দেউড়ির পরে বাজিল বিষাণ,
গর্জ্জি' উঠিল তিন শত সেনা, "জয় সাবিত্রী বাঈ মাতাজি!"

তিন শত সেনা রণে আহ্বান করিল মাওয়ালি পঞ্চশতে।
অসম বিষম সমর বাধিল ধূলি-ধূসরিত গ্রামের পথে।
দুর্গেশ্বরী যুঝে আগে আগে
মাওয়ালি দস্যু সব ভয়ে ভাগে,
শোণিত-শমিত ধূলি-পথখানি ভরিয়া যাইল আহত হতে।

● দুর্গেশ্বরী
শ্রীকালিদাস রায়

জয়-গৌরব করিছেন ভোগ শিবাজী তখন কোহ্লাপুরে,
উড়িছে তাঁহার 'ভাগোয়া জেন্দা', বাজিছে ডঙ্কা দুর্গচূড়ে।
ছত্রভঙ্গ সেনাদল লয়ে
দাদাজী তখন ফিরিল সভয়ে,
বিজয়-পথের পরাজয়-গ্লানি ঘোষিত তখন নগর জুড়ে।



জুড়ি' দুই পাণি কহিল দাদাজী—"অদ্ভুত প্রভু সে বীরপণা!
লুণ্ঠিত ধন সবি লুণ্ঠন করিয়া লয়েছে বীরাঙ্গনা।

অবলার হেন শৌর্য্যত প্রভু
মহারাষ্ট্রেও দেখি নাই কভু,
শুনি নাই কভু রমণী করেছে এমন বাহিনী-পরিচালনা !”

শুনি’ শিবাজীর ভ্রূকুটি-কুটিল বক্ত্র হইল শঙ্কাবহ,
কহিলেন, “অসি ত্যাগ কর তুমি, সেনানায়কের যোগ্য নহ ।”
শান্ত হইলে দুর্দ্দম ক্রোধ
বলিলেন পুনঃ—“লও প্রতিশোধ,
বেলভাডি গড় কর অবরোধ দুই সহস্র সৈন্য সহ ।”

বিংশতি শত যোদ্ধা লইয়া দাদাজী আবার যাইল ফিরে,
প্রতিহিংসার উল্লাসে মাতি’ ছাউনী ফেলিল কেল্লা ঘিরে ।
গড়ের ভিতরে সাবিত্রী বাঈ
ভাবিল আর ত নিস্তার নাই !
তবুও মারাঠা শত্রুর করে সঁপিল না ভয়ে দুর্গটিরে ।

মাস দুই গেল, রসদ ফুরাল, খুলিল একদা লৌহ-দ্বার
সকলের আগে দুর্গেশ্বরী, রণ-দুর্গার মূর্ত্তি তার !
যে আসে সমুখে লুটে তার শির,
হঠে’ হঠে’ যায় বড় বড় বীর,
মরীয়া হইয়া আগাইল শেষে মারাঠা সাধুজী গায়কোবাড় ।

রমণী-হত্যা করিলে জানিত ক্ষমা করিবে না শিবাজী তায়,
বীরাঙ্গনার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিল বর্শা-ঘায়।



হাতে পায়ে তাঁর শিকল পরায়ে
অশ্বের পিঠে লইল চড়ায়ে,
বলিল, "পিশাচি, চল' এইবার কুকুরের মুখে সঁপি তোমায়।"

● [illegible]
[illegible] রায়

জয়-গৌরবে ফিরিয়া আসিল বিজয়ী সাধুজী গায়কোবাড় ।
ভাবিতে লাগিল কত না দারুণ দণ্ড হইবে স্পর্দ্ধিতার !
করিয়া বিবাদ শিবাজীর সাথে
পায়না রেহাই আফজলও তাতে,
হায়রে অবলা ! মনে মনে জপে কতই পাবে সে পুরস্কার !

শিবাজীর আগে বন্দিনী সহ দাঁড়ায়ে কহিল, "শয়তানীরে
আমিই বন্দী করিয়াছি প্রভু, ডান হাতখানা নিয়েছি ছিঁড়ে ।
সম্মুখে এর গিয়াছে যে জন
সে-ই মরিয়াছে, আমিই রাজন্,
চুল ধরে টেনে মাটিতে নামাই অশ্ব হইতে রাক্ষসীরে ।"

কহিল দর্পে সাবিত্রী বাঈ, "ভেবেছ জীবন যাচিয়া ল'ব ?
মরণে ডরি না ধর্ম্মের লাগি' সব যন্ত্রণা-পীড়ন স'ব ।
সহিয়াছি পথে বহু লাঞ্ছনা
অতি কুৎসিত গালি-গঞ্জনা
লুণ্ঠন আর নিরীহ-পীড়ন এই কি রাজার ধর্ম্ম তব ?

যাদের পালন-রক্ষণ-ভার দিলেন বিধাতা আমার করে
আমার জীবন রাজ্য ও ধন নিবেদিত সবি তাদেরি তরে ।
মাতৃ-ধর্ম্ম করেছি পালন,
তাহার দণ্ড করিতে বরণ
তাহারি জন্ম বরিতে মরণ সাবিত্রী বাঈ কভু না ডরে ।"

● [illegible]
[illegible]

বন্দিনী পানে চাহিয়া শিবাজী স্নেহ প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে,
হস্তপদের শৃঙ্খল তার খুলিয়া দিলেন আপন হাতে।
জুড়ি' দুই পাণি কহিলেন তিনি,
"বন্দিনী নও তুমি নন্দিনী,
ক্ষম মাগো, তব তেজোগৌরব বুঝিনি জয়ের অহমিকাতে!

বুদ্ধির দোষে এই অপরাধ আজিকে জননি ক্ষমিতে হবে।
ছত্রপতির ছত্রের গায় এই কলঙ্ক-চিহ্ন র'বে।
তুমি বীরবালা, তব সম্মান
রাখিতে পারেনি মূঢ় সন্তান,
তোমার গর্ভে জনম লভিয়া সাধ যায় মাগো ফিরিতে ভবে।

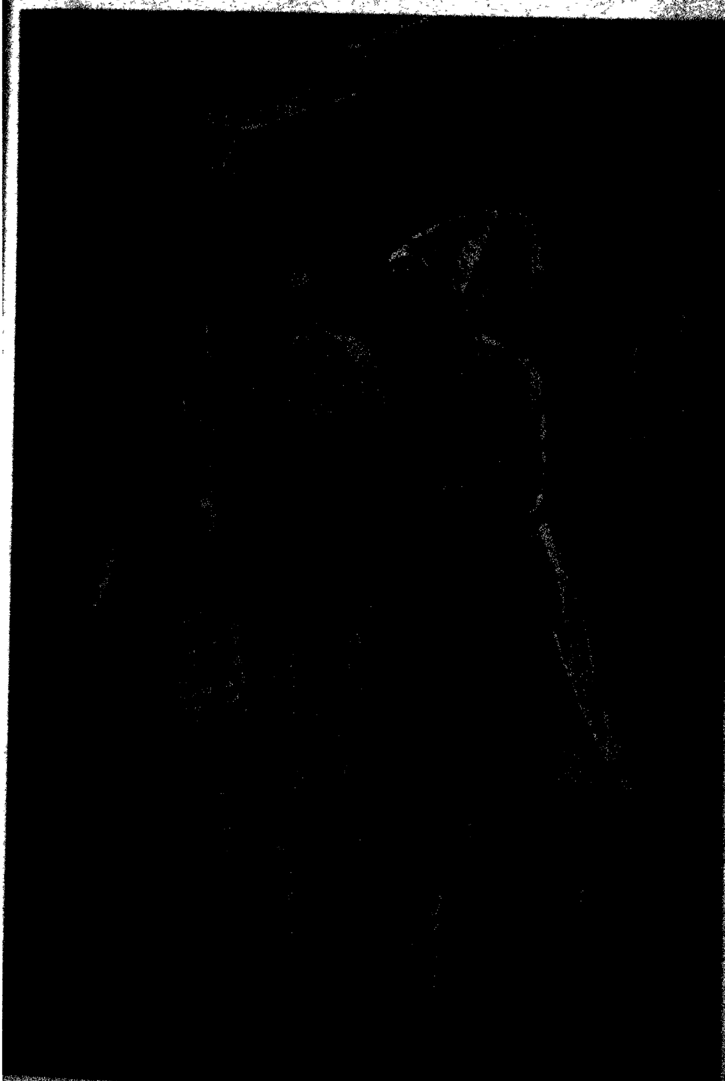
ফিরে যাও মাগো আপন দুর্গে, অধমে লজ্জা দিও না আর,
আজি হ'তে জেন এই সন্তান লইল তোমার সকল ভার।
এক ভুজ গেছে ফিরিবার নয়,
দশভুজা তুমি তোমার কি ভয়?
ফিরে যাও সতি, সব ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিব তব প্রজার।"

নামিল কাবেরী-প্রপাতের ধারা দুইটি নয়নে সাবিত্রীর,
স্তব্ধ সভায় দাঁড়ায়ে রহিল নতশিরে যত মারাঠা-বীর।
সাধুজী ধরিয়া দেবীর চরণ
কাতর কণ্ঠে কহিল তখন,
"ক্ষমা কর মাতঃ এই পশুটারে, তোমার চরণে লুটাই শির।"

দাদাজীর পানে চাহিয়া শিবাজী কহিলেন—"এরে বন্দী করি'
দাও কারাগারে, প্রায়শ্চিত্ত করুক তাহারই শিকল পরি'।
নারী-মর্য্যাদা রাখিতে না পারে
যেজন, শিবাজী ক্ষমেনাক তারে,
জানুক সবাই এই কথাটাই ঘোষণা কর এ রাজ্য ভরি'।



উচিত দণ্ড হ'ত সাধুজীর বাহুচ্ছেদন বিধান হ'লে,
রেহাই পাইল মরণে, দেবীর চরণে শরণ লয়েছে বলে।
পূরা অপরাধ নয়ক তাহার
তাই তার সাজা হ'ল কারাগার।"
"জয় সাবিত্রী মাতাজীর জয়!" ঘোষিল সকলে উচ্চ রোলে।





দুটো কাঁটাপেরেক

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চায়ের পিয়ালায় শেষ-চুমুক মেরে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্‌! তোমাদের মতন সখের গোয়েন্দার সঙ্গে আমাদের অনেক তফাৎ! তোমরা আরাম-কেদারায় ব'সে কাল কাটাও ফুলবাবুর মত, আর আমাদের করতে হয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিগ্বিদিকে ছুটোছুটি! তোমরা হচ্ছ তুলোর বাক্সে বন্দী আঙুরের মত, আর আমরা হচ্ছি বড় গাছের মস্ত ফলের মত,—সইতে হয় ঝড়ের ঝাপট! বুঝলে হে জয়ন্ত?"

জয়ন্ত মুখ টিপে খালি একটু হাসলে।

মাণিক বললে, "মস্ত কাঁটাল যতই ঝড়ে দুলুক, তবু কেউ তাকে বলবে না আঙুরের মতন ভালো!"

সুন্দরবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "আরে বাবা, আমরা হচ্ছি পাস-করা অ্যালোপ্যাথ্—সরকার আমাদের মানে। আর তোমরা কী হে বাপু? হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ্, যতই ভড়্ পাও—সরকার আমলেও আনবে না। সখের গোয়েন্দা! আরে হোঃ!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু আপনার উপমা দেবার শক্তি দেখলে মহাকবি কালিদাসও হিংসায় জ্বলতেন। কিন্তু আপাতত একটু থামুন, ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনছি।"



"বুঝেছি। আপনি হচ্ছেন সেই দলের লোক…" (পৃঃ—৫১)

"জয়ন্ত, ঘরে আছ হে?" বলতে বলতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন একটি ভদ্রলোক।

"আরে, নবীন যে! তোমার মুখের ভাব তো সুবিধের নয়, ব্যাপার কি?" জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে।

—"ব্যাপার গুরুতর। আমি সত্তর হাজার টাকা হারাতে বসেছি।"

—"বল কি হে?"

—"কাল আমার বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে।"

—"পুলিসকে জানিয়েছেন?" সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—"না। পুলিশের চেয়ে আমি জয়ন্তকে বিশ্বাস করি। তাই আগে এইখানেই এসেছি।"

—"হুম্! বুঝেছি। আপনি হচ্ছেন সেই দলের লোক, বাড়ীতে অসুখ হ'লে যারা হোমিওপ্যাথ্ ডাকতে ছোটে।"

নবীন বিস্মিত হয়ে বললে, "মানে?"

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবুর কথার মানে খুঁজো না নবীন, তুমি নিজের কথা ব'লে যাও।"

জয়ন্ত বললে, "তোমার কি চুরি গিয়েছে? টাকা, না গয়না?"

—"টাকাও নয়, গয়নাও নয়। চুরি গিয়েছে একখানা ছবি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এই যে বললেন আপনি সত্তর হাজার টাকা হারাতে বসেছেন?"

—"ঠিক তাই। এক সায়েব ঐ ছবিখানা সত্তর হাজার টাকায় কিনতে চেয়েছে!"

—"বাবা, ছবিখানা কত বড়?"

—"লম্বায় এক ফুট তিন ইঞ্চি, চওড়ায় এক ফুট।"

—"ধেৎ, যত বাজে কথা! ঐটুকু ছবির কখনো অত দাম হয়?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, যথাস্থানে খবর নিলেই শুনতে পাবেন, ওর চেয়ে ছোট ছবিরও ওর চেয়ে ঢের বেশী দাম হয়।"

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, "জানিনে বাপু, কালে কালে কতই শুনব!"

মাণিক বললে, "জীববিশেষ মুক্তাহারের মূল্য বোঝে না।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তার মানে, আমি হচ্ছি একটি বাঁদর?"

মাণিক দুষ্টু হাসি হেসে বললে, "তা কেমন ক'রে বলব? বাহির থেকে বাঁদরের সঙ্গে আপনার চেহারার কোন মিল নেই তো!"

জয়ন্ত বললে, "তোমরা জ্বালালে দেখছি। নবীন, ওদের ঝগড়ায় কাণ না দিয়ে তুমি তোমার ছবির কথা বল।"

নবীন বললে, "দিন-কয় আগে নিলাম থেকে পঁচিশ টাকা দাম দিয়ে আমি একখানা পুরাণো 'অয়েল-পেন্টিং' কিনে এনেছিলুম। ছবিখানার উপরে ভারি ময়লা জমেছিল ব'লে ভালো ক'রে পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি, তার এক কোণে ফুটে উঠেছে চিত্রকরের নাম!"

—"নামটি কি ?"

—"জ্যান্ ভারমিয়ার।"

জয়ন্ত বললে, "হল্যাণ্ডে সতেরো শতাব্দীতে জ্যান্ ভারমিয়ার নামে এক চিত্রকর ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দুইশত বৎসর ধ'রে কেউ তাঁকে প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে পারে নি। তারপর হঠাৎ লোকের দৃষ্টি পড়ে ভারমিয়ারের উপরে। এখন তিনি সারা পৃথিবীতে বড়-বড় ওস্তাদ ব'লে বিখ্যাত, আর তাঁর আঁকা ছবি বিক্রী হয় বহুমূল্য রত্নের মত।"

নবীন বললে, "হ্যাঁ জয়ন্ত, আমি বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে জেনে এসেছি, আমার ছবিখানি ঐ ভারমিয়ারেরই আঁকা।"

—"তাহ'লে ও-ছবির দাম সত্তর হাজার টাকা হবেই তো!"

—"এই অভাবিত আবিষ্কারের ফলে আমি যে অত্যন্ত খুসি হলুম, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমার সৌভাগ্য স্থায়ী হ'ল না। কাল আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম, আজ সকালে ফিরে এসে দেখি, বৈঠকখানার দেওয়ালে ছবিখানার 'ফ্রেম' রয়েছে, কিন্তু 'ফ্রেমে'র ভিতরে ছবিখানা আর নেই।"

—"কারুর উপরে তোমার সন্দেহ হয় ?"

—"চোর এসেছে বাহির থেকে, সন্দেহ করব কার উপরে ?"

—"চোর যে বাহির থেকে এসেছে, কেমন ক'রে জানলে ?"

—"ঘরের রাস্তার দিকের জানলার একটা লোহার গরাদে খুলে চোর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছে।"

—"কাল কখন্ তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে ?"

—"বিকাল সাড়ে-পাঁচটার পর।"

—"মাণিক, বলতে পারো কাল টিপ্-টিপ্ ক'রে বৃষ্টি নেমেছিল ক'টার সময়ে ?"

—"ঠিক সাড়ে-সাতটার পর।"

—"সে বৃষ্টি আজ সকালের [illegible] থামে নি। বর্ষা-রাতের অন্ধকারে পথে লোক-চলাচল ছিল না ব'লে চোরের [illegible] খুব সুবিধা হয়েছিল! নবীন, এইবারে তোমার বাড়ীর কথা বল।"

—"বাড়ীর কথা বলবার বিশেষ কিছুই নেই। জানোই তো আমি বিবাহ করি নি, চাকর-বামুন নিয়ে একলাই থাকি। আমার বাড়ীখানা চারতালা। একতালা আর দোতালা আছে আমার দখলে, তেতালায় আর চারতালায় থাকে দু-ঘর ভাড়াটিয়া।"

—"কে তারা ?"

—"তেতালায় থাকেন বিপিনবাবু, শেয়ার মার্কেটের দালাল, আমারই মতন অবিবাহিত। তাঁর সঙ্গে থাকে একটা লোক—সে একসঙ্গে পাচক আর ভৃত্যের কাজ করে। চারতালায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বাস করেন সন্তোষবাবু, তিনি সরকারী আপিসের কেরাণী।"

—"বিপিনবাবু আপনার ছবির দাম জানেন ?"

—"না। তবে তিনি আমার বন্ধুর মত, প্রায়ই বৈঠকখানায় এসে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যান, ছবিখানা তিনি দেখেছেন বটে।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল নবীন, এইবারে তোমার বাড়ীর দিকে পদচালনা করা যাক্। সুন্দরবাবু, আপনিও আমার সঙ্গে এলে খুসি হ'ব।"

—"হুম্, আমি গিয়ে কি করব ?"

—"ঘরের কড়িকাঠ গুণবেন। আসুন।"

নবীনের বৈঠকখানাটি খুব সাজানো-গুছানো। দেওয়ালের গায়ে নামজাদা চিত্রকরদের আঁকা দেশী-বিলাতী ছবি, ছোট-বড় পাথরের পুতুল, মেঝের পুরু কার্পেটের উপরে সোফা, কৌচ, চেয়ার।

চুরি-যাওয়া ছবির শূন্য 'ফ্রেমে'র দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, "য়ুরোপে-আমেরিকায় ছবিচোরদের যথেষ্ট উৎপাত আছে। এদেশে এ-রকম মামলা আমার হাতে এই প্রথম এসেছে। আচ্ছা নবীন, যে সায়েব এই ছবিখানা কিনতে চায় তার নাম কি ?"

—"ওয়াটসন।"

—"ছবিখানা এখানে টাঙানো থাকে, এটা কি সে দেখেছে?"

—"তা দেখেছে বৈকি!"

জয়ন্ত আর কিছু না ব'লে যে-জানলা দিয়ে চোর এসেছে তার সামনে গিয়ে



"হম্, আমি গিয়ে কি করব।" (পৃঃ—৫১)

দাঁড়াল। বাহির থেকে কেউ পাখির ফাঁকে হাত গলিয়ে আগে খড়খড়ি খুলেছে, তারপর একটা গরাদের মূলদেশের কাঠের 'ফ্রেম' কেটে গরাদেটা সরিয়ে ফেলেছে।

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, কিছু বুঝতে পারছেন?"

● ছুটো কাটা লেখক
হেমেন্দ্রকুমার রায়

—"হুঁঃ, এখানে আর বেশী বোঝবার কি আছে? চোর-ব্যাটা বাটালি কি ঐ-ধরণের কোন অস্ত্র দিয়ে যে জানলার 'ফ্রেমে'র খানিকটা কেটে গরাদেটা খুলে ফেলেছে, ঐ কাঠের কুচোগুলো দেখলেই তা বুঝতে দেরি লাগে না।"

—"এখানে কি আর কিছু বোঝবার নেই?"

—"কিছু না, কিছু না! একটা পায়ের দাগ পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না!"

মাণিক বললে, "আশ্চর্য্য! আমি কিন্তু জানলার কাছে পায়ের দাগ দেখবার আশা করছিলুম। কারণ—"

জয়ন্ত চোখ টিপে তাড়াতাড়ি বললে, "চুপ কর মাণিক! কারণ অনেক কিছুই থাকতে পারে, তা নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না।......নবীন, এইবারে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা হবে কি?"

—"বিপিনবাবু কাল সকাল থেকেই উদরাময়ের তাড়নায় শয্যাগত হয়েছেন, তিনি আজ নীচে নামতে পারবেন না।"

—"তিনি নেই বা নীচে নামলেন! তিনি যখন অবিবাহিত, আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করতে পারি। তুমি সেই ব্যবস্থাই কর। তাঁকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আমরা চারতালার সন্তোষবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে যাব।"

নবীন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, আমার কি মত জানো?"

—"বলুন।"

—"এখানে সময় নষ্ট না ক'রে তুমি ওয়াটসন সায়েবের খোঁজ নাও।"

—"হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার এ পরামর্শও আমি শুনব।"

একজন ভৃত্য এসে জানালে, "তেতালায় নবীনবাবু সকলকে ডাকছেন।"

জয়ন্ত বললে, "তুমি কি নবীনবাবুর লোক?"

—"হ্যাঁ হুজুর!"

—"কাল রাতে এখানে চুরি হয়ে গিয়েছে জানো?"

—"জানি হুজুর!"

—"চুরির পরে বৈঠকখানায় প্রথমে কে ঢোকে ?"

—"আমাদের বাবু।"

—"বৈঠকখানার ঘরের দরজা কি বাড়ীর ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল ?"

—"হ্যাঁ হুজুর !"

—"রাতে তুমি কি কোনই শব্দ শোনো নি ?"

—"না হুজুর ! আমার ঘুম ভারি খারাপ, সকাল না হ'লে ভাঙে না। বাড়ীর সবাই তা জানে।"

—"তুমি দেখছি আদর্শ ভৃত্য। আচ্ছা, যাও।"

তেতালায় একটি ঘরে বিপিনবাবু বিছানার উপরে শুয়ে ছিলেন। অস্নাত শুষ্ক মূর্তি, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। সকলকে দেখে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে তিনি উঠে বসবার চেষ্টা করতেই জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, "না, না, বিপিনবাবু, আপনি যে অসুস্থ আমরা তা জানি। আমরা খালি দু-একটা কথা জানতে এসেছি, আপনি শুয়ে শুয়েই আমাদের সঙ্গে কথা কইতে পারেন।"

ম্লান হাসি হেসে বিপিনবাবু বললেন, "ধন্যবাদ ! সত্যই আমি অত্যন্ত অসুস্থ। কাল সারাদিন কষ্ট পেয়েছি, রাত্রেও ঘুমোতে পারি নি।"

—"রাত্রেও ঘুমোন নি ? তাহ'লে কাল রাত্রে এ বাড়ীতে কোন সন্দেহজনক শব্দ শুনতে পেয়েছেন ?"

—"রোগের যাতনায় ছটফট করতে করতে কোনদিকে কাণ পাতবার অবস্থা আমার ছিল না।"

—"এটা খুবই স্বাভাবিক। তাহ'লে মিছেই আপনাকে কষ্ট দিলুম। আসি মশাই, নমস্কার ! চল নবীন, আমাদের চায়তালায় নিয়ে চল।"

চারিদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে দরজার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হেঁট হয়ে মেঝের উপর থেকে দুটো কি কুড়িয়ে নিলে !

মাণিক চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "কি জয়ন্ত ?"

—"দুটো কাঁটা-পেরেক।"

—"কাঁটা-পেরেক ?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে মুখ তুলে তাকালো। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দেখ মাণিক, দেখ! কি সুন্দর ছবি!"

মাণিক দেখলে, কিন্তু ছবির মধ্যে কোন সৌন্দর্যই সে আবিষ্কার করতে পারলে না। নিতান্ত চলনসই একখানা নিসর্গ-চিত্র—আকাশ, পাহাড়, ঝরণা ও ঘাসজমি।

জয়ন্ত বললে, "ছবিখানা আমার এত ভালো লেগেছে যে ওখানাকে নামিয়ে চোখের আরো কাছে এনে দেখতে চাই" ব'লেই সে তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার টেনে এনে তার উপরে উঠে দাঁড়াল।

পিছন থেকে বিকৃত স্বরে বিপিনবাবু বললেন, "মশাই, মশাই! আপনার এ অন্যায় স্বাধীনতা আমি সহ্য করব না!"



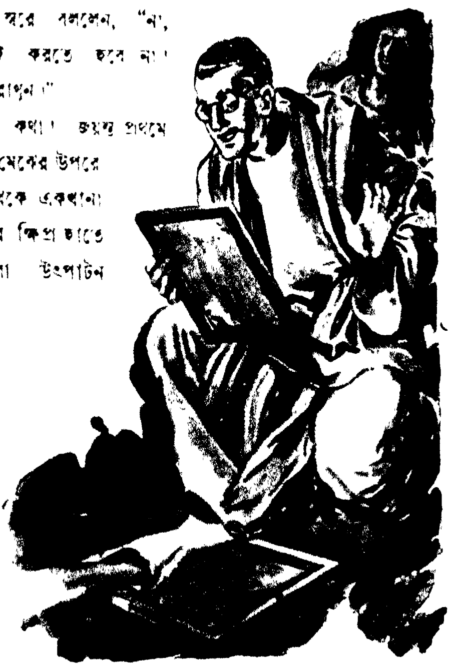
সে তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার টেনে এনে তার উপরে উঠে দাঁড়াল।

● দুটো কাঁটা পেরেক
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ততক্ষণে জয়ন্ত ছবিখানা নামিয়ে উল্টে তার পিছনদিকটা দেখে নিয়ে বললে, "বিপিনবাবু, আপনার ছবির 'ফ্রেম' থেকে দুটো কাঁটা-পেরেক খুলে গিয়েছে। এ তো ভালো কথা নয়, এর ব্যবস্থা করা উচিত।"

বিপিনবাবু রোষরুদ্ধ স্বরে বললেন, "না, আপনাকে কোন ব্যবস্থাই করতে হবে না। আমার ছবি আবার টাঙিয়ে রাখুন।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। জয়ন্ত প্রথমে ছবিখানাকে উপুড় ক'রে মেঝের উপরে রাখলে। তারপর পকেট থেকে একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি বার ক'রে ক্ষিপ্র হাতে 'ফ্রেমে'র কাঁটা-পেরেকগুলো উৎপাটন ক'রে ফেললে।



"আরে একি! ছবির পিছনে ছবি!"

তারপর ছবির পিছনদিককার পুরু কাগজখানা তুলে নিয়ে বললে, "আরে একি! ছবির পিছনে ছবি! দেখ তো নবীন, এ ছবিখানা চিনতে পার কি না?"

নবীন অভিভূত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "এই তো আমার ভায়রাভায়ের ছবি!"

জয়ন্ত রূপোর শামুক-নস্যদানী বার ক'রে একটিপ্ নস্য নিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আমাদের বিপিনবাবুকে অতঃপর আপনার হাতেই সমর্পণ করলুম।"

● দুটো কাঁটা পেরেক
হেমেন্দ্রকুমার রায়

জয়ন্ত বললে, "চোর যে বাড়ীর ভিতরকার লোক, আর সে যে পুলিসকে বিপথে চালনা করবার জন্যে বৃথা চেষ্টা করেছে, নবীনের বৈঠকখানার জানলার কাছে গিয়েই আমি সেই সত্যটা আবিষ্কার করতে পেরেছিলুম। চোর যদি বাইরের লোক হয়, সে এসেছে কাল রাতে—যখন টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। চোরের পা কর্দ্দমাক্ত হ'তে বাধ্য, কিন্তু জানলার কোথাও বা ঘরের ভিতরে কাদামাখা পায়ের কোন ছাপই নেই, সুতরাং চোর রাস্তা থেকে আসে নি।

তার উপরে দ্বিতীয় সূত্র। বাইরের চোর জানলার চৌকাঠ কাটত বাহির থেকে—সে ক্ষেত্রে চৌকাঠের বাহির দিকেই বাটালি চালনার চিহ্ন থাকত। কিন্তু বৈঠকখানার জানলার ভিতরদিককার চৌকাঠেই চোর চালিয়েছে বাটালি, অতএব চোর বাড়ীর লোক না হয়ে যায় না। বৈঠকখানার দরজায় কুলুপ লাগানো ছিল বটে, কিন্তু বাড়ীর লোকের পক্ষে কুলুপের জন্যে দ্বিতীয় চাবি সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

চোর যদি বাড়ীর লোক হয় তাহ'লে কে সে? ভৃত্যদের কথা ছেড়ে দি, ছবির মূল্য তারা বোঝে না। চারতলার সন্তোষবাবু সাধারণ সংসারী মানুষ, নিরীহ কেরাণী, তিনিও সন্দেহের অতীত বললেও চলে। বাকি রইল বিপিন। ছবিখানা সে স্বচক্ষে দেখেছে, হয়তো ভারমিয়ারের নামও সে জানে। কিংবা কোন গতিকে এই ছবির বাজার দরও তার কাণে উঠেছে। আমার সন্দেহ গেল তার দিকেই।

নবীন এত তাড়াতাড়ি আমাকে খবর দিয়েছে যে, আমার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, বিপিন যদি চোর হয় তবে ছবিখানাকে এখনো বাড়ীর বাইরে সরিয়ে ফেলতে পারে নি। ছবি নিশ্চয়ই তার ঘরের ভিতরে আছে। কিন্তু কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে বিপিনের ঘরে গেলুম। দরজার কাছে পেলুম দুটো কাঁটা-পেরেক—যে-রকম কাঁটা-পেরেক থাকে ছবির 'ফ্রেমে'। মনে মনে ভাবলুম, এখানে কাঁটা-পেরেক প'ড়ে আছে কেন? পুরনো পেরেক—নিশ্চয় কোন ছবির 'ফ্রেম' থেকে তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কোন্ ছবিতে পেরেক দুটো ছিল? সন্দেহ হ'ল ঠিক দরজার উপরকার ছবিখানাকে।

হঠাৎ আমার মাথার ভিতরে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত জেগে উঠল—এইরকম

ইঙ্গিতই যুগে যুগে ডিটেকটিভদের সমস্ত সমস্যার সমাধান ক'রে দেয়! তৎক্ষণাৎ ছবিখানাকে পেড়ে দেখি—আমার সন্দেহ সত্য, 'ফ্রেমে'র গায়ে ঠিক দুটো পেরেকের অভাব! তারপরেই ছবির পিছন থেকে বেরিয়ে পড়ল দ্বিতীয় ছবি!

বিপিন পেরেক খুলে চোরাই মাল ছবির পিছনে লুকোবার সময়ে দেখতে পায় নি, দুটো পেরেক স্থানচ্যুত হয়ে মেঝের উপরে প'ড়ে আছে! ঐ দুটো তুচ্ছ কাটা-পেরেকই তাকে ধরিয়ে দিলে!"

আঁধারে আলো

● প্রত্যেক মানুষের কাছে, তার সুনাম হলো, তার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য।

যে আমাদের টাকাকড়ি কেড়ে নেয়, সে আমাদের কিছুই কেড়ে নিতে পারে না। কারণ, টাকার নিজের কোন মূল্য নেই। আজ সে তোমার, কাল সে আমার, পরশু দিন আবার আর একজনের হবে; কিন্তু যে আমার সুনাম কেড়ে নেয়, সে আমার যথাসর্বস্বই কেড়ে নেয়। তাতে সে ধনী হয় না বটে, আমাকে কিন্তু একেবারে নিঃস্ব করে দেয়।

—সেক্সপীয়ার



—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন থেকে মনে বড় সাধ ছিল, পায়ে হেঁটে বাংলাদেশকে দেখবো।

কিন্তু ছোটছেলে বলে কেউ আমার কথা কানেই তুলতো না। সকলের মুখেই এক কথা, বড় হ', তখন যাবি!

তাই প্রবেশিকা পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন আর কারুর কোন ওজর-আপত্তি না শুনে আমি স্থির ধরে নিলাম যে, বড় হয়েছি। সুতরাং ছেলেবেলা থেকে মনে যে সাধ পুষে রেখেছিলাম, আজ তাকে চরিতার্থ করতে হবে।

কোথায় যাব?

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে-ও বাংলাদেশ···যতদূর চোখ যায়, মাথার উপরে দেখি বাংলার আকাশ, পায়ের তলায় অনুভব করি বাংলার মাটী!

মন বলে ওঠে, না, না, এ বাংলা নয়···এই বাংলার মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে আছে আর এক বাংলা···যে বাংলাকে দেখেছি শুধু ইতিহাসের পাতায়—শুনেছি যা নাকি আজও পড়ে আছে, বুনো জঙ্গলে, ভাঙ্গা মন্দিরে, মাটীর তলায়, পদ্মার গর্ভে···

কোথায় গেলে তার দেখা পাই? ম্যাপ খুলে দেখলাম, মুর্শিদাবাদ···আলিবর্দ্দির বাংলা···সিরাজের বাংলা···পলাশীর বাংলা···

ট্রেনে চড়ে বসলাম···প্রথমেই স্থির করলাম, যাব, সিরাজের সমাধি দেখতে··· ট্রেন ছেড়ে নৌকোয় উঠলাম···

বর্ষাকাল···গঙ্গা, দু'তীরে টই টম্বুর···

মাঝি একটা ঘাটে নৌকো লাগিয়ে বলো, ওইখানে নেবে যান বাবু!

নেবে যাব কোথায়? চারদিকে জল আর কলমী লতার বন!

আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে মাঝি বলে উঠলো, দেখছেন কি? পথ যা ছিল তা জলে ডুবে গিয়েছে। এই কলমী-বন ঠেলে যেতে হবে!

অগত্যা তাই নামলাম। এক কোমর জল। হাতে-পায়ে জড়িয়ে যায় কলমী-লতা। কি মনে হলো, একটা লতার খানিকটা জল থেকে টেনে তুলে নিলাম। খানিকটা দূর জল ঠেলে মাটিতে গিয়ে উঠলাম···সামনেই ছোট্ট পাঁচিল-দেওয়া একটা সামান্য সমাধি মন্দির···চারদিক নীরব···জন মানবের সাড়া নেই···নীরবে সেখানে বাংলার শেষ নবাব ঘুমুচ্ছেন···

আস্তে-আস্তে ভেতরে ঢুকে দেখি, পাশাপাশি তিনটা সমাধি···তার একটাতে সেই কলমী-লতা জড়িয়ে দিলাম···অস্ফুট স্বরে বললাম, হে সিরাজ, এই রইলো আমার প্রণামী!

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এলো ঝড়···তুমুল ঝড়··দেখতে-দেখতে আশে-পাশের বন-জঙ্গল যেন আর্তনাদ করে উঠলো···যেদিকে যাই, সেদিকেই বন···

দেখতে-দেখতে মুষলধারায় এলো বৃষ্টি···তীরের মতন গায়ে এসে বিঁধতে লাগলো···ভিজে নেয়ে গেলাম···

তখনও সন্ধ্যার অনেক বাকি ছিল, কিন্তু কালো মেঘে অকাল-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো··· চোখ চাইতে গেলে চোখে এসে জলের ঝাপটা লাগে···সোজা পা ফেলতে পা টলে যায়, ভিজে এঁটেল মাটিতে পিছলে যায়···

কোন রকমে কিছু দূর এগিয়ে এসে দেখি, এক বনের ধারে এক পোড়ো বাড়ী··· কঙ্কালসার···ছোট-ছোট ইঁট ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গিয়েছে···দরজার খিলেন নেই···কপাট নেই···

● পোড়ো বাড়ী
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শুধু একদিককার খানিকটা গাঁথুনি আছে…সামনের মহলার সব কিছু ভেঙে গিয়েছে…শুধু একখানা ঘর আছে…তার আবার ছাদ নেই…সেই ঘরের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, ভেতর বাড়ী…একতলাটা সব একাকার হয়ে বন-জঙ্গল হয়ে গিয়েছে…তার ওপর দোতলার খানিকটা অংশ এখনো আছে…

তবুও যা হোক্, একটু দাঁড়াতে পারা যাবে, মনে করে ভেতরে ঢুকলাম…

ঢুকেই দেখি, ভেতর বাড়ীর এক কোণের এক ঘরে যেন আলো জ্বলছে…

সাহসে ভর করে ডাকলাম, কেউ আছেন ?

ঝড়ে কোথায় কাছে একটা গাছ বোধ হয় পড়ে গেল…আমার গলার আওয়াজ তাতেই ডুবে গেল…

ফের জোর করে ডাকতে যাব, এমন সময় দেখি, সেই ঘরের আলোটা যেন নিভে গেল…



একটা শেয়াল ভিজতে-ভিজতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

একটা শেয়াল ভিজতে-ভিজতে উঠোনের এপার দিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল…ডাকতে গিয়ে আর ডাকতে পারলাম না…মনে হলো, কেউ নেই…তবে যে একটু আগেই আলো জ্বলতে দেখেছিলাম ? দেখার ভুল হতে পারে…

এমন সময় কড়্-কড়্ করে মাথার ওপরে বাজ ডেকে উঠলো…বিদ্যুৎঝলকে

চমকে উঠলাম···কি একটা পাখী বিশ্রী ডেকে উঠলো···চারদিকে ভিজে অন্ধকার যেন ছিমে জমে উঠলো···ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠলো···

এমন সময় বাইরে থেকে দেখি, আর একজন লোক আমার দিকেই আসছে··· এতক্ষণ পরে একজন মানুষের চেহারা দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম !

লোকটি সোজা আমার দিকে এগিয়ে এসে বলে উঠলো, ইস্, ভিজে যে গোবর হয়ে গিয়েছ···ভেতরে এসো···এসো···

বল্লাম, এটা বুঝি আপনার বাড়ী ?

লোকটি হেসে বল্লো, না···

—তবে ?

—তোমার ভয় নেই হে ছোকরা ! আমি যখন ডাকছি, তখন নিশ্চিন্তে আসতে পার ! বাড়ী আমার, কি কার, তা জেনে তোমার কি লাভ বলো ?

সত্যিই তো ! তখন একটু শুকনো জায়গাতে বসতে পেলে বাঁচি ! আর কোন কথা না বলে, লোকটির পিছু-পিছু বাড়ীর ভেতরে ঢুকলাম···

উঠোন পেরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম···ভীষণ অন্ধকার ঘর···কিছু দেখা যায় না···

শুনলাম লোকটি বলছে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বস ?

—বসবো কোথায় ? কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না ! একটা আলো জ্বালুন না !

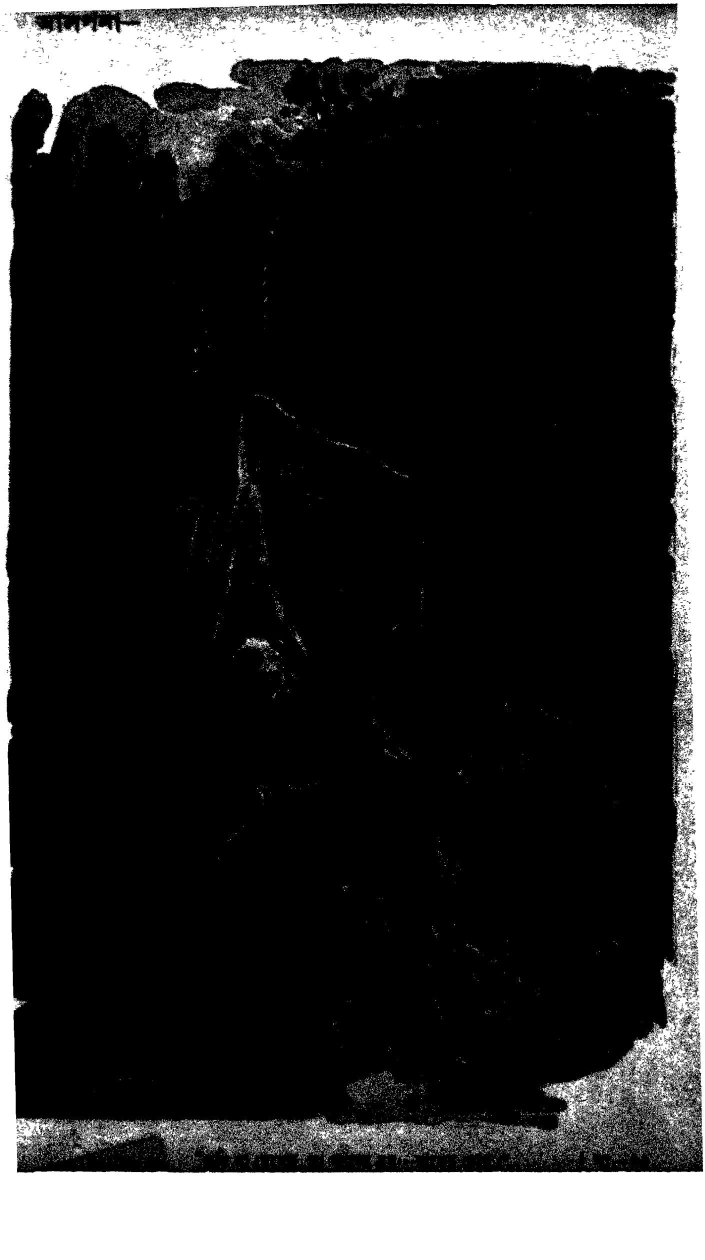
লোকটা বিকট হেসে উঠলো···অন্ধকারে তার পাথরের মত শাদা দাঁতগুলো ঝিলিক মেরে উঠলো···

বল্লো, আলো তো এ বাড়ীতে আর জ্বলে না !

আমি বল্লাম, একটু আগেই যে দেখেছি, সামনের কোন্ ঘরে যেন আলো জ্বলছিল···

লোকটা হেসে বলে উঠলো, তুমি যা দেখেছ, তা আলো নয়···বাঘের চোখ !

আমি চমকে উঠলাম···বল্লাম, আমাকে ছোট ছেলে পেয়ে আপনি ভয় দেখাবেন মনে করেছেন ?



লোকটি বল্লো, মোটেই না···বহুদিন থেকে বাঘটা এখানে আছে···এত বুড়ো যে, শিকার ধরবার শক্তি নেই···যত উপোস করে, ততই তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে··· দূর থেকে দেখলে তাই মনে হয়, যেন আলো জ্বলছে···

বল্লাম, তা বাঘের এত কাছে থাকতে আপনার ভয় করে না?

—এত সামান্য ব্যাপারে ভয় করলে তো আমাদের চলে না···আমরা তান্ত্রিক··· ভয়কে জয় করাই হলো আমাদের সাধনা···তাই যেখানে সব চেয়ে বেশী ভয়, সেইখানে থাকতে আমাদের তত আনন্দ···তুমি বসো···আমি একটু ভেতর থেকে আসছি···

আমি বল্লাম, এ-বাড়ীর আরো ভেতর আছে নাকি?

—নিশ্চয়ই! তুমি যে মহলায় দাঁড়িয়ে আছ, তার সামনে আরো পাঁচমহলা আছে···এ যে সাতমহলা বাড়ী···

জিজ্ঞাসা করলাম, এর মালিক কে?

—এর মালিক যারা ছিল, আজ আড়াইশো বছর হলো তারা সব মরে গিয়েছে, মরবার সময় আমার ওপর ভার দিয়ে গিয়েছে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। একটু রেগেই বলে উঠলাম, আপনি বলতে চান, আড়াই শো বছর ধরে আপনি বেঁচে আছেন?

লোকটি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বল্লো, শুধু আমি নই···আমি ছাড়া এই বাড়ীতে আরো দুটি প্রাণী আছে···

—কে তারা?

—একটিকে তুমি দেখেছ···অবশ্য তার একটা চোখই দেখেছ—ঐ বাঘ···আর একটি প্রাণী হচ্ছে···একটি ছোট্ট মেয়ে···

—আপনার কথা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না—আড়াই শো বছরের ছোট্ট মেয়ে!

—হাঁ, গো হাঁ! তা আড়াই শো বছর আর কতটুকু সময়? তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, তাতে আমার কিছু যায় আসে না···আমি আর তোমায়

সঙ্গে এখন তর্ক করতে পারি না—আমার সময় হয়ে গিয়েছে—এখুনি ভেতরে যেতে হবে···

—কেন, ভেতরে এমন কি দরকারী কাজ ?

—তারা রোজ এই সময় আসে···মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যে···আমি যদি মেয়েটিকে আগলে না থাকি, তাহলে তারা নিয়ে যাবে—

ক্রমশ: আমার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়েই চলেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কারা ?

এমন সময় হঠাৎ মনে হলো, সমস্ত বাড়ীটা যেন দুলে নড়ে উঠলো···তার ভাঙ্গা দরজা-জানলাগুলো অন্ধকারে যেন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেল···সে কি বিকট, বীভৎস আওয়াজ···

লোকটি আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে চলে গেল···আমি বিহ্বল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম···দাঁড়িয়ে রইলাম বটে, কিন্তু আমার পা যেন টলে-টলে যেতে লাগলো···শূন্যে ঘরের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের যেন তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগলো··· সে তরঙ্গের জোরে দাঁড়িয়ে থাকি, এমন শক্তিতে কুলোলো না···আমি বসে পড়লাম···

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না···দেখলাম, সেই বর্ষার অন্ধকারে আমার চোখের সামনে দিয়ে অসংখ্য অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল···তাদের চলার শব্দে বাতাসে ঝড় জেগে উঠলো···তাদের কোমরের তলোয়ারের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে যেন আকাশ চিরে-চিরে যেতে লাগলো···বিদ্যুৎ-বেগে তারা আমার সামনে দিয়ে চলে গেল···

আমি দুহাত দিয়ে চোখ বুঁজে বসে রইলাম···কতক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখি··· অন্ধকারে ঘরের সামনে উঠোন দিয়ে, এক-এক সারিতে দুজন করে···শাদা···দুধের মত শাদা···মানুষের কঙ্কাল কুচ-কাওয়াজ করে চলেছে···তাদের হাড়ে-হাড়ে চলতে গিয়ে খট্‌-খট্‌ করে শব্দ হচ্ছে···চলতে গিয়ে যেন তারা দুমড়ে পড়ছে···অথচ পড়ে যাচ্ছে না···ঠিক দুজন করে চলে যাচ্ছে···

● পোড়ো বাড়ী
[illegible]

তারপর আর কিছু দেখতে পেলাম না…বোধ হয়, আমার জ্ঞান ছিল না…দেখি, লোকটি এসে আমাকে ডেকে তুল্লো…বল্লো,

—কি, ভয় পেয়েছিলে বুঝি ?

মিথ্যা কথা বলে কি লাভ ? বল্লাম, হাঁ!

—প্রতিদিন ঠিক এমনি সময়ে ওরা সব আসে…মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যে…

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কারা ?

—ওরা হলো বাংলার মৃত সৈনিকের দল…পলাশীর প্রান্তর থেকে ওরা রোজ এই সময় আসে…আমার জন্যে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে পারে না…

ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি কোথায় ? তাকে একবার দেখা যায় না ?

—কেন দেখা যাবে না ? মেয়েটি ঐ সামনের ঘরেই আছে …সেই সেদিন থেকে ও শয্যা নিয়েছে—জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে …ওর মুখে জল দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে তোলে, এত বড় বাংলায় এমন একটা লোক নেই !



সাদা…দুধের মত সাদা…মানুষের কঙ্কাল… [পৃঃ—৬৬

—কেন ? এত লোক থাকতে, কেউ ওর মুখে একফোঁটা জল দিতে পারে না ?

● পোড়ো বাড়ী
[illegible]

—যার-তার হাতের জল ও খাবে না! জীবনে যে ভয়কে জয় করেছে, তারই হাতের জলের জন্যে ও বেঁচে আছে···আমিও তাই এই পোড়ো বাড়ী আগলে বসে আছি, যদি কোন বাঙালীর ছেলে এসে ওর মুখে জল দিতে পারে! কিন্তু আজও পর্য্যন্ত একজনেরও দেখা পেলাম না!

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, আমি দেবো!

লোকটি হেসে বলে উঠলো, তোমাকে দেখে আমার সেই আশা হয়েছিল; কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম, তুমিও ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে আছ···

আমি ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়লাম···আমি যে ভয় পেয়েছিলাম, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই!

তবুও আমি বল্লাম, বেশ, আমাকে সময় দিন, আমি আবার আসবো···সেদিন দেখবেন, আমি ভয়কে জয় করে এসেছি···তবু, আজ একবার মেয়েটিকে দেখতে পাই না?

লোকটি বলে উঠলো, না, আজ নয়···যেদিন ভয়কে জয় করে আসবে, সেদিন সে আপনিই তোমাকে দেখা দেবে···এই তার ব্রত···ফিরে গিয়ে তোমার বন্ধুদের বলো···গঙ্গার ধারে এক ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীতে ব্যাঘ্রবাহিনী এক মেয়ে অনশনে শয্যায় ব্রত নিয়ে শুয়ে আছে···তোমাদের মধ্যে ভয়কে জয় করে যে তার কাছে আসতে পারবে, সেই দেবে তাকে নতুন জীবন, নতুন আয়ু···

বলতে-বলতে লোকটি অন্ধকারে কোথায় চলে গেল···ডেকেও আর সাড়া পেলাম না···

সেদিন মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, গঙ্গার তীরে পোড়ো বাড়ীতে হে ব্যাঘ্রবাহিনী মেয়ে, আমি যাব তোমার কাছে···

আঁধারে আলো

● বাঙালীকে বাঙালী রক্ষা না করিলে, কে রক্ষা করিবে?



বংশ গৌরব—

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জায়গীর আর লক্ষ টাকার তন্‌কা দিবেন তারে
যদি কোনো জন 'বান্দা' বীরের সন্ধান দিতে পারে।
গোপন করিয়া রাখিবে যে তারে, যাবে তার ধন-প্রাণ,—
ঢোল-সহরেতে জানাইয়া দিল নবাবের ফরমাণ।

বরষের পর 'সিপাসাল্লারে' জানালো গুপ্তচর,
জানে সন্ধান বালক জনেক,—দূর পল্লীতে ঘর।
সংবাদ পেয়ে অশ্বে আরোহি' সেনানী দেখেন গিয়া,
প্রিয়-দর্শন কৃষক-কুমার যায় মরুপথ দিয়া।

রাজ-অশ্বের গতি-সৌষ্ঠব ভুলালো বালক-মন,
দূর হতে কাছে আগাইয়া এলো করিতে নিরীক্ষণ।

সেনানী তাহারে ডাকিয়া নিকটে বলেন, 'চড়িবে? চড়—
কিন্তু ঘোড়াটি সাম্‌লানো দায়, তেজী ও দুষ্ট বড়।'
বালক হাসিয়া চাপি' সে অশ্বে অগ্নি ছুটায়ে খুরে
মুহূর্ত্তে এলো নিপুণ সওয়ার মাইল দু-এক ঘুরে।
সাবাসি' তাহারে কাছে বসাইয়া দিয়া মোহরের তোড়া,
এবং তাহার আকাঙ্ক্ষিত সে সাজানো আরবী ঘোড়া,
বলেন সেনানী, 'কোথায় বান্দা? সংবাদ বল তার,
দিলাম যা তার দশগুণ পাবে অধিক পুরস্কার।'

মাত্র বয়স দ্বাদশ বর্ষ—ক্ষুদ্র বালক শিখ্
'জানি আমি বটে—বলিব না,' বলি' দাঁড়াইল নির্ভীক
'নাথু সিংহের বংশে জনম, উহা কি মোদের শোভে?
হীন কাজ কেহ করিতে পারিনে পুরস্কারের লোভে।'

রুষিয়া সেনানী পৃষ্ঠে তাহার চাবুক মারিল জোরে,
চাবুকের পর চাবুক চালায়—বালক তবু না নড়ে!
চোখ ফেটে জল টস্ টস্ পড়ে, পড়ে সে ধূলায় লুটি'
'জানি আমি বটে, বলিব না,' ফের দাঁড়ায়ে বলিল উঠি'।
সুন্দর দেহে রাঙা রাঙা দাগ, শোণিত-বিন্দু ঝরে।
কঠোর-কঠিন সেনানী-হৃদয় তাহাও কেমন করে।
তবু নির্দ্দয়, তবু নির্ম্মম, প্রহারে ঘাতকবৎ,
দয়া দেখাইতে দেয় না নিঠুর কর্ত্তব্যের পথ।

● বাল গৌরব
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

খুলি' তরবারি বলেন সেনানী, 'বলে দাও সন্ধান,
নতুবা ইহার একটি আঘাতে লইব তোমার প্রাণ।'



বালক বলিল, 'গোপন কাহিনী গোপন রাখিতে জানি
নাথু সিংহের বংশীয় মোরা, করিনে কাহারো হানি।
জয় গুরুজীর!—অনিষ্ট করা! করিবে করুক যারা,
জননী বলেন হয় নি এবং হবে না মোদের দ্বারা!'

● বাল গৌরব
[illegible]

সেনানী দারুণ বিস্মিত হয়ে ধরিয়া চুলের মুঠি
বলেন, 'এটা তো বালক নয়কো, আগুনের ফিন্‌কুটি !



দশ বিশ লাখে সৈন্য দেখেছি মহা-মহা বীর কেহ,
হেন দুর্জ্জয় দেখিয়াছি কিনা হয় মোর সন্দেহ !
কৈশোর যার এত উজ্জ্বল, ভাবিতেছি আমি মনে
এ শিখের শিখা প্রখর কি হবে অনাগত যৌবনে !'

● বাল গৌরব
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বলিলেন, 'যাও সিংহ-শাবক, দিলাম তোমারে ছাড়ি',
লয়ে যাও তুমি, দিনু উপহার—এই প্রিয় তরবারি।

✿ ✿ ✿ ✿

বালক-বীরের এই সে কাহিনী এখনো চারণে গায়
গৌরব তার উজ্জ্বল করেছে বংশ-মর্য্যাদায়।
বংশধরেরা পূজে তরবারি—ভাবে তা শ্রেষ্ঠধন,
দৃঢ়তার তাহা পুরস্কার—আর স্নেহের নিদর্শন!

আঁধারে আলো

● রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দেশের ধর্মনীতি রক্ষা করিয়াছে। আমাদের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজী গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া থাকে।

কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার, এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।

—রাজনারায়ণ বসু

সুদূরের বাণী

পূজার মন্ত্র

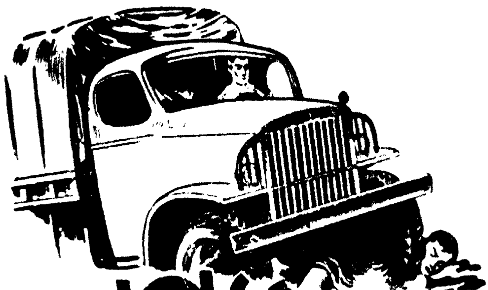
কোথায় কূল পাইলাম বলিতে পারি না; কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, ডাকিলাম, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে, আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর! * * * তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর! * * এসো মা, গৃহে এসো, ছয় কোটী সন্তানে একত্রে এককালে, দ্বাদশ কোটী কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটী মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্য-দায়িকে! * * * শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! এই ছয় কোটী মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—* * এই ছয় কোটী দেহ তোমার জন্য পাতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটী চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো! যাঁহার ছয় কোটী সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

● বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলপনা—



জাতীয় যজ্ঞে আজিও যাহার
পূজায় পুণ্য-মন্ত্র গায়,
ঋষি বঙ্কিম—ঋত্বিক্ সেই
প্রণমি আমরা তাঁহারি পায় !



ভাগ্যলক্ষ্মী

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক-তলার খাবার ঘর থেকে মা ডাকলেন —নীলু…নীলু…

দোতলার কামরায় মণ্টু পোষাক পরছে। বেলা তিনটে বাজে! মাঠে আজ মোহন-বাগানের ম্যাচ্… এখনি না বেরুলে যা হবে…

মায়ের ডাক চলেছে সমানে! মণ্টু ভাবলে, নীলু তো…নিশ্চিন্তার নির্লিপ্ত কোথায় বসে আছে…কারো ডাকে সে সাড়া দেয় না। কেয়ার করে না যেন!

নতুন চাকর! বয়স চোদ্দ-পনেরো বছর…সম্ভ বাহাল হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে চাকর-বামুন নিয়ে বিভ্রাট কার বাড়ীতে নয়? কিন্তু মণ্টুর বাড়ীতে এ-বিভ্রাট সবচেয়ে বেশী!

ছ'মাসের মধ্যে পাঁচটা চাকর এলো-গেল…বাবা মাহিনার হার বেশ বাড়িয়ে দেছেন, তবু চাকর টেঁকে না। দু'দিন, চারদিন…বড় জোর সাতদিন! কোনো চাকর বলে,—দিল্ লাগছে না…এ-কাম করবে না। কেউ বলে,—দেশ থেকে খবর এসেছে, বহুর ভারী ব্যামো!…আসলে কিন্তু এ-সব কিছু নয়…যুদ্ধের বাজারে কুলি-গিরিতে ডেলি-মজুরি মিলছে তিন টাকা, চার টাকা করে…যুদ্ধের দৌলতে যে-সব লোক কনট্রাক্টের কাজে লাল হয়ে উঠছে, টাকা তাদের কাছে খোলামকুচি! তারা মজুরী দিচ্ছে দিনে দু'টাকা, আড়াই টাকা! কলকাতায় টাকার হরির-লুট চলেছে যেন!… সহরে এসে সে হরির-লুট কুড়োবে না, এমন বেকুব ওরা সত্যি নয়।

পোষাক পরে মণ্টু বেরিয়ে এলো সিঁড়ির সামনেকার দালানে। জুতো পায়ে দেবে …জুতো-জোড়া টেনে দেখে, কাল তাতে যেমন ধুলো লেগেছিল তেমনি আছে…

সকালে সব-জুতোয় ব্রাশ্ চালাবে নীলু, তার ডিউটি। বয়ে গেছে তার সে-ডিউটি করতে!

রাগে সর্ব্ব-শরীর জ্বলে উঠলো—জুতো-জোড়া হাতে ঝুলিয়ে নেমে এলো··· একেবারে মায়ের কাছে। বললে—দেখছো তোমার ঐ আহ্লাদে-চাকরের কাজ! জুতো-জোড়া ঝেড়ে ব্রাশ্ করবে, তা খেয়াল নেই! সত্যি মা, ওকে তাড়াও। সব কাজ করাতে হবে কর্-কর্ বলে···তার চেয়ে নিজের হাতে সব করা ভালো।

মা বললেন—সয়ে থাকতে হবে বাবা! ওদের হয়েছে এখন পোয়া-বারো! এ-যুদ্ধ তো শুধু বাইরের রাজ্যগুলোকে ছারখার করছে না···আমাদের ঘর-সংসারগুলোকে পর্য্যন্ত থেঁৎলে দিলো···ওদিকে যেমন ছুঁচো ঐ হিট্‌লার, এদিকে তেমনি হয়েছে এই-সব বামুন-চাকরের দল!···

এ-সান্ত্বনা মন্টুর ভালো লাগলো না। গায়ে-মুখে সাবান মেখে সদ্য স্নান করেছে ···স্নান সেরে ধোপ-দোস্ত পোষাক পরেছে···এখন আবার ব্রাশ্-হাতে জুতো ঝাড়া! সে বললে—নবাব-পুত্তুর গেলেন কোথায়?

মা বললেন—কি জানি! ডেকে-ডেকে আমার গলা ফেটে গেল, তবু সাড়া মিলছে না!···অত করে বলে দিয়েছিলুম, দাদাবাবু ম্যাচ দেখতে যাবে—খাবারের প্লেটখানা ধুয়ে-মুছে হাতের কাছে তুই এগিয়ে দিবি···আর আমগুলো কেটে দেবার সময় বঁটিখানা লাইফ্‌বয়-জলে ধুয়ে দিবি···তা জাখো না, সব নিজেকে করতে হবে!

মন্টু সরোষে ডাকলো—নীলু···নীলু···

ডাকতে-ডাকতে চাকরদের ঘরখানা ঘুরে দেখে এলো···নীলু সেখানে নেই! নিশ্চয় বেরিয়েছে! আড্ডা···আড্ডা দিতে!

সদরের দিকে এলো। এসে দেখে, সদরের বড় দু'খানা কপাট খোলা···আর সদরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নীলু! পথের পানে চেয়ে আছে···ধ্যানে যেন তন্ময়!

পিছন থেকে গিয়ে তার চুলের ঝুঁটি ধরে দিলো টান। চমকে নীলু ফিরে চাইলো পিছন-দিকে! মন্টু বললে—জুতো ব্রাশ্ করবো আমি? আর বাস দেখে তুমি নেবে বাইরে?···এসে এখনি জুতো ঝেড়ে ব্রাশ্ করে দে···নবাব-পুত্তুর!

কথার শেষে জুতো-জোড়া মণ্টু ছুড়ে দিলে নীলুর গায়ের উপর···জুতো নিয়ে নীলু চললো ব্রাশ্ করতে!

খাবার-ঘরের সামনে দিয়ে পথ। নীলুকে মা দেখলেন। বললেন—হ্যাঁরে, কোথায় ছিলি? বলেছি না যখন কোথাও যাবি, বলে যাবি যে বুঝবো, বাড়ীতে আছিস কি নেই! তা গেরাহ্য করবি নে কোনো কথা? ···গণেশ আসুক, এলে বলবো যে-মাইনে বললে, তাই দিতে রাজী··· তবু কাজ পাবো না!

মা বকতে লাগলেন। সে-সব কথা নীলুর কাণেও গেল না···সে চললো দাদাবাবুর জুতো ব্রাশ্ করতে।


তার চুলের ঝুঁটি ধরে দিলো টান! [পৃ—৭০

দুর্দ্দশার একশেষ! বামুন পালিয়েছে আজ দশদিন···আঠারো টাকার বামুন···তারপর এ ক'দিনে বামুন আর মিললো না। মা ঢুকেছেন রান্নাঘরে······নীলুকে দিয়ে গেছে গণেশ। দেড়-বছর আগে গণেশ এ-বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল···এ-বাড়ীতে তার প্রায় পাঁচ বছরের চাকরি! চালাক লোক···যুদ্ধের মওসুমে যখন দেখলে, যারা বেকার ছিল, তারা

দু'হাতে পয়সা লুঠছে···মোটর কিনছে, জমি কিনছে···! তার মতো পরের বাড়ীতে বাসন মেজে, ঘর-ঝাঁট দিয়ে আর জামা-কাপড় কেচে মাসে যারা আটটি করে টাকা মাহিনা পায়, তাদের জন্য দিকে-দিকে খুলে গেছে ফ্যাক্টরির ফটক! সে-ফটকে দাঁড়িয়ে মা-লক্ষ্মী হাতছানি দিয়ে ডাকছেন···ডেলি তিন-চার টাকা রোজগার! যার নাম, মাসে একশো···একশো-কুড়ি টাকা! তখন সে কেঁদে বললে—বাড়ীতে বড় বিপদ মা···মা মরে গেছে মন্বন্তরের হিড়িকে···বৌটা না খেয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে! আমি একবার দেশে যাবো। মা তার জবাবে বলেছিলেন—বৌকে এখানে নিয়ে আয় গণেশ···তোকে ছেলের মতো দেখি···তোর বৌ খেতে পাবে না রে? আমাদের যদি দুটি অন্ন জোটে, তোদেরো জুটবে···

এ-কথায় মায়ের পা ছুঁয়ে গদ্গদ কণ্ঠে গণেশ বলেছিল—আপনার দয়াতেই বাঁচা মা···আপনি মা-ভগবতী মা···তাই করবো মা। বৌকে নিয়ে আসবো।

এ-কথা বলে পাওনা-গণ্ডার উপর মায়ের দয়ায়-দত্ত আরো গোটাদশেক টাকা গেঁজের ভরে গণেশ বেরিয়েছিল এ-বাড়ী থেকে। দেশে যায়নি···গিয়েছিল সোজা হাওড়ায় এক কারখানায়। তার দেশের কে সে-কারখানায় কাজ করে···মাসে রোজগার করে প্রায় আশী-নব্বই টাকা। সেই চাকরিতে ঢুকেছে।

খেটে-খেটে হাড়-পাঁজরা ঝিরঝিরে হয়েছে—নিজের হাতে রেঁধে খেতে হয়—মনিবের বাড়ীর রান্না-করা ভাত,—ভালো-মন্দ যা হতো বাড়ীতে, খেতো···সে-সব অভ্যাসগত হয়েছিল, এখন তা মেলে না। তবু এত টাকা রোজগার···টাকার মায়া বড় মায়া! টাকার জন্য প্রাণ যদি যায়, যাক্!

এ-বাড়ীতে মাঝে-মাঝে আসে। বলে, ধার-দেনা হয়েছিল। সে ধার-দেনা শোধ করতে মাস-চারেক লাগবে! প্রাণটা বেরিয়ে গেল খেটে-খেটে···তা বেশী-দিন নয় মা, যুদ্ধ তো প্রায় শেষ হতে বসেছে···পূজোর পর আবার মায়ের বাড়ীতে মায়ের শ্রীচরণে এসে আশ্রয় নিয়ে বাঁচবে!

চাকর-বাকর নেই···তাই তো। গণেশ বললে—আমার একটা ভাগনে আছে মা···দেশে আমার ভগ্নীপোতের জমি-জমা গেছে মহা-মন্বন্তরে। সে বলে, কলকাতায়

● ভাগ্যরেখা
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এত পয়সা ছড়াছড়ি যাচ্ছে···তোর সঙ্গে নিয়ে যা গণেশ···তোর সঙ্গে কাজ করবে কারখানায়। তুই পাস্ একশো-কুড়ি টাকা···ও যাটটা করে পাবে না?···ওকে মা, কারখানায় লাগিয়েছিলুম—তা ছেলেমানুষ, পারবে কেন? তাকে নিয়ে আসি মা··· শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন···পালাতে পারবে না! আমার ভাগনে!

মা যেন স্বর্গ হাতে পেলেন, বললেন—তুই দে বাবা, তাকেই দে, গণেশ। সত্যি, তোর এত রোজগার···এমন রোজগারের সুবিধা ছাড়বি কেন? এমন মণ্ড্ম তো জীবনে আর পাবিনে···এখন রোজগার করবি না তো কবে,আর করবি?···

মাসে বারো টাকা মাহিনা বরাদ্দ করে নীলুকে এ-বাড়ীতে দিয়ে গেছে প্রভুভক্ত গণেশ···আজ দশ-বারো দিন হলো।

কাজে কিন্তু নীলুর মন নেই। মা খুব যত্ন করেন—ডেকে সময়-মাফিক জল-খাবার দেওয়া···তাছাড়া, সব সময় সব কাজে হাত দিয়ে সাহায্য করা···'আহা', 'আহা' বলে দয়া জানানো···তবু নীলু নির্বিকার···যেন পাথরের পুতুল! কর্তা রাগ করেন, মন্টু চটে, মা বলেন—থাক্, থাক্···বামুন নেই, বামুনের কাজ আমি করতে পারি—কিন্তু বাজার যাওয়া, বাসন মাজা···সেগুলো করছে তো!

মন্টু বলে—করছে, না, হাতী! ঝাঁটা ওর হাতে রোজ আমাকে তুলে দিতে হয়···সঙ্গে থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়াই···আমার কোনো কাজ হয় না সকালে! আসলে ও ভালো লোক নয় মা! যেন নবাব···দুষ্টুর একশেষ!

মা বলেন—সয়ে থাকতে হবে মন্টু···দেখছিস্ তো লোকজনের কি আকাল! দুর্ভিক্ষেও এত কষ্ট হয়নি, বাবা!

সন্ধ্যার পর বাবা বাড়ী ফিরলেন···সঙ্গে এক বন্ধু। বাহিরে বসবার ঘরে ঢুকে বাবা দেখেন, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ ঘুরছে।

ডাকলেন—নীলু···

নীলু বাইরে ছিল···এলো। বাবা বললেন—ফ্যান্ চালিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলি?

● ভাগনেটা
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নীলু দেখলে ফ্যান্ চলছে। বললে—না···দাদাবাবু আর দাদাবাবুর বন্ধু এ-ঘরে বসে খাবার খাচ্ছিলেন বেরুবার আগে···দাদাবাবু ফ্যান্ খুলেছেন!

বাবা বললেন—ও···আজ মোহন-বাগানের ম্যাচ্ ছিল! তা সে তো বেরিয়েছে বোধ হয় বেলা চারটেয়···সেই বেলা চারটে থেকে ফ্যান্ ঘুরছে···তুমি বন্ধ করতে পারোনি?

নীলু জবাব দিলো না, চলে যাচ্ছিল···বাবা বললেন—ফ্যানটা বন্ধ করোনি কেন?

নীলু বললে—খেয়াল করিনি।

—তোমায় খেয়াল করাবার জন্য আমি আর-একটা লোক রাখবো? বটে! মাইনে দেবো মাসে বারো টাকা করে আর···

রাগের মাথায় চড় উঠলো। বেশ জোরে সে-চড় পড়লো নীলুর মাথায়···নীলু ঘুরে ছিটকে গেল···

পরের দিন সকাল বেলা···

মণ্টু নীচে এসে দেখে, বাইরে বসবার ঘরের খড়খড়ি-শার্সি বন্ধ! ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাকরের ডিউটি এ-ঘরের খড়খড়ি-শার্সি খোলা···ঝাঁটপাট দেওয়া···আজ তার কোনোটা হয়নি। ডাকলো—নীলু···

সাড়া নেই! এগিয়ে মণ্টু দেখে, সদরের দরজা খোলা! কালকের মতো পথের দিকে চেয়ে নীলু দাঁড়িয়ে আছে!···

মণ্টু ডাকলো—নীলু···

নীলুর চমক ভাঙলো।

মণ্টু বললে—বাইরের ঘরের শার্সি-খড়খড়ি আমি খুলবো?

নীলু জবাব দিলে না—ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো।

মণ্টু বললে—ওগুলো খোলো···ঝাঁটপাট দাও···টেবিল-চেয়ারগুলো ঝাড়ো···

নীলু এলো বসবার ঘরে···দম-চাবিদেওয়া কলের মতো। মা উঠে রান্নাঘরের উনোনে আগুন দিচ্ছিলেন—চায়ের জল চড়বে···গোয়ালা দুধ দিয়ে গেছে···

● ভাবলেখা
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মণ্টু এসে নালিশ জানালো, নীলুর ডিউটি-জ্ঞান একেবারে নেই!

মা বললেন—আমাদের কর্ম্মভোগ!

দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে মা দেখেন, কড়া মাজা হয়নি। এবার আর মায়ের সহ্য হলো না…ডাকলেন—নীলু!

নীলুর সাড়া নেই। মণ্টু তার কাণ পাকড়ে তাকে ধরে নিয়ে এলো।

মা ডাকলেন—কড়া মাজিস্ নি যে…জানিস, ভোর হলেই কড়ার দরকার?

নীলু কোনো জবাব না দিয়ে কড়াখানা নিয়ে কলতলায় চললো।

মা বললেন—কাজে যদি এক-ছটাক মন থাকে!

মণ্টু বললে—বসে শুধু শুধু অন্ন ধ্বংস করবে এমনি করে? গণেশকে বলো, চালাকি পেয়েছে…বটে! এই লোককে বারো টাকা মাইনেয় এখানে রেখে গেছে! নিশ্চয় সে-ব্যাটা কমিশন খাবে মাইনে থেকে…

চায়ের পর্ব্ব চুকলে বাবা বেরুলেন—যুদ্ধের মরশুমে তাঁর এক-মিনিট সময় নেই বাড়ীতে বসবার! মণ্টু বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল! বন্ধু এসে জুটেছে… দিলীপ আর শিশির…মোহন-বাগানকে নিয়ে তিনজনে যেন কথার বাণ ডাকিয়ে দেছে!

মায়ের কাছে নীলু দাঁড়ালো…হাতে পুঁটলি।

মা আনাজ কুটছিলেন, বললেন—বাজারে যা…আরো দেরী করে গেলে মাছ কি আর পাবি?

নীলু বললে—আমি কাজ করবো না! বাড়ী যাবো।

মার মনে হলো, কে যেন তাঁকে পাঁজাকোলা করে পাঁচতলার ছাদে তুলে সেখান থেকে দুম্ করে আছাড় দিলো!

মা বললেন—তার মানে?

নীলু বললে—আমার মন টিকছে না। মার জন্য মন কেমন করছে!

এ-কথায় মায়ের মন গললো না। তিনি বললেন—মন যদি টিকবে না তো এসেছিলি কেন চাকরি করতে?

● [illegible]
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নীলু বললে—আমি আসতে চাইনি। বাবা গলা ধরে জোর করে পাঠিয়ে দেছে···

মা বুঝলেন। কিন্তু তাঁর সংসার?

মা বললেন—একা যেতে পারবি?

—পারবো।

মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, বললেন—তা হবে না। তোর মামা নিজে এসে আমার কাছে তোকে জিম্মা করে গেছে। তুই বেরিয়ে যাবি, তারপর পথে এই লরির ভিড়···তার তলায় চাপা পড়িস্ যদি, তখন?



"আমি কাজ করবো না। বাড়ী যাবো।" [পৃ:—৮১

নীলু বললে—লরির তলায় পড়বো না।

বেয়াড়া গোঁ! মায়ের রাগ হলো···সকালে কোথায় বাজারে যাবে, তা নয়···

মা বললেন—ও-সব হবে না বাপু···গণেশ আসুক, তার সঙ্গে যাবি! একলা তোর যাওয়া হবে না।

নীলু নাছোড়বান্দা। মা ডাকলেন—মন্টু, মন্টু···

সে-ডাকে মন্টু এলো মন্টুর সঙ্গে এলো দিলীপ আর শিশির।

মা খুলে বললেন ব্যাপার। মন্টু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—মা, এখনি মা···কিন্তু এক-পয়সা মাইনে পাবি না···

নীলু জানালো মৃদু কণ্ঠে, মাহিনা সে চায় না।

● [illegible]
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মা বললেন—যাবি কি করে ট্রেণে, শুনি ?

নীলু বললো—ট্রেণে যাবো না, হেঁটে বাড়ী যাবো।

মা বললেন—শোনো পাগলামির কথা! বাড়ী কি তোর এখানে! গণেশ বলে, কেষ্টনগর আর বহরমপুরের মাঝামাঝি কি গাঁ আছে···সেই গাঁয়ে···

নীলুর পণ প্রায় ধনুক-ভাঙ্গা পণের মতো! মন্টু বললো—যাওয়া হবে না···যেতে পারে না। অন্ততঃ গণেশ না-আসা পর্য্যন্ত।

নানা গোলমালে তখনি নীলুর যাওয়া হলো না। ভাগ্যক্রমে দশটা-বেলায় গণেশ এসে হাজির।

মা বললেন,—হ্যাঁ রে গণেশ, ও এ কি বলে? এ্যাঁ!

ব্যাপার শুনে গণেশ বললো নীলুকে—বাঁদরামির আর জায়গা পাসনে, না?···বাড়ী যাবি! তোকে আমি যমালয়ে পাঠাবো।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চড় আর ঘুষি···নীলুর গায়ে জামা ছিল না···খালি-গায়ে গণেশের আঙুলের দাগ্‌ড়া-দাগ্‌ড়া দাগ ফুটে উঠলো যেন আলতা-রাঙানো!

মা বললেন—ও বলে, ওর মার জন্য মন কেমন করে···এখানে মন টিকছে না।

নীলুর কাণে গণেশ দিল জোর-মোচড়···তবু নীলু অটল!

গণেশ দেখলো, শাসালে হবে না! সে তখন ভালো কথায় বোঝাতে লাগলো। বললে—এ-বাড়ীতে আমি সব-প্রথম চাকরি করতে আসি। কিছু জানতুম না—যা-কিছু কাজ, এখানে শিখেছি। এ-বাড়ীতে তোকে রেখেছি···তার মানে, কাজ শিখবি ভালো করে। তাছাড়া ছেলের মতো আদর-যত্ন পাবি···

তবু নীলু সেই যে ধনুকের মত বেঁকে আছে··· সিধে হতে চায় না! মুখে তার এক কথা—মার জন্য মন কেমন করছে!

মারতে-মারতে গণেশ শেষে হার মানলো। হার মেনে বললে—চ, তোর যা হাল করবো, তা আমার মনেই আছে! মায়ের দিকে তাকালো, বললে—মা মা, ওকে দিয়ে করে দিয়ে আসি···ভয়ানক বদমাস, দেখছি!

মা বললেন—কোথায় দিয়ে করে দিবি, শুনি?

● ভাগ্যলেখা
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গণেশ বললে—আমার কাছে নিয়ে যাবো না। ওর এক পিসে কাজ করে শ্যামবাজারে তেলের কলে···তার কাছে ফেলে দিয়ে আসবো।

মা বললেন —ছাখ্, বাবা, মোদ্দা···

গণেশ কি ভাবলো, তারপর বললো—শোন্ তোকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো , কাল··· তোর বাবাকে লিখে দেবো, তুই কাজ করবি না। তাহলে তোর বাবা কি করবে, জানিস্? বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না!···সে চায় পয়সা···

এই পর্য্যন্ত বলে গণেশ আবার মায়ের পানে তাকালো। বললে—জানেন মা, ওর বাপ ভয়ানক পয়সা-পিশাচ···এই গেল-মন্বন্তরে ঘরে চাল ছিল, কাকেও তবু পেট পুরে খেতে ছায়নি···সেই চাল চোরাবাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে টাকা করেছে। আমার এত টাকা মাইনের কথা শুনে ছেলেটার ঘাড় ধরে পাঠিয়ে দিলে, বললে—নিয়ে যা··· রোজগারের সময় এখন···হাড় পিষে টাকা আমার চাই···

মা বললেন—এ বুঝি তোর বোনের কোলের ছেলে?

গণেশ বললে—হ্যাঁ। ছেলেটা এমন যে আমার বোনকে ছেড়ে কোথাও নড়বে না।

নীলু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল···গণেশ বললে—আজ থাক্ এখানে। কাল ভোরে তোকে নিয়ে যাবো। আমাদের একটি লোক যাচ্ছে বহরমপুরে···কাল। তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো···কেমন?

নীলু ঘাড় নাড়লো, বললে,—না, আমি আজই যাবো। আমার মন কেমন করছে!

গণেশের হলো রাগ! বললে,—একটা দিন সবুর সয় না? যেতে তুই পাবি নে। আমি চললুম। আমার সঙ্গে আসবি কি তোর মুণ্ডু ধরে আমি নর্দ্দমার তলায় গুঁজে দেবো···

গণেশ আর এক-পলক দাঁড়ালো না—চলে গেল। নীলু কাঠ!

মা বললেন—আয় নীলু, কাজ তোকে করতে হবে না! তুই খা'-দা' বাপু—কাল তো গণেশ নিয়ে যাবে বললে।

নীলু থাকতে পারলো না···কেঁদে উঠলো। তার দু'চোখে নামলো শ্রাবণের ধারা।

● [illegible]
[illegible] মুখোপাধ্যায়

তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার মার কাছে যাবো। আমি চাকরি করবো না···টাকা আমি চাই না। মার জন্য আমার মন কেমন করছে···

সে কী কান্না! মার বুকখানা দুলে উঠলো! কিন্তু তিনি কি করবেন? বললেন —কাজ নেই বাছা, বাড়ীই যাও তুমি···টাকা আমি দিচ্ছি হিসেব করে···

—টাকা আমি চাই না। আমি হেঁটে হেঁটে যাবো···

এ-কথা বলে নীলু ছুটলো পাগলের মত! তার হাতের পুঁটলি পড়ে রইলো —পুঁটলির কথা মনে হলো না।

মা নিঃশ্বাস ফেললেন। আপন-মনে বললেন—গণেশ এ-কী করে গেল! ছেলে-মানুষ···কলকাতায় এই প্রথম এসেছে···পথে কোথায় ছুটলো···

মন্টুকে ডাকলেন, বললেন—ছাখ্ বাবা···ছেলেটা কোথায় গেল! গণেশ যে-রকম রেগে বেরিয়ে গেছে ··কি বুঝি বা ঘটে!

এবং মা যে-ভয় করেছিলেন, তাই।

এক-ঘণ্টা পরে লোকের মুখে-মুখে খবর এলো, চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের একটা ছেলে পথে ছুটে চলেছিল, এমন সময় একখানা ঐ যে কি-রকম-কি লরি—তার তলায় পড়ে চেপ্‌টে···ওঃ, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা ধেৎলে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছে!

মা শিউরে উঠলেন!

মন্টু এসে ঐ-কথাই বললো—হ্যাঁ মা, আমাদের সেই নীলু!

আঁধারে আলো

● দুঃখের পাখী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তাকে বাসা বাঁধতে দিও না।

—[illegible]

বার্লিন ফ্রন্ট



—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জার্মানরা পিছিয়ে আসছে। মাস্কো-লেনিনগ্রাদ-ওডেসায় ব্যূহ-রেখা হটে আসছে জার্মান-সীমান্তের কাছে।

সীমান্ত ধরে পরিখা প্রস্তুত হয়েছে, এখানে লালফৌজের গতিকে প্রতিরোধ করা হবে। নাৎসি-ফৌজের উপর সোজা আদেশ হয়েছে—আক্রান্ত হবার আগেই পিছিয়ে এসো, যত কম শক্তি অপচয় হয়, ততই ভালো:—

দ্রুত পিছিয়ে এসে জার্মান-বাহিনী পরিখায় আশ্রয় নিচ্ছে, ক্যাপ্টেন ক্রিজের গোলন্দাজ-বাহিনীও আসছে তাদের সঙ্গে।

ক'দিন একাদিক্রমে মার্চ্চ করে আসার পর কাল শেষ-রাতে তারা ট্রেঞ্চে পৌঁছেছে। পরিখায় নিচে ছোট্ট ঘরখানিতে ঢুকে ইজি-চেয়ারটিতে শরীরটাকে

এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন ফ্রিজ খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। রুশেরাও কিছুক্ষণের জন্য কামান-দাগা বন্ধ করেছে, তাদেরকে বিশ্রাম করবার সুযোগ দিচ্ছে হয়তো।

একটানা কলরবের পর কিছুক্ষণের প্রশান্তি, ফ্রিজ চোখ বুজে ভালো করে উপভোগ করে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে অজ্ঞাতে।

—সুপ্রভাত, ক্যাপ্টেন!

লেফ্‌টেন্যান্টের গলা শুনে ফ্রিজের ঘুম ভেঙে গেল।

—সুপ্রভাত ক্যাপ্টেন!

—সুপ্রভাত! সকাল হয়েছে?

—অনেকক্ষণ।

ফ্রিজ এবার উঠে বসলো। জামাটা চোস্ত করে নিয়ে, মাথায় ক'বার চিরুণী চালিয়ে টুপিটা পরে নিল, বললো—চলো, এক কাপ করে কফি খেয়ে আসা যাক্—

ঘর থেকে বেরিয়ে দু'জনে ট্রেঞ্চ ধরে হাঁটতে সুরু করলো। মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। বসন্তের আকাশ মখমলের মত নীল। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

পরিখার একটা মোড় ফিরতেই দু'পাশে কয়েকখানি বাড়ী চোখে পড়লো; ছাদ উড়ে গেছে, কাঠামোগুলো মাংসহীন কঙ্কালের মত হাত বাড়িয়ে আছে আকাশের পানে। দেয়ালে বসন্তের দাগের মত গোলা আর স্প্লিন্টার্সের ছড়াছড়ি।

পরিখার একটি মোড় ফিরেছে এক বাড়ীর নীচের তলায়। সেইখানেই রান্নাঘর। অতো সকালেই সেখানে সৈনিকদের সারি দাঁড়িয়ে গেছে—এক পেয়ালা চা, আর চারখানা করে বিস্কুট।

বাবুর্চি ফ্রিজকে দেখেই সেলাম দিল,—সুপ্রভাত!

—সুপ্রভাত।

● বার্লিন ফ্রন্ট
[illegible]

খানচারেক ক্যাম্বিসের টুল পড়ে ছিল ; তারই একটা টেনে নিয়ে ফ্রিজ বসলো, বললো—কার্ট বসো—

লেফ্‌টেন্যান্ট পাশের টুলটায় বসলো।

বাবুর্চি দু-পেয়ালা চা আর বিস্কুট নিয়ে এলো। বিস্কুট চিবুতে-চিবুতে ক্যাপ্টেন গল্প সুরু করলো—আজ আর মনে হয় না কাল শেষ-রাত অবধি বোম্বার্ডমেণ্ট চলেছে, আকাশে এতটুকু মেঘ অবধি নেই !

—ওরা বোধ হয় বুঝেছে, আর বোম্বার্ডমেণ্ট চালিয়ে লাভ নেই। এই পরিখা থেকে নাৎসি-ফৌজদের হটিয়ে দেওয়া লালফৌজের কর্ম্ম নয়।

—কিন্তু এতোদূর এগিয়ে এসে লালফৌজ চুপ করে থাকবে তা আমার মনে হয় না, মুখোমুখি একটা লড়াই না করে তারা ছাড়বে না।

—আমরা তো সেজন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।

—তাতো আছিই, কিন্তু কিভাবে ওরা আমাদের আক্রমণ করবে সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

যেভাবেই আক্রমণ চালাক, এবার ওদের হটবার পালা। আমরা কিছুদিন জিরিয়ে নিতে পারলেই, আবার ওদের ঠেলে নিয়ে যাব মাস্‌কো পর্য্যন্ত···

গুম্-গুম্ গুড়্-গুড়্ গুম্-গুম্—দূর থেকে কামানের শব্দ ভেসে এলো।

ক্যাপ্টেন বললো—আবার সুরু হোল।

লেফ্‌টেন্যান্ট হাত-ঘড়িটার পানে তাকালো, বললো—কাল রাত দুটোয় থেমেছে, আবার আজ সকাল সাতটায় সুরু হোল, সাতদিনের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টার বিরাম।

বিস্কুট আর চা-টুকু শেষ করার আগেই মাথার উপর দিয়ে গোলা ছুটতে সুরু করলো—স্ স্ স্—বুম্!

কাপটা নামিয়ে রেখে বিস্কুট চিবুতে-চিবুতে ক্যাপ্টেন নেমে এলো ট্রেঞ্চে, ছুটলো নিজের আস্তানার দিকে।

ঘরখানি প্রায় অন্ধকার, ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই আরদালী হাতে কোন তুলে দিল।

—হ্যালো! হাঁা, আমিই ক্যাপ্টেন ফ্রিজ! ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করে আক্রমণ চালাবে···ট্যাংক এগুচ্ছে···আমরা প্রস্তুত···

—আরদালী! ক্যাপ্টেন আদেশ দিল—কামান-দাগতে বল, পর-পর,—ওদের কোন সেক্টার যেন বাদ না যায়—

মেগাফোনে আরদালী আদেশ ছড়িয়ে দিল ট্রেঞ্চে। একটা ইলেকট্রিকের সুইচ টেপা হোল যেন, সুরু হোল—গুম্-গুম্ গুমাগুম্ গুম্!

টেলিফোন দুটো নাবিয়ে রেখে ফ্রিজ হাসলো, প্রসন্ন মনে লেফটেন্যান্টকে বললো—জানো কার্ট, অনেক-দিন মুখোমুখি ট্রেঞ্চে বসে এমনি কামানের লড়াই হয়নি। গত যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, প্যারিস থেকে বারো মাইল দূরে···

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং!

—ইয়েস্! সি পয়েন্ট থেকে এগিয়ে আসছে বাঘা-ট্যাংক···


"ইয়েস্!······এগিয়ে আসছে বাঘা-ট্যাংক···"

ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি মানচিত্রখানা টেবিলের উপর রেখে 'ডিভাইডার' দিয়ে

সি-পয়েন্টটা ঠিক করে মেপে নিল, এক লহমায় একটুকরো শাদা কাগজের উপর একটি গুণ-ভাগ করে নিল, তারপরেই আদেশ দিল—আরদালী! সব কামান ডানদিকে পঁচিশ ডিগ্রি, পাঁচশো মিটার···

আরদালী বাইরে চলে গেল, কয়েক মুহূর্ত সব কামান স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার সুরু হোল তাদের ঐকতান—গুম্-গুম্ গুমাগুম্ গুম—

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং!

—হ্যালো, ইয়েস্ ক্যাপ্টেন ফ্রিজ···সি-পয়েন্টে বোম্বার্ডমেন্ট সুরু করেছি···ওদের আর এক ইঞ্চি এগুতে দেব না।···বাধা-ট্যাংক···কুছ পরোয়া নেই, এই বোম্বার্ডমেন্টের মধ্যে কিছুতেই এগুতে পারবে না···একঘন্টা, একমাস বলুন—রসদ ঠিক থাকলে দাঁড়িয়ে থাকবো এখানে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন···

একদিকের রিসিভার নামিয়ে রেখে ফ্রিজ আরেক দিকের রিসিভার তুলে নিল—হ্যালো, অবজার্ভেশান পোস্ট···হ্যাঁ, আমি ক্যাপ্টেন ফ্রিজ কথা বলছি···ফীল্ডগ্লাশের নজরের মধ্যে কিছু এসেছে···কিছুই ঠাহর করতে পারছো না···ধোঁয়ায় সব ঢেকে দিয়েছে···হ্যালো···হ্যালো···হ্যা-লো···

—ইস্! লাইন কেটে গেছে···কার্ট, তুমি এখানে থাক, আমি চললুম অবজার্ভেশান পোস্টে···আরদালী, দুজন টেলিফোনিস্ট আর যন্ত্রপাতি এখুনি যাবে আমার সঙ্গে—

আরদালী ছুটে গেল, ক্যাপ্টেন গট্-গট্ করে বাইরের ট্রেঞ্চে বেরিয়ে এলো।

বরাবর কিছুদূর গিয়ে একটা মোড় ফিরতেই টেলিফোনিস্ট দুজন ছুটে এসে সেলাম দিল। ক্যাপ্টেন বললে:—এসো আমার সঙ্গে—

আর কিছুদূর গিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে তারা এসে পৌঁছালো। একটি বাড়ীর দেয়ালের পিছন দিয়ে ট্রেঞ্চটা এগিয়ে গেছে। দেয়ালের আড়ালে পর-পর গোটা-পঁচিশ কামান সাজানো। গোলন্দাজ ক'জন সবেমাত্র ক' রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে কপালের ঘাম মুছছে, এমন সময় ক্যাপ্টেন ডাক দিল—লেফটেন্যান্ট ক্রামার!

● বার্লিন ফ্রন্ট
শ্রীহীরেন্দ্রলাল দত্ত

টেলিফোনটা কানের কাছে ধরে ক্রামার একটি কামানের প্লেটের উপর হেলান দিয়ে বসেছিল, ক্যাপ্টেনকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো, জুতোর গোড়ালি ঠুকে এক স্যালুট দিয়ে বললো—ইয়েস্ স্যার !

—সামনে কিছু ঠাহর করতে পারছ ?

—কেবলই ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ওর আড়ালে লালফৌজ যে কি করছে, কিছুই বোঝবার উপায় নেই ! আদেশ মত আমরা রেঞ্জ ঠিক করে শুধু কামান চালাচ্ছি।

—ঠিক হ্যায় ! ওপর থেকে অর্ডার এসেছে অন্ততঃ একঘণ্টা ওদের রুখতে হবে, এরই মধ্যে আমাদের প্লেন এদিকে এসে পড়বে···

—ঠিক আছি স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—আমি অবজার্ভেশান পোস্টে যাচ্ছি, ওখানকার লাইনের কি একটা গোলমাল হয়েছে, ওখান থেকেই আমি অর্ডার দোব···

—ঠিক আছে স্যার !

—যদি আমার অর্ডার ঠিক মত না পাও, যদি মনে হয় আমি মারা গেছি বা আহত হয়েছি, তাহলে আমার সম্পর্কে আর মাথা ঘামিও না ; তখন এখানকার কম্যাণ্ড তুমিই নেবে, বুঝলে ! এই জায়গাটুকু রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার !

—ঠিক আছি স্যার !

—মনে রেখো, এর পিছনেই ডুয়েট্স্ ল্যাণ্ড, আমাদের পিতৃভূমি···

—ঠিক আছি স্যার !

—অলরাইট—বলে ক্যাপ্টেন আবার অগ্রসর হোল।

ট্রেঞ্চের দু-পাশের বাড়ীঘর আর চোখে পড়ে না, গাঁ শেষ হয়ে এবার ক্ষেত সুরু হয়ে গেছে। এ বছর আর কেউ ক্ষেতে নামেনি, মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। সঙ্কীর্ণ ট্রেঞ্চটি দু-পাশের মাঠকে ঠেলে পৃথক করে দিয়েছে।

একটা গুমটির সামনে এসে ক্যাপ্টেন দাঁড়ালো। পরিখার একপাশে পুরু ইঁটের দেয়াল-দেওয়া একখানি গোলাকার ঘর। এখান থেকে শত্রু-সেনার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। একদিকের দেয়ালের খানিকটা ভেঙে পড়েছে।

আর তারই পাশে পড়ে আছে হান্‌স্। সে-ই গত আটচল্লিশ ঘণ্টা এখানে পর্য্যবেক্ষণে ছিল। মাথাটা একেবারে থেৎলে গেছে,—ডিরেক্ট হিট্ হয়েছে হয়তো! তবে গুম্‌টিটা একেবারে ভেঙে পড়লে ক্ষতি হোত।

হান্‌সের দেহটা পরিখার বাইরে ফেলে দিয়ে ক্যাপ্টেন ক' মিনিটেই টেলিফোন ঠিক করে ফেললো, তারপর ফীল্ডগ্লাশ চোখে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো গুম্‌টির বেদীর উপর।

ফীল্ডগ্লাশের মধ্যে প্রতিভাত হোল দিগন্তবিস্তারী ঢেউখেলানো প্রান্তর। আগে হয়তো সমতল ছিল, এখন বোমা ও গোলার বিস্ফোরণে এলোমেলো ঢেউ উঠেছে। কিন্তু সেই মাটির ঢেউ আজ আর দিগন্তে গিয়ে মিশছে না, ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দৃষ্টিকে প্রতিহত করছে, ওপারের যা-কিছু সব ঢেকে দিয়েছে। ধোঁয়ার ওপারে যে একখানি গ্রাম আছে, সেখানে কি হচ্ছে তার এতটুকু ইঙ্গিত পাবার উপায় নেই। এদিকের গোলা ওদিকে গিয়ে ফাটছে, আলোর দীপ্তিতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী চমকে উঠছে, আর কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না তার মধ্যে! তবু ক্যাপ্টেন ফীল্ডগ্লাশটা চোখে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে।

কয়েক লহমা কেটে যায়, ক্যাপ্টেনের মনে হয় যেন সে যুগান্তরের প্রতীক্ষা করছে! সহসা পঁচিশটি কামানের এক রাউণ্ড গোলা একসঙ্গে এসে পড়লো ধোঁয়ার মাঝে। বারেকের জন্ত চোখে পড়লো একসারি কালো-কালো ফুটকি—ওগুলোই কি বাঘা-ট্যাংক? ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করে আছে?

ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে ওঠে, টেলিফোন ধরেই আদেশ দিতে সুরু করে—লেফটেন্যান্ট ক্রামার···আমি ক্যাপ্টেন ক্রিজ কথা বলছি···সব কামান কুড়ি ডিগ্রি পাঁচশো মিটার···তিন রাউণ্ড···

গুম্-গুম্ গুমাগুম্—তিন ঝাঁক গোলা গিয়ে পড়লো সেই ধোঁয়ার মধ্যে।

ডিরেক্ট হিট্! ক্যাপ্টেন ফলাফলের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ধোঁয়ার মাথায় এবার যেন দেখা গেল,—একখানা, দুখানা, দশখানা, অনেক··· এবার নিচের কালো ফুটকিগুলো একে-একে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার এপারে···

ওগুলো ট্যাংকই বটে, কামানের নলগুলো শুঁড়ের মত নড়ছে। বেশ দ্রুতই তো এগিয়ে আসছে বলে মনে হয়।

ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি অপর টেলিফোনটি ধরে চীৎকার করে উঠলো—লেফটেন্যান্ট কাট···হেডকোয়ার্টার্সে খবর দাও, এখুনি প্লেন চাই ; না হলে সব যাবে—

অপর টেলিফোনে বললো—ক্রামার···কুড়ি ডিগ্রি সাড়ে চারশো মিটার···তিন ঝাঁক···

গুম্-গুম্ গুম্-গুম্—করে গোলা পড়তে লাগলো। তথাপি কালো-কালো ফুটকি-গুলো ঠিক এগুচ্ছে, প্লেনগুলো উড়ে আসছে মাথার উপর!

প্লেনগুলো ছড়িয়ে পড়লো, নিচু হয়ে আসছে, এবার ওরা বোমা ফেলতে শুরু করবে। ক্যাপ্টেন টেলিফোনে চীৎকার করে উঠলো—কাট, কাট, হেডকোয়ার্টার্সে খবর দাও···

বুম্স্···

ক্যাপ্টেনের কথা থেমে গেল, পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রের একদিকের দেয়ালটা উড়ে গেল। একটা বড়ো ঝাপ্টা চলে গেল ক্যাপ্টেনের মাথার উপর দিয়ে।

কি যে হোল ক্যাপ্টেন কিছুই বুঝলো না, সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কি না তাও ঠাহর করতে পারলো না। তবে চমক যখন ভাঙলো, দেখে আকাশের পানে তাকিয়ে সে পড়ে আছে, মাথার উপর ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী, গন্ধকের গন্ধে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে!

কয়েক লহমা ক্যাপ্টেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। বুম্-বুম্ আর গুম্-গুম্ শব্দের বিরাম নেই।

ওরা তাহলে সত্যি আক্রমণ সুরু করেছে! ড্রয়েট্স্ ল্যাণ্ডের উপর চড়াও হবে লালফৌজ! ক্যাপ্টেন সারাদেহে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসলো, ডাকলো—আরদালী! আরদালী!

কোন সাড়া নেই।

ধোঁয়ার মাঝে হাতড়ে-হাতড়ে টেলিফোনের রিসিভার দুটো খুঁজে নেবার চেষ্টা

করে। একটা রিসিভার হাতের কাছেই খুঁজে পায়, তার অর্দ্ধেকটা ভেঙে গেছে, আর একটা খুঁজে পায় না। ফীল্ডগ্লাশটাও নেই! গুর-গুর্ করে ট্যাংক-চলার শব্দটা ক্রমশঃ কাছাকাছি হতে থাকে, তবে কি রুশেরা এসে পড়লো ?

ফ্রিজ লাফিয়ে উঠলো, ছুটলো ট্রেঞ্চ ধরে ক্রামারের ব্যাটারীর দিকে।

ট্রেঞ্চের মোড় ফিরতেই চোখে পড়লো কামানের সারি, ক্যাপ্টেন ডাকলো—ক্রামার, লেফটেন্যান্ট ক্রামার!

—ইয়েস্ স্যার!—

ক্রামার এগিয়ে এসে স্যালুট দিল, ধোঁয়ায় তার মুখখানা কালো হয়ে গেছে, জামার হাতটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

—কী ব্যাপার ?

—রীতিমত বোম্বার্ডমেণ্ট সুরু হয়েছে, এখানে আমরা মাত্র এগারো জন আছি।

হিস্-স্-স্—বুম্-বুম্—বুমাবুম্—বুম্!

কান কালা হয়ে যায়, ফোয়ারার মত মাটি ছিটকে ওঠে এখানে-সেখানে।

ক্রামার বললো—প্লেন ছাড়া এক মিনিট দাঁড়ানো যাবে না, টেলিফোন-লাইন সব বিগড়ে গেছে, রসদও ফুরিয়ে এসেছে···

হিস্-স্-স্ বুমম্—

লেফটেন্যান্ট ক্রামার বুকে হাত দিয়ে ঘুরে পড়ে গেল।

ক্ষণেকের জন্য ক্যাপ্টেন স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপরেই চীৎকার করে উঠলো—শুয়ে পড়! শুয়ে পড়!

গোলন্দাজ ক'জন চকিতে শুয়ে পড়লো।

গোলার পর গোলা ছুটে যায় মাথার উপর দিয়ে। এখানে-সেখানে ফাটে। চারিপাশে বারুদের গন্ধ আর শাদা ধোঁয়া। কিছুই দেখা যায় না, তবু ক্যাপ্টেনের মনে হয় সে যেন দেখতে পাচ্ছে, মাথার উপর লাল প্লেন উড়ছে, সামনে দিয়ে লাল ট্যাংক এগুচ্ছে!

ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু মাটি ছেড়ে উঠতে ভরসা পায় না।

● বার্লিন ফ্রন্ট
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দত্ত

একটু পরেই বারুদের ধোঁয়াটা ফিকে হয়ে আসে। এবার সত্যই দেখা যায় কালো ফুটকিগুলো বড় হয়েছে, এগিয়ে আসছে তাদের দিকে—ডুয়েটস্ ল্যাণ্ডের দিকে।

জার্মানীর ভিতরে এসে ঢুকবে লালফৌজ! ক্যাপ্টেনের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, লাফিয়ে ওঠে, হাঁক দেয়—কামান চালাও—ওই সামনের ট্যাংক।



ট্যাংক এগিয়ে আসে—একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ!

গোলন্দাজরা লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু কামানে হাত দেবার আগেই, এক ঝাঁক গোলা এসে পড়লো, একা ক্যাপ্টেন ছাড়া সব ক'জন শুয়ে পড়লো সেখানেই।

সব গেল! সব গেল! লালফৌজ ডুয়েটস্ ল্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে, কম্যুনিষ্টরা জার্মানভূমিকে কলঙ্কিত করবে!

ক্যাপ্টেন আর কিছু ভাবতে পারে না, ভাবতে চায়ও না, একা একটা টমি-গানের সামনে বসে পড়ে। টমি-গান চলে···কট্-কট্-কট্-কট্···কট্-কট্!

● . বার্লিন ফ্রন্ট
শ্রীহীরেন্দ্রলাল দত্ত

লাল ট্যাংক গুর্-গুর্ করে এগিয়ে আসে, টমি-গানের গুলি ঠিকরে পড়ে তার ইস্পাতের আবরণে লেগে। মুখোমুখি হয়, তবু ক্যাপ্টেনের টমি-গানের বিরাম নেই—লালফৌজকে সে জার্মানীতে ঢুকতে দেবে না!

ট্যাংকটা একেবারে এসে পড়ে ক্যাপ্টেনের দেহের উপর, তবু ক্যাপ্টেন ফ্রিজ নড়ে না, টমি-গান চলে না, পিস্তল হাতে নিয়ে ছুঁড়তে চায়···

ট্যাংক এগিয়ে আসে—

একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, তার পরেই সব চুপচাপ!

শত শত জার্মান মৃতদেহের উপর দিয়ে লালফৌজ বার্লিনের দিকে এগিয়ে চলে।

আঁধারে আলো

● আয়ে হ্যায় সো যায়েঙ্গে
রাজা রঙ্ক্ ফকির।
এক সিংহাসনে চড়্ চলে,
এক বাঁধে যাত জিঞ্জির।

রাজা, গরীব ও ফকির সকলে আসিয়াছে, সকলেই যাইবে। কিন্তু কর্মের তফাতে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যাইবেন, কেহ বা শৃঙ্খলে বন্দী হইয়া যাইবে।

—মহাত্মা কবীর

দিদিমার গল্পকাঁথা

—শ্রীঅখিল নিয়োগী



পিন্টু দিদিমার কোলে-পিঠেই মানুষ।

পিন্টু যখন হয়, সেই সময় তার মা মারা যায়।

দিদিমা প্রথমে খুব খানিকটা কাঁদলেন, তারপর পিন্টুকে গাল দিয়ে বল্লেন, মাকে খেতে এসেছিস···এইবার আমাকে খা—হাড় জুড়োক আমার।

অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলবার পর সেই দিদিমাই পিন্টুকে আঁচলে জড়িয়ে নিয়ে মুখে চুমু খেলেন।

সেই থেকে পিন্টু দিদিমার আঁচলের তলাতেই বড় হতে-হতে আজ ইস্কুলে পড়ছে।

খুব যখন ছোটটি ছিল তখন পিন্টুই দিদিমার কাছে নানারকম গল্প শুনত। রূপকথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনী, আদ্যিকালের বৈদ্যি বুড়ীর কথা! শুনত আর অবাক হয়ে যেতো।

এখন কিন্তু একেবারে উল্টো ব্যাপার ঘটেছে।

ইস্কুলের বইয়েতে নানান রকম অদ্ভুত ব্যাপার পড়ে আর মাস্টার-মশায়ের কাছে শুনে এবার পিন্টুই দিদিমাকে গল্প শোনাতে সুরু করেছে। দিদিমা অবাক হয়ে সেই সব কাহিনী শুনছে আর তাঁর ফোকলা দাঁতের মুখের হাঁ কেবলি বেড়ে যাচ্ছে! সূয্যি ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে,—নাগরাজ বাসুকির নড়াচড়ায় ভূমিকম্প হয় না, তার আলাদা কারণ রয়েছে—এ-সব কথা পিন্টু বহু চেষ্টা করেও দিদিমাকে বোঝাতে পারে না।

সে আর তার দিদিমা এই যেন পৃথিবীর সব, এই ছিল পিন্টুর ধারণা। মাঝখানে যে আর কেউ থাক্‌তে পারে, অথবা না থাক্‌লে তার জন্যে অভাব বোধ হতে পারে—একথা ওর মনে কোনো দিন জাগ্‌তেই পারেনি! হয়ত দিদিমাই তাকে বুক দিয়ে আগ্‌লে রেখে কোনো কথা জানবার ফুরসৎ দেননি!

মন যে কখনো-সখনো একেবারে খারাপ হত না—তা নয়। যখন কোনো বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখত, তার মা তাকে আদর করে কথা বল্‌ছে, বুকে টেনে নিচ্ছে, ইস্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞেস করছে···কি জানি কেন—পিন্টু সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারত না! ধোপারা কাপড় কেচে শুকোতে দেবার আগে যে ভাবে দু'জনে মিলে জল নিংড়ে নেয়,—পিন্টুর মনে হত, তার মনটাকেও কেউ বা অমনি করে দুমড়ে দিচ্ছে!

মনের কেমন যেন একটা অসহ্য ভাব···ও ঠিক ভালো করে প্রকাশ করতে পারে না।

না হয় মনের সে কথা লুকোনোই থাক্‌ত।

আজ দিদিমা নতুন করে সে কথা প্রকাশ করছেন কেন?

শান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো পিন্টু ঘরের ভেতর গিয়ে খাটের ওপর বস্‌লে।

এক কোণে একটি মাটির প্রদীপ জ্বল্‌ছে। তারই কাঁপা-কাঁপা ছায়া দেয়ালের গায়ে যেন মাথা কুটছে! সে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

দিদিমা তাঁর আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে বেছে-বেছে একটা মরচে-পড়া চাবি খুঁজে বের করলেন। সেইটে দিয়ে খোলা হল একটা সেকেলে তোরঙ্গ। তারই ভেতর এক কাঁথা। চমৎকার সব পদ্ম আঁকা সেই কাঁথার ভেতর। খুব সরু ছুঁচ দিয়ে সেই সব পদ্ম আঁকতে যে কত মাস, কত বছর লেগেছে, সে কথা পিন্টুর পক্ষে ধারণা করা মুস্কিল। তবু পিন্টু বুঝতে পারলে যে, পদ্মগুলির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পিন্টু একদৃষ্টিতে কাঁথাটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে দিদিমা ধীরে-ধীরে তার

চুলের ভেতর আঙুল চালাতে-চালাতে বল্লেন, এই পদ্ম-কাঁথা তোর মায়ের হাতের তৈরী। ওর আর কিচ্ছু আমার কাছে নেই, তাই এই কাঁথাটি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ভয়ে কখনো বের করি না, পাছে খোয়া যায়। ছেলেবেলায় আমার কাছেই সে কাঁথা তৈরী করতে শিখেছিল, বিয়ের পর যখন সে শ্বশুর-ঘর করতে যায় এই কাঁথাটা আমি রেখে দিই। ওর হাতের ত কিছুই আর রইল না আমার কাছে! সে কাঁথা আজও তেমনি আছে··· কিন্তু তোর মা আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে।



চমৎকার সব পদ্ম আঁকা! [পৃঃ—১০০

পিন্টু বল্লে, এই কাঁথাটা আমায় দাও না দিদিমা, আমি রাত্তিরে গায়ে দেবো।

লোকে সাপ দেখলে যেমন আঁৎকে ওঠে, দিদিমা ঠিক তেমনি খাটের ওপর থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, তুই বলিস্ কি হতভাগা! এই কাঁথা আমি তোকে দেবো? এসেই তো মাকে আগে খেয়েছিস্! তার হাতের এইটুকু পদার্থ আমার কাছে রয়েছে—তা-ও বুঝি তোর সহ্য হচ্ছে না? আর এ ব্যবহার করতে সুরু করলে আর ক'দিন? এমন জিনিষ তেলচিটে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে যাবে, তাইত তুই চাস্? না বাপু, এ আমি প্রাণ থাকতে কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না।

● দিদিমার পদ্ম-কাঁথা
শ্রীঅখিল নিয়োগী

লোকে বহুমূল্য মণি-মাণিক্য যেমন করে চোরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, দিদিমা ঠিক তেমনি কাঁথাটা তোরঙ্গের ভেতর বন্ধ করে চাবি গোপন করে রেখে দিলেন।

পিন্টুর মনটাও খুব ভারী হয়ে এসেছিল। তাই দিদিমার মুখ থেকে এতখানি গাল-মন্দ খেয়েও আর কোনো জবাব দিলে না। শুধু মনে-মনে এই কথাই বুঝলে যে, দিদিমা তার মাকে কত ভালোই না বাসত!

সেইদিন থেকে পিন্টু একেবারে শান্ত হয়ে গেল। দিদিমার সঙ্গে আর পারতপক্ষে কোনো দৌরাত্ম্য করতো না!

* * * *

এই ঘটনার অল্প কয়েক মাস পরেই এলো সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। চালের জন্যে লোকে পোকার মতো মরতে লাগল।

দিদিমার ছিল কিছু ধানী জমি। যারা চাষ করত, তারা অর্দ্ধেক নিত আর বাকি অর্দ্ধেকে দিদিমা আর নাতির দুটি পেট কোনো রকমে চলে যেত।

দুটি পেটে খেয়ে প্রাণ যদি বা বাঁচল—কিন্তু তার পরেই এলো কাপড়ের টানাটানি।

পিন্টু ব্যাটা ছেলে—ছেলেমানুষ! কাপড়ের টুকরো, হাফ-প্যান্ট, ছেঁড়া চট্—যাহোক পরে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু মুস্কিল হল দিদিমার।

ক্রমে-ক্রমে অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, ঘরের বার হতে পারেন না। পুকুরে নাইতে যাওয়ারও অসুবিধে।

পিন্টু বল্লে, তোমার ত' আগেকার দিনের গয়না আছে, তাই একটা দাও; আমি শহরে চলে যাই। সেখানে স্যাকরার কাছে গয়না বিক্রী করে একটা-না-একটা দোকানে কাপড় মিলবেই। আমাদের পাড়াগাঁয়েই হয়ত কাপড় আসছে না। শহরের লোক ত' আর তাই বলে ন্যাংটো হয়ে নেই!

দিদিমা আঁচলে চোখ মুছে বল্লেন, আচ্ছা, তাই না হয় যা! না খেয়ে তবু ত কোনো রকমে বেঁচে আছি। না পরে জীবন রাখা আরও মুস্কিল!

একটা সাবেকী আমলের সোনার গয়না নিয়ে পিন্টু শহরের পথে পা বাড়িয়ে দিলে।

পিন্টু জীবনে শহর দেখেনি। যে দিকে তাকায়, শুধু মাথা আর মাথা! তাদের দেশে রাম-নবমীর মেলা, চড়ক-পূজোর মেলা হয় বটে, কিন্তু এত লোক তাতে জমে না। এই যে হাজারে-হাজারে লোক—এরা সব আসেই বা কোত্থেকে?

এদেরকে রক্তবীজের বংশ বল্লেও চলে!

অনেক খুঁজে-খুঁজে একটা স্যাকরার দোকান বের করলে পিন্টু।

ভেতরে ঢুকে দেখে…টাকপড়া একটি বুড়ো লোক নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে ঠুক্-ঠুক্ করে কি কাজ করছে! তাকে দোকানে ঢুকতে দেখে আড়চোখে চেয়ে শুধোলে, তোমার আবার এখানে কি চাই?

পিন্টু জবাব দিলে, আমার দিদিমার একটি পুরোনো গয়না, তাই বিক্রী করতে এসেছি।

ছেঁড়া প্যান্ট-পরা একটি পাড়াগাঁয়ের ছেলের হাতে দামী গয়না দেখে স্যাকরার চোখ দুটো লোভী নেকড়ের মতো জ্বলে উঠল। বল্লে, দেখি,—দেখি, কি রকম গয়না!

গয়নাটি হাতে নিয়ে আর একবার পিন্টুর দিকে আড়চোখে চেয়ে স্যাকরা দোকানের ভেতর চলে গেল।

পিন্টু বসে আছে ত বসেই আছে! লোকটি সেই যে ভেতরে গেল—আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না!

খানিক বাদে আর একটা মোটা-সোটা লোক দোকানে ঢুকে বল্লে, এই তুই এখানে কি কচ্ছিস? চুরি করবার মতলব বুঝি?—

পিন্টু অবাক হয়ে বল্লে, বা—রে! আমার গয়না যে নিয়ে গেল ভেতরে! আমি টাকার জন্যে বসে আছি।

লোকটা ক্যাক্-ক্যাক্ করে বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল। পানে গোটা মুখটা ভরতি, তার ওপর সামনের দিকে দুটো দাঁত নেই। বল্লে, হ্যাঁ, গয়না বিক্রী করবার মতোই চেহারা বটে! কোত্থেকে চুরি করে এনেছিস্ বল্? নইলে এক্ষুণি পুলিসে দেবো। এই বলে মাথায় এক চাঁটি মেরে ধাক্কা দিয়ে পিন্টুকে ঘরের বার করে দিলে।

দিদিমার গয়না বিক্রী করতে এসে সে হল চোর!

● দিদিমার গল্প-গাথা
শ্রীঅখিল নিয়োগী

গরীবদের কি কোনো ঠাঁই নেই পৃথিবীতে ?

পাগলের মতো সে আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে সুরু করে দিলে। আপন মনে কি যে ভাবছিল, তা সে-ই জানে। রাস্তার লোকের চীৎকারে তার চমক ভাঙল। একটা বিশেষ ধরণের লরী তাকে অল্পের জন্যে চাপা দেয়নি। চালক একটা বিকট-বদন নিগ্রো···নিজের দিশী ভাষায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পিন্টুকে বকুনি দিয়ে উঠ্‌ল।

পিন্টু ভাবলে, অজান্তে এই ভাবে মরাও যে ছিল ভালো। দিদিমার কাছে গিয়ে সে মুখ দেখাবে কি করে ?

হঠাৎ তার চোখ পড়ল—একটা বাড়ীর আলসের দিকে।

সেখান থেকে একটি থান-কাপড় ঝুলছে।

সাদা থান-কাপড় !

তার দিদিমা এই রকম একখানি কাপড়ের জন্যেই দিন গুণছে !

শহরের লোকেরা যদি তার হাত থেকে সোনার গয়না ছিনিয়ে নিতে পারে, সে-ই বা কেন একখানি কাপড়—প্রয়োজনের কাপড়, লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না ?

পিন্টুর মনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল !

লাফিয়ে উঠে সে কাপড়খানি ধরলে।

সঙ্গে-সঙ্গে ওপর থেকে হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক শোনা গেল—কে-রে, কাপড় ধরে টানাটানি করে ? পাহারাওলা—পাকড়ো—পাকড়ো—

পিন্টুর কপাল মন্দ ! তাই সেই সময় একজন পাহারাওয়ালা গোঁফে চাড়া দিতে-দিতে জুতোর খট্-খট্ শব্দ তুলে সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিল।

এরা কাজ না থাকলে কাজ তৈরী করে নেয়। কাজেই এমন একটা সুযোগ হাত-ছাড়া করে কি ভাবে ? ছুটে গিয়ে খপ্ করে পিন্টুর কান পাকড়ে ধরল।

ততক্ষণে এক ভুঁড়েল জমিদার নীচে নেমে এসেছেন। ভুঁড়ি দুলিয়ে বল্লেন, পাড়াগাঁয়ের এই সব ছিঁচকে চোরের জালায় শহরে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আরে বাপু, টাকা চুরি গেলে এই যুদ্ধের বাজারে টাকা পাওয়া যায় অঢেল ! কিন্তু কাপড় গেলে ন্যাংটো হয়ে থাকতে হবে। গাছের ছাল ত' আর পরতে পারবো না

আগেকার দিনের মতো! নিয়ে যাও হে, পাহারাওলা ভায়া, পুঁচকে চোরটাকে হাজতে পূরে রাখো।

কথায় বলে, ধরে আনতে বল্লে বেঁধে নিয়ে আসে। পাহারাওলা ত' তাই চায়! হিড়-হিড় করে পিন্টুকে টেনে নিয়ে এসে হাজতে পূরে রাখলে।

তিনদিন পরে পিন্টু যখন ছাড়া পেলে—তার চেহারা দেখে চেনবার যো নেই!

পেটের ক্ষিদে? তা সওয়া যাবে—আগে সে দিদিমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।



দিদিমার সেই পদ্ম-কাঁথা আঁকড়ে আছে! [পৃঃ—১০৬

তাই সে প্রাণপণে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটল।
সন্ধ্যের মুখে পিন্টু বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হল।
কিন্তু তুলসী-তলায় পিদিম কৈ?

এ ভুল ত' দিদিমার জীবনে কোনো দিন হয় নি!

উঠোনে পা দিতে যাবে—পাড়ার বৈকুণ্ঠ বুড়ো এগিয়ে এসে বল্লেন, এই যে—আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে—আমি গামছাটা নিয়ে আসি!

পিন্টুর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ব্যাপার কি?

জানতে ওর কিছুই বাকি রইল না। দিদিমা তার জন্যে তিন দিন অপেক্ষা করে লজ্জা নিবারণের আর কোনো উপায় না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে সকল লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

দিদিমার শব উঠোনের মাঝখানে শোয়ানো। কিন্তু একি! যে পদ্ম-কাঁথা তিনি কাউকে ছুঁতে দিতেন না, তাই দিয়ে তিনি শেষকালে লজ্জা নিবারণ করে গেছেন! দিদিমার দেহ পদ্ম-কাঁথা আঁকড়ে আছে!

পরলোক থেকে মেয়ে কি এসে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সকল জ্বালা শেষ করে দিচ্ছে?

কাল সকাল বেলা বৈকুণ্ঠ খুড়োর বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়ার হট্টগোল উঠবে। তাতে হিটলারের পতন থেকে সুরু করে জিন্নার একগুঁয়েমী পর্য্যন্ত সব আলোচনা থাকবে—কিন্তু বাঙলা দেশের বন-তুলসী গাঁয়ের একটি বৃদ্ধার ভার যে মা বসুমতী সইতে পারলেন না, তার কোনো সংবাদই খুঁজে পাওয়া যাবে না!

পিন্টু একদৃষ্টে দিদিমার পদ্ম-কাঁথার দিকে চেয়ে রইল! কিন্তু তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই কেন?



মোহনের চিঠি

—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

[মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক জীবন যে বাল্যকাল হইতেই কত উন্নত ছিল, তাঁহার পিতাকে লিখিত নিম্নের চিঠিখানায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।]

— 'গান্ধীজীর আত্মকথা' অবলম্বনে

বাবা,

যে কথা মুখে বলে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, তাই লিখে তোমার হাতে দিচ্ছি। অপরাধ এমনি গুরুতর, তোমার সামনে মাথা তোলবার সাহস নেই। শাস্তিকে ভয় করি না কিন্তু লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি দণ্ড দাও। ক্ষমা না করে তুমি আমায় আঘাত কর। তোমার শাস্তির স্পর্শ দিয়ে আমাকে পবিত্র করে তোল। পথভ্রষ্ট সন্তানকে আবার সুপথে চালনা কর।

শুনলে তুমি দুঃখ পাবে সেই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। কিন্তু তোমার কাছে সব দোষ অকপটে স্বীকার না করলে যে শান্তি পাব না! দেবতার কাছে পাপী তার অপরাধ স্বীকার করে, তবে সে দেবতার ক্ষমা পায়। তুমি যে আমার জাগ্রৎ দেবতা!

শোহনকে তো জান, আমার বন্ধু শোহন? আমরা দুজনে প্রায়ই এক সঙ্গে খেলি, বেড়াই,—তাও তুমি দেখেছ। একদিন তার সঙ্গে যুক্তি করলাম বিড়ি খেতে হবে। কেন যে মাথায় এ খেয়াল এল ভগবান্ জানেন। বিড়ির গন্ধ যে আমার ভাল লাগে তা নয়। কাকা তো বিড়ি খান! তিনি যখন বিড়িতে টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন, দেখে অনেক দিনই মনে হয়েছে এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো মজা আছে। গন্ধ খারাপ লাগলেও ঐ মজাটার জন্যেই মন টান্‌ল। অথচ বিড়ি-সিগারেট

খাওয়া আমার মত বার বছরের ছেলের পক্ষে যে অপরাধ, তাও জানি। তাই কেমন করে গোপনে গোপনে এই পরীক্ষা করা যায়, দুই বন্ধু মিলে তারই পরামর্শ চলতে লাগল।

একদিন বিকেলে আমরা দুই বন্ধু উঠোনে খেলছি। কাকা বিড়ি খেতে খেতে আমাদের খেলা দেখছিলেন। খাওয়া শেষ হলে বিড়িটা ফেলে দিয়ে তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। আমার মনে হল, এই তো সময়! শোহনকে বললাম। চারিদিক তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই! চোরের মত ভয়ে ভয়ে পোড়া বিড়িটা তুলে নিলাম। দেখলাম—আগুন তখনও আছে, দিলাম এক টান। গলাটা জ্বালা করে উঠল। তখন শোহনের হাতে বিড়িটা দিলাম। সেও এক টান দিলে। খেয়ে দেখলাম—গন্ধের চেয়ে স্বাদ আরও খারাপ। তবু খাওয়া চলতে লাগল।

কাকার এঁটো বিড়ি তো সব সময় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া পোড়া-বিড়িতে ধোঁয়াও বেরোয় কম। কাজেই গোটাকয়েক বিড়ি কেনার ইচ্ছে হল। কিন্তু বিড়ি কিনি কেমন করে? পয়সা পাব কোথায়?

যতটুকু বললাম, তোমাকে বিচলিত করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আমার কাছে তুমি কত আশা কর! আমি ভাল হব, আমি বড় হব, আমি বিদ্বান্ হব, আমি দেশের সুসন্তান হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করব—এই তোমার আশা। তোমার সেই আশা আমি কি ভাবে পূর্ণ করছি! হায়, আমার অপরাধ যদি এইখানেই শেষ হত! কিন্তু তা নয়। তোমার শরীর অসুস্থ, রোগে তুমি কাতর। পুত্রের কাজ সেবা করা, শুশ্রূষা করা। তার বদলে রোগ-যন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলছি। আর মানসিক যন্ত্রণার তো কথাই নেই! তবু সব কথা খুলে বলব।

বিড়ির পয়সা চাই। না পেয়ে চুরি শুরু করলাম। চাকরদের কাছে যে পয়সা থাকত, তারই থেকে দুটো একটা নিয়ে বিড়ি কেনা চলত। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল বিড়ি রাখা নিয়ে। রাখি কোথায়? সব বিড়ি তো আর এক সঙ্গে খাওয়া যায় না। এমন সময় খবর পেলাম, এক রকম লতা আছে, তার পাতা বিড়ির মত করে পাকিয়ে খাওয়া যায়। ইচ্ছেমত সেই পাতা গাছ থেকে তুলে বিড়ি খাওয়া চলতে লাগল।

● খোকার চিঠি
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

গোপনে ধূমপান করতে লাগলাম। গুরুজনেরা কেউ টের পেলেন না। শাস্তি অথবা তিরস্কারেরও ভয় রইল না। তবু শান্তি পেলাম না। বারংবার এই কথাই মনে হতে লাগল যে, ছোটদের জীবনে স্বাধীনতা কিছুমাত্র নেই—পদে পদে বাধা আর নিষেধ! পরাধীনতার শৃঙ্খল যেন তাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে তাদের পঙ্গু করে রেখেছে!

জীবনে ধিক্কার এল। পোষমানা প্রাণীর মত এমন জীবন রেখে লাভটা কি? ভেবে-চিন্তে দুই বন্ধুতে মিলে ঠিক করলাম—এ জীবন আর রাখব না। বিষ খেয়ে এই বিষময় জীবন ত্যাগ করব। কিন্তু বিষ পাব কোথায়? চাইলেই বা দেয় কে? শুনেছিলাম ধুতরো-বীজ খেলে মানুষ মরে। তাই বনে গিয়ে ধুতরো ফল তুলে তার থেকে কতকগুলো বীজ সংগ্রহ করলাম। তারপর সন্ধ্যাবেলা কেদারজীর মন্দিরে গিয়ে প্রদীপে ঘি দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে মন্দিরের এক নির্জন কোণে বসে আত্মহত্যার জন্যে মনকে প্রস্তুত করতে লাগলাম।

কিন্তু মন হঠাৎ বেঁকে বসল। সারাদিন ধরে যে সাহস সঞ্চয় করেছিলাম, দেখলাম তার একটুও বাকী নেই। দু-চারটা বীজ পেটে যেতে না যেতেই বড় ভয় করতে লাগল। কেদারজীর মন্দির ছেড়ে গেলাম রামজীর মন্দিরে। রামজীর মূর্তি দর্শন করে আত্মহত্যার কথা ভুললাম।

সে আজ তিন বৎসরের কথা—এই তিন বৎসরের মধ্যে আত্মহত্যার ইচ্ছে আর মনে জাগে নি। কিন্তু এই উপলক্ষে মনের মধ্যে যে আলোড়ন উঠেছিল, তার একটা ফল পেয়েছি। কেদারজীর মন্দিরের প্রদীপে ঘি দেওয়া নিষ্ফল হয়নি, রামজীও বোধ হয় কৃপা করেছিলেন, বিড়ির নেশা সেই থেকে সম্পূর্ণরূপে কেটে গেছে। কিন্তু একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাকী ছিল। তোমার কাছে যে অপরাধ গোপন রেখেছিলাম, তার জন্যে দণ্ড না পেলে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে না।

জানি, তুমি গুরুদণ্ড দেবে না। সন্তানের প্রথম অপরাধকে তুমি স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে দেখবে। কিন্তু গুরুদণ্ড আমার যে চাই-ই। কারণ, এই অপরাধ প্রথম হলেও শেষ নয়। এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ করেছি, আজ তোমাকে তা শুনতে হবে।

● খোকনের চিঠি
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

এতে তুমি দুঃখ পাবে আরও বেশী। কেন না, একলা আমি নই ; তোমার আরও এক ছেলে এই পাপের সঙ্গে জড়িত—আমার মেজদা।

মেজদা বাজে খরচ করে কিছু টাকা ধার করতে বাধ্য হন। সব জড়িয়ে তাঁর ধারের পরিমাণ প্রায় টাকা পঁচিশ। পাওনাদারের তাগাদা অসহ্য হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তোমার কানে তুলবে বলে জানালে, তখন মেজদা ভারী ভয় পেলেন। মেজদা যখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তখন আমিই পরামর্শ দিলাম। কি পরামর্শ দিলাম, তা তোমার ঐ নির্মল মন নিয়ে কখনও কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার ছেলের এতদূর অধঃপতন হতে পারে, এ তুমি ভাববে কেমন করে? কিন্তু সে অধঃপতন হয়েছে। আমি পরামর্শ দিলাম—চুরি করতে। সত্যি সত্যি করলামও চুরি। তাকে চুরি ছাড়া আর কি বলবে বল? মেজদার হাতের সোনার তাগা—সেই নিরেট সোনার মোটা তাগা—তারই খানিকটা, ওজনে প্রায় তোলাখানেক হবে, কেটে নিলাম। তাই দিয়ে মেজদার ধার শোধ হল।

মেজদার ধার তো শোধ হল, কিন্তু অশান্তির আগুনে আমি দগ্ধে দগ্ধে মরতে লাগলাম। বেশীদিন চুপ করে থাকলে পাগল হয়ে যাব। পাপ করেছি সে তো এক অপরাধ! তোমার কাছে গোপন রেখে সে অপরাধ যদি আরও বাড়িয়ে চলি তো বিধাতা ক্ষমা করবেন না। বিধাতা দণ্ড দেন, মাথা পেতে নেব ; কিন্তু তোমার নিজের হাতের দণ্ড আগে দাও। দণ্ডকে আমি আশীর্বাদ বলে মেনে নেবো। সেই হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। নিবেদন ইতি—

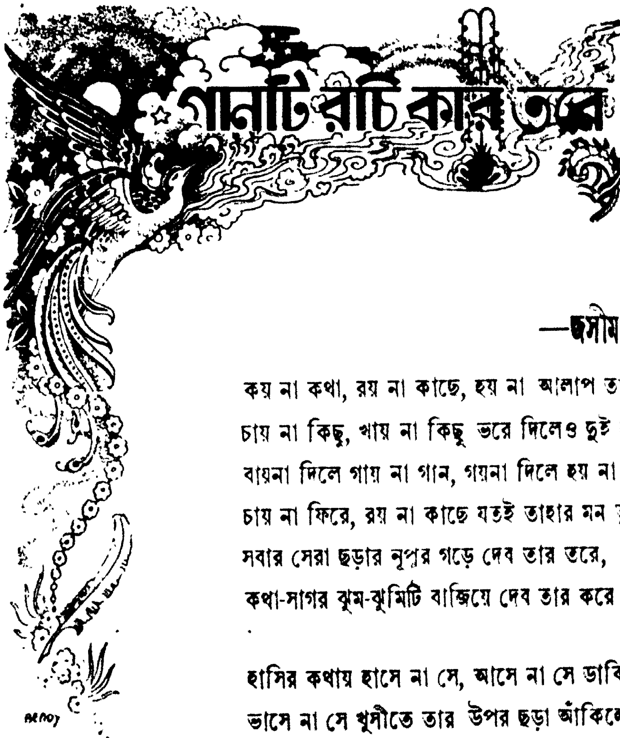
তোমার অনুতপ্ত সন্তান

মোহন

আঁধারে আলো

● চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

—স্বামী বিবেকানন্দ



গানটি রচি কার তরে

—জসীম উদ্‌দীন

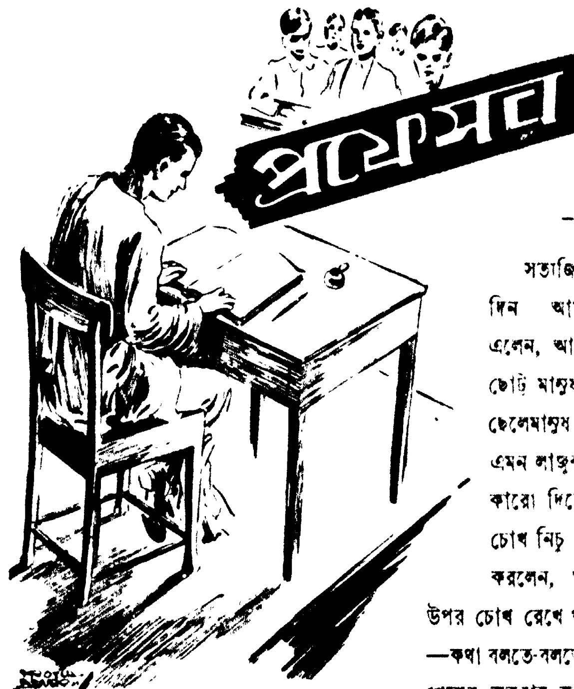
কয় না কথা, রয় না কাছে, হয় না আলাপ তার সাথে,
চায় না কিছু, খায় না কিছু ভরে দিলেও দুই হাতে।
বায়না দিলে গায় না গান, গয়না দিলে হয় না খুসী,
চায় না ফিরে, রয় না কাছে যতই তাহার মন তুষি।
সবার সেরা ছড়ার নূপুর গড়ে দেব তার তরে,
কথা-সাগর ঝুম-ঝুমিটি বাজিয়ে দেব তার করে।

হাসির কথায় হাসে না সে, আসে না সে ডাকিলে,
ভাসে না সে খুসীতে তার উপর ছড়া আঁকিলে।
পাড়ায় কোথায় বেড়ায় না সে পড়ার বহি থাকিলে,
অন্ধ ঘরের কোণে লুকায় বন্ধু কেহ ডাকিলে।
তবু আমি সবার সেরা গানটি রচি তার তরে,
আমের আঁটির বাঁশী বানাই সে যদি বা লয় করে।
তারির তরে জোছনা-সুতোয় গল্প বুনোই রাত জেগে
তারা-ফুলের নক্সাগুলি মাঝে-মাঝে লই এঁকে।
তারির তরে চাঁদের চুমো পাড়তে পারি চাঁদ থেকে,
গলায় দিতে ছিঁড়তে পারি রামধনুকের অর্দ্ধেকে।

তারির তরে ছড়ায় ছড়ায় মন যে আমার গড়িয়ে যায়,
রূপকথারি রূপের নদী ছুটেছে আজ ধরতে তায় !

কেউ তাহারে কয় না ভাল, হয় না ভাল হক্ কথায়,
কেউ তাহারে চায় না কাছে, যায় না কেহ ডাকতে তায়।
ঘরের কোণে কি নির্জ্জনে একলা মনে দিন কাটায়,
খেলায় নাক, বেড়ায় নাক, ছড়ার কথায় না ছড়ায়।
কেউ ত তাহার চায় না ভাল, চায় না ভাল হতেও সে,
কি যে করে, কি যে ভাবে, সেই জানে সে উদ্দেশে !
তারির তরে পত্র লিখি সাঁঝ-সকালের সব মেঘে,
লালে নীলে হলুদ মিলে রঙের নাচন যায় লেগে।
তারির তরে পত্র লিখি রঙিন পাখীর পাখার পর,
নীল আকাশে তেপান্তরে উড়াই দিকে দিগন্তর।
তারির তরে পত্র লিখি রোজ বিহানের ফুলের গায়,
ভোমরা পাখীর গুণগুণানির সুর-বুনানীর মৃদুল বায়।
তার উদ্দেশে ঘুমের দেশে স্বপন গড়ি রাত জেগে,
হাজার তারার প্রদীপ জ্বালি' জেগে থাকি তার লেগে।

সেই যদি না সামনে এলো, রামধনুকের কিসের জাঁক ?
ছড়ার পড়ার নূপুরগুলো আজকে তবে ভেঙেই যাক্ !
আজকে তবে চাঁদকে ডেকে মনের মত দাও বোকে
কোন্ সুখে সে হাসে, যদি নেই হাসি সেই ম্লান মুখে !



প্রফেসর

—বুদ্ধদেব বসু

সত্যজিৎবাবু প্রথম যে-দিন আমাদের পড়াতে এলেন, আমরা তো অবাক্! ছোট্ট মানুষটি, ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ মুখের ভাব, এমন লাজুক যে, চোখ তুলে কারো দিকে তাকান না। চোখ নিচু ক'রে রোল-কল্ করলেন, তারপর বইয়ের উপর চোখ রেখে পড়াতে লাগলেন—কথা বলতে-বলতে কতবার হোঁচট খেলেন, কতবার কাশলেন, কতবার রুমাল বের করে মুখ মুছলেন—তারপর ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে বই বন্ধ ক'রে প্রস্থান! প্রথম দিন আমরা যে চুপ ক'রে ছিলুম, সেটা নেহাৎই এই নাবালকের উপর দয়া ক'রে।

আমরা মানে—আমাদের দল। জাঁক করছি না, কিন্তু আমাদের দলটি একত্র হ'লে যে-কোনো কলেজে যে-কোনো প্রফেসরকে ভগবানের নাম স্মরণ করাতে পারি, এ-কথায় কোনো ভুল নেই। আমরা কেউ দু'বার ফেল্ করেছি, কেউ চার বার, দাড়ি কামাতে-কামাতে গাল আমাদের শক্ত হ'য়ে গেছে, কলেজ চাখতে-চাখতে কলেজে ঘেন্না ধ'রে গেছে! আমাদের নিয়ে একটা হুলুস্থূল লেগেই আছে কলেজে,

আর আমরাও দস্তুরমতো ভারিক্কিভাব ধারণ ক'রে দরোয়ান থেকে প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত সকলের কাছেই আমাদের পদগৌরব ঘোষণা ক'রে থাকি। যখন আমরা ক্লাশের মধ্যে চুপ ক'রেও থাকি, তখনও শরীরটাকে অকারণে বেঁকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে এ-কথা জানাতে ভুলি না যে, ঐ প্রফেসর-নামক জীবটাকে আমরা মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না। প্রফেসরদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা আমাদের দেখেও ছাখেন না ; যাঁরা ঘাঁটাতে আসেন, তাঁরা বিপদে পড়েন।

রোজ-রোজ একরকম ক'রে-ক'রে অরুচি ধ'রে যায়, সত্যজিৎবাবুকে দেখে আমাদের আনন্দ তাই আর ধরে না। যাক্‌, এতদিনে বেশ বড়োরকমের একটা তামাশা জমিয়ে তোলা যাবে। মাঝে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিলুম, এইবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠলুম সকলেই।

নটবর বললে, 'এই বাচ্চাটাকে কোত্থেকে ধ'রে আনলো রে ?'

অংশু বললে, 'এই তো এবারেই পাশ ক'রে বেরুলো। খুব নাম-করা ছাত্র !'

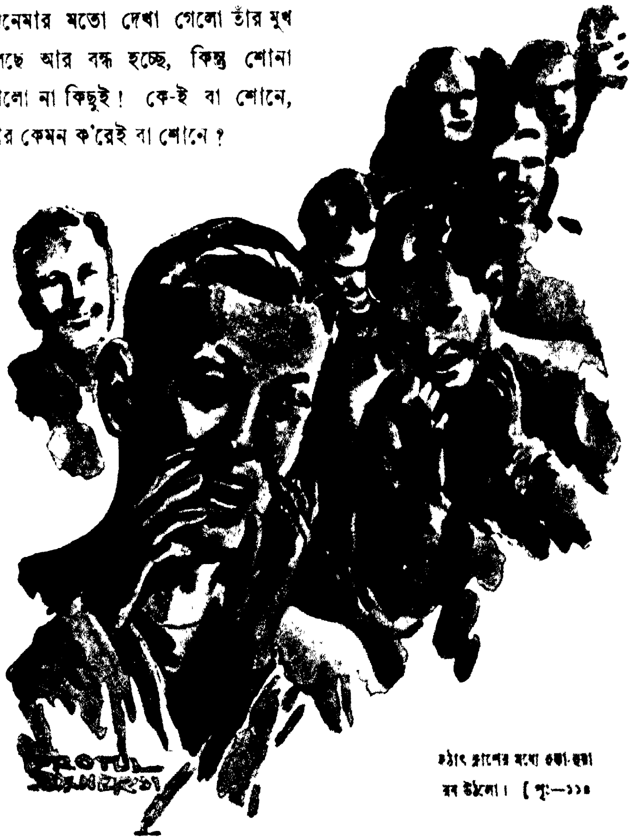
'নাম-করা ছাত্র !' আমরা একসঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম, যেন এর চেয়ে বড়ো রসিকতা জীবনে শুনিনি।

তিমির আমাদের হকি-টীমের ক্যাপ্টেন, সে জিন-প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'আহা, ছেড়ে দে। একেবারে ছেলেমানুষ বেচারা !'

আবার উঠলো হাসির রোল। এর পরের দিন সত্যজিৎবাবু আমাদের ক্লাশে এসে নাকের জলে চোখের জলে এক হবেন—সে যে কী মজাই হবে, সে-কথা ভেবে সাত দিন আগেই আমরা হী-হী ক'রে হাসতে লাগলুম।

আগে থেকেই সব প্ল্যান করা ছিলো—সেদিন আমরা এক জায়গায় না বসে সমস্ত ক্লাশের মধ্যে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে বসলুম। নাম-ডাক শেষ ক'রে সত্যজিৎবাবু মুখ-টুক মুছে নিয়ে সবেমাত্র বই খুলেছেন, এমন সময় হঠাৎ ক্লাশের মধ্যে হুক্কা-হুয়া রব উঠলো। সত্যজিৎবাবু ফ্যালফ্যাল ক'রে একবার এদিকে তাকান, একবার ওদিকে—কিন্তু তিনি বাঁয়ে তাকালে ডান দিক থেকে, ডাইনে তাকালে বাঁ দিক থেকে, সামনে

দু'একবার কী বলবার চেষ্টা করলেন তিনি; আগেকার দিনের অ-বাক্ সিনেমার মতো দেখা গেলো তাঁর মুখ খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, কিন্তু শোনা গেলো না কিছুই! কে-ই বা শোনে, আর কেমন ক'রেই বা শোনে?



হঠাৎ ক্লাশের মধ্যে হৈ-হল্লা রব উঠলো। [পৃঃ—১১০

ক্লাশের ছেলেরা প্রথমটায় কেমন থ' খেয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তক্ষুণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তারাও একেবারে খাঁটিমতো বোকা বনেছে। তাদের মনে-মনে আমাদের

মতো হবার ইচ্ছে অথচ সাহস নেই, তারা অন্যান্য জীব-জন্তুর কণ্ঠস্বরের অনুকরণ ক'রে-ক'রে চ্যাঁচামেচির খাতায় মোটা-মোটা চাঁদা দিতে লাগলো ; যারা একটু নিরীহ বোকা-সোকা গোছের, তারা হাসি চাপতে গিয়ে নানারকম উৎকট আওয়াজ বের করতে লাগলো গলা দিয়ে ; আর যেগুলো একেবারেই ভ্যাবলা, মিনিমুখো, মন জোগানো গুড্ বয়, সেগুলো শুধু মুখ হাঁড়ি ক'রে চুপ ক'রে রইলো। বিচিত্র পশু-কণ্ঠের সঙ্গে-সঙ্গে হাসি, হাঁচি, হৈ-হৈ, হাত-তালি ইত্যাদি উপসর্গ সংযুক্ত হ'য়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হ'তে লাগলো যেন আস্ত একটা চিড়িয়াখানা আর আধখানা পাগলা-গারদ ক্লাশের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে !

সত্যজিৎবাবু বার-বার কী বলবার চেষ্টা করলেন, হাত নাড়লেন, টেবিল চাপড়ালেন, স্তব্ধ হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিতান্ত অসহায়ের মতো, তারপর মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন ক্লাশ থেকে। তিনি চ'লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় একশো ছেলে সমস্বরে একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠলো—অভ্যর্থনার উপযোগী বিদায়টাও হওয়া চাই তো !

আমাদের মধ্যে একজন বললে, 'একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেলো, কেষ্ট ! এখন একটা ফাইন-টাইন না হয় !'

নটবর বললে, 'রেখে দে ! আমরা মাইনে দিই ব'লেই তো কলেজ চলছে—আমাদের আবার ফাইন করবে কে রে ?'

আমি বললুম, 'তুই কি ভেবেছিস উনি কমপ্লেন করবেন ? কক্খনো না। কিছু বলতে গেলে ওঁরই দুর্নাম হবে—উনিই ক্লাশ ম্যানেজ করতে পারেন না, তাই এ-রকম হয়। এ ওঁকে বেমালুম হজম করতে হবে, দেখিস।'

নটবর বললে, 'তা ছাড়া কার নামেই বা নালিশ করবেন ? কারো নামও জানেন না, রোল-নম্বরও জানেন না। উপায়ও নেই জানবার। এতগুলো ছেলে গিশ্‌গিশ্ করছে—কে কার খবর রাখে ?'

'আরে দূর ! ঐ পুঁচ্‌কেকে নিয়ে আবার এত ভাবনা ! ভাখ না, আরো কী মজা করি ওকে নিয়ে', ব'লে আমি হাই বেঞ্চের উপর পা তুলে দিলুম।

আমার অনুমানই সত্য হ'লো, এ নিয়ে কলেজে কোনো সাড়াশব্দই শোনা গেলো না। কিন্তু পরের সপ্তাহে সত্যজিৎবাবু আমাদের ক্লাশ নিলেন না—মানে, কলেজেই সেদিন তিনি অনুপস্থিত! আমাদের ভয়ে প্রফেসরকে কলেজ কামাই করতে হয়—কম ক্ষমতা আমাদের!

তার পরের সপ্তাহে তিনি আবার আমাদের মুখোমুখি এলেন। কিন্তু সেদিন ক্লাশের এই ছেলেখেলার চাইতে বড়ো খেলা ছিলো মোহনবাগানের মাঠে; আমরা তাই ঠিক করেছিলুম, যে আজ আর কিছু না, ভালোমানুষের মতো নাম প্রেজেণ্ট ক'রেই বেরিয়ে মাঠে চ'লে যাবো! চুপচাপই ব'সে ছিলুম।

সত্যজিৎবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় রোল-কল্ করতে লাগলেন। ততক্ষণ আমার মাথায় এক নতুন বুদ্ধি সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আজকের দিনটাকে একেবারে একাদশী যেতে দেওয়া কি উচিত?—অন্য ছেলেরাও তো কিছু আশা করে? পিছনের বেঞ্চিটার গায়ে হেলান দিয়ে খুব হাত-পা ছড়িয়ে বসলুম আমি। সত্যজিৎবাবু আমার রোল-নম্বরটি যেই ডাকলেন, অমনি আড়ামোড়া ভেঙে মস্ত হাই তুলতে-তুলতে বললুম, 'প্রেজেণ্ট স্যর!'

আমার ভঙ্গিটা দেখে কাছাকাছি একদল ছেলে হেসে উঠলো।

সত্যজিৎবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'Get out of my class.'

চোখ গোল-গোল ক'রে হাত উল্টিয়ে বললুম, 'আমি, স্যর? আমাকে বলছেন?'

'Yes. You, you! Get out! Get out!'

দাঁত বের ক'রে হেসে বললাম, 'আচ্ছা, স্যর। চলি, নমস্কার!'

স্যাণ্ডেল কট্‌কট্ করতে-করতে সদর্পে বেরিয়ে এলাম, আমার সঙ্গে-সঙ্গে একজন ছাড়া দলের সবাই অত্যন্ত উদাসীন চেহারা ক'রে চ'লে এলো, একজন রইলো অন্যদের প্রক্সি দিতে।

অত্যন্ত নির্দোষ একটা কাজলেমি করতে গিয়ে সত্যজিৎবাবুর কাছে ধরা প'ড়ে গেলুম। পরের দিন ক্লাশে এসে রোল-কলের আগেই তিনি চোখ দিয়ে আমাকে খুঁজে বের করলেন।

'তুমি আবার এসেছো? যাও, আমার ক্লাশে আর এসো না তুমি, এলেও পার্সেণ্টেজ পাবে না।'

সেদিনও বুক চেতিয়ে বেরিয়ে এলুম, কিন্তু বীর-রসটা সেদিন আর অতটা কড়া লাগলো না যেন, অন্য ছেলেদের বাহবাটাও একটু ফ্যাকাশে ঠেকলো। তারপর বিরক্ত হ'য়ে ওঁর ক্লাশে যাওয়া ছেড়েই দিলুম—পার্সেণ্টেজ না-পেলে কোনো ফুর্তিই তেমন জমে না!

* * * * *

দশ বছর কেটে গেছে। চার বারের চেষ্টাতেও বি, এ, পাশ করতে পারি নি। আমাকে একটা আপিশের খাঁচার মধ্যে পুরে দিতে বাবা যখন উঠে-প'ড়ে লেগেছেন, তখন আমার কপাল-জোরে জাপানি যুদ্ধ লাগলো, আর মুরুব্বির জোরে আর্মিতে একটা কমিশন পেয়ে গেলুম। দু'দিন আগেও যে ফ্যা-ফ্যা ক'রে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো, সে হঠাৎ খাকি-পরা লেফটেনাণ্ট্ হ'য়ে বুটের শব্দে পাড়া কাঁপাতে লাগলো। পাড়া বলতে অবশ্য সারা দেশই বোঝায়—আজ এখানে, কাল সেখানে, ঘোরাঘুরির উপরই কাটলো ছ'মাস।

তারপর এক মাসের ছুটি পেয়ে কলকাতায় ফিরছি। কোথেকে ফিরছি বলতে পারবো না—বলা বারণ—এটুকু বললেই চলবে যে, রাস্তাটা বেশ লম্বা। সারা রাত ট্রেণে কাটিয়ে যেখানে ভোর হ'লো, সে-ও বাংলাদেশ থেকে বহু দূর। তা হোক, রাস্তাটা আমার ভালোই লাগছিলো। সেকেণ্ড-ক্লাশে চলেছি, পরনে খাকি, পকেটে এক তাড়া নীল-নীল কাগজের টাকা—নিজেকে বেশ হোমরা-চোমরা গোছের বোধ হচ্ছিলো। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিন বার খেলুম, প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে লম্বা-লম্বা পা ফেলে প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করতে লাগলুম—মনে হ'লো সব জানলা থেকে সবগুলি চোখ আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। দুপুরবেলা তেতে উঠলো, আকণ্ঠ খেয়ে নিয়ে একটু ঘুমের আয়োজন করছি, এমন সময় একটা ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো, আর কামরায় উঠলেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি ছোটোখাটো বাঙালি ভদ্রলোক। একবার তাকিয়েই চিনতে পারলুম—সত্যজিৎবাবু! মুখ একটু ভারি

হয়েছে, তাছাড়া প্রায় একরকমই আছেন দেখতে। কুলিকে বিদায় ক'রে মাঝখানকার বেঞ্চিটায় ব'সে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গেই হাতের বইখানা খুলে চোখ নিচু করলেন।

ওঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি ছট্‌ফট্‌ করছিলুম। যাকে ক্লাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে-ছেলেকে একবার দেখুন উনি!

শোয়া থেকে উঠে ব'সে আমি এক দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। যক্কুনি বই থেকে একবার চোখ তুললেন, অমনি চোখে চোখ ফেলে বললুম, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

সত্যজিৎবাবু শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের এতটুকু ভাবান্তর হ'লো না!



তাঁর মুখের এতটুকু ভাবান্তর হ'লো না।

'আমি আপনার ছাত্র ছিলুম।'

'ও।'

'একটা ঘটনা বললে নিশ্চয়ই আমাকে মনে পড়বে আপনার।'

সত্যজিৎবাবুর ভুরু একটু উঁচু হ'লো।

'আমাকে আপনি ক্লাশ থেকে বের ক'রে দিয়েছিলেন—সেবারই প্রথম আপনি এলেন কলেজে—'

'তা—তা হবে', সত্যজিৎবাবু অস্পস্টভাবে একটু হেসে আবার বইয়ের পাতায় চোখ নামালেন।

আমি তবু বললুম, 'আমি এখন যুদ্ধের কাজ করছি—লেফ্‌টেনান্ট্‌ হয়েছি!'

চকিতে চোখ তুলে উনি বললেন, 'বেশ, বেশ', তারপর আবার পড়তে লাগলেন।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা কাটলো—তার মধ্যে আর একটাও কথা বললেন না, একবার তাকালেনও না আমার দিকে। বইয়ের মধ্যে ডুবে-থাকা স্থির গম্ভীর তাঁর মুখে স্মৃতির কোনো চিহ্নই পড়েনি—আমি তাঁকে অপমান করেছিলুম, তাই তাঁকে আমার খুব ভালোই মনে আছে—কিন্তু সত্যি বুঝি অপমান করতে পারিনি, তাই আমার সম্বন্ধে তাঁর মনে এতটুকু ছায়া নেই—না রাগের, না দুঃখের, না ক্ষমার! আমি একেবারে মুছে গেছি, তাঁর কাছে আমার অস্তিত্বই নেই।

তাঁর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিজেকে হঠাৎ আমার অত্যন্ত ছোটো মনে হ'লো—তারপর পরের স্টেশনে যখন গাড়ি দাঁড়ালো, তাড়াতাড়ি কুলি ডেকে মাল-পত্র নিয়ে অন্য কামরায় চ'লে এলুম।

বাঁচলুম এসে! ঐ চুপ-ক'রে-থাকা, চুপ-ক'রে-রাখা চোখের তলায় আরো বারো ঘণ্টা ব'সে থাকতে হ'লে আমার দেহে কি আর প্রাণ থাকতো!

আঁধারে আলো

● কাউকে যদি প্রশংসা করতে না পারো ক্ষতি নেই, কিন্তু তার নিন্দে কোরো না।

—প্রাচীন পারস্য-উপদেশ



নেশা ও ফুলি —

—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মন্মথ শক্ত করে ছেলেটার হাত চেপে ধরলেও তার কেমন ঘৃণা বোধ হতে লাগলো।

বন্দীর বয়স আট বছরের বেশি হবে না। গায়ের রঙ কালোই বলা যেতে পারে। তার ওপর পড়েছে ময়লা। তার ওপরেও এখানে-সেখানে লুকিয়ে আছে কাদা-মাটি-কালির ছাপ। তবে শরীরটা একটু নধর ; মাথার চুলগুলো লম্বা, কোঁকড়া ; চোখ দুটোও বড়। তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসছে বন্য আলো। পরনে একটা ছেঁড়া, ময়লা কাপড়। মন্মথ এই ধরণের অনেক ছেলে-মেয়েকে বাজারের ভেতরে-বাইরে ঘুরে বেড়াতে দেখে।

সে বন্দীকে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, "কেন আমার পকেটে হাত দিয়েছিলি ? চোর !"

একে বাজার ; তার ওপর তখন বেলা আটটা বাজে। খরিদ্দারের বিষম ঠেলাঠেলি। যেন বন্যার জল সেই চত্বরে ঢুকে বেরোবার পথ না পেয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, ধাক্কা মারছে, ঢেউ তুলছে, কল-কল ছল-ছল করে উঠছে।

ছেলেটা বড়-বড় চোখ দুটো তার মুখের দিকে তুলে চুপ করে রইলো।

—"বল্।" মন্মথ আর একটা ঝাঁকি দিলে।

ছেলেটা এবার বললে, "হাত দিই নি।"

—"হাত দিস্‌নি ? মিছে কথা।"

পাশ থেকে একজন বলে উঠলো, "ছেড়ে দিন মশায়! আপনার পকেট তো মারা যায়নি?"

আর একজন বললে, "পকেটে কিছু ছিল কি?"

লোকটির মন্তব্যে দু'-চারজন হেসে উঠলো; কিন্তু জনতার অধিকাংশই রইলো গম্ভীর।

—"তোর সঙ্গের সেই মেয়েটা কোথায় গেল?"

—"সঙ্গে কেউ ছিল না।"

—"ছিল না? তোরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ধাক্কাধাক্কি করছিলি, হাসছিলি. আলুওলার দোকান থেকে আলু তুলে নিচ্ছিলি। এক ঘা বেত খেয়ে দুটোতেই পালিয়ে এই মাছের দোকানে এসেছিস্। আবার বলছিস্ সঙ্গে কেউ ছিল না?"

—"রাস্তা ছাড়ুন মশায়! আফিসের সময়। রাস্তা আটকালে চলে না।"

ভিড়টার একপাশে চাপ বাড়লো।

মন্মথ ছেলেটার হাত ধ'রে টানতে-টানতে বললে, "চল্, তোকে পুলিশে দেব।"

হাতে লম্বা লাঠি, মাথায় পাগড়ি, গায়ে উর্দি, বাজারের চৌকিদার তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে ধরে এমনভাবে টানতে-টানতে নিয়ে চললো যেন সে বস্তা বা ঐ রকমের কোন জিনিষ! যেতে-যেতে সে ঘাড় ফিরিয়ে মন্মথকে বললে, "আপনিও চলুন।"

কি জানি কেন, মন্মথর উৎসাহটা হঠাৎ নিভে গেল। বাজার-করা তার হয়েই গিয়েছিল। মাছ কিনে খুচরোটা—পাঁচ-ছয় আনার বেশি হবে না,—রেখেছিল পাশের পকেটে। চাকরটা সওদা নিয়ে চলে গেছে। ইচ্ছে ছিল সে একটু ঘুরে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে বাড়ি ফিরবে। এখন অবশ্য দাঁড়ালো এই: সিগারেট কেনা হবে না, তবে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলবার মত একটা গল্প পাওয়া গেল। পাঁচ-ছ' আনা পয়সাকে খুশিমতো টাকায়ও দাঁড় করানো যেতে পারে। পকেট-মারটাকেও বাড়িয়ে বিশ-ত্রিশ বছরের ও বেশ ষণ্ডাগোছের করা চলবে। ধরবার সময় ধস্তাধস্তি, ছোরা, ঘুষি, ঘুযুৎসু—যা-খুশি জুড়ে দেওয়াও যায়।

বল্‌লে, "আমার যাবার কি দরকার ?"

—"পকেট মারা গেল আপনার। আসামীকে ধরলেন আপনি। চলুন।"

তাদের সঙ্গে চল্‌লো অতি-কৌতূহলী নিষ্কর্ম্মাদের ছোট একটি দল।

বাজারের কোণে আফিস।

আসামীকে দেখেই আফিসের একটি বাবু বলে উঠলেন, "ছোঁড়াটা আবার কি করলে ?"

চৌকিদার বল্‌লে, "এই বাবুর পকেট মেরেছে।"

—"কত ? পাওয়া গেছে ?"

মন্মথ প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলে না। ছ'আনা পয়সা পকেট থেকে তুলে নিয়েছে, একথা বল্‌তেও তার অহঙ্কারে বাধলো। শেষের প্রশ্নটার জবাব দিলে, "পাওয়া যায় নি।"

—"তবেই তো মশায় ! থানায় নিয়ে গেলে ওকে হয়তো ছেড়েই দেবে। বল্‌বে, ও ই যে নিয়েছে তার কি প্রমাণ ?"

কয়েকজন তাঁকে সমর্থন করলে, "হ্যাঁ।"

—"সাবধান হলেই পারেন। জানেন যখন হাটে-বাজারে পকেট-মার ঘুরে বেড়ায়, তখন ও-রকমভাবে পয়সা-কড়ি রাখেন কেন ? এই, তুই পয়সা নিয়েছিস্ ?"

ছেলেটা বল্‌লে, "আমি নিলুম তো সে পয়সা গেল কোথায় ?"

মন্মথ অবাক হয়ে গেল। এইটুকু ছেলে এমন চালাক ! সত্যিই তো সে ওর কাছে কিছুই পায়নি। পয়সাগুলো নিয়ে যদি ও সেই মেয়েটার হাতেই দেবে, তাহলে সেটুকু অবসরই বা পাবে কোথায় ? ওকে তো সে ধরেছে পকেটে হাত দিচ্ছে এমন সময়। আর একটা কথা তার মনে পড়লো। পয়সাগুলো সে ঠিক এই পকেটেই রেখেছিল তো ? এ-বিষয়েও সে নিশ্চিত হতে পারলো না। তবুও তার দৃঢ় ধারণা হল, পয়সাগুলো ও-ই নিয়ে ওর সঙ্গিনীর হাতে চালান করে দিয়েছে ! তাই সে বল্‌লে, "তুই টাকা-পয়সাগুলো নিয়ে তোর সঙ্গীকে দিয়েছিস্।"

● দিদা ও তুমি
[illegible] মিত্র

—"আমার সঙ্গে কেউ ছিল না।"

আফিসের বাবুটি মুখের বিড়িটা নামিয়ে বললেন, "টাকা-পয়সাগুলো আপনি পকেটেই রেখেছিলেন তো? অনেক সময় রাখতে গিয়ে পড়েও যায়।"

কথাগুলো সত্যি। তবু সে বললে, "পড়ে যায় বটে কিন্তু আমার টাকা-পয়সাগুলো যে পড়েই গিয়েছিল, তার তো কোন প্রমাণ নেই!"

—"আবার ও-ই যে আপনার পকেট থেকে সেগুলো তুলে নিয়েছে, তারও তো প্রমাণ দিতে পাচ্ছেন না!"

মন্মথ অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

জনতার একজন বললে, "ঘা-কতক দিয়ে ছেড়ে দিন।"

—"তাতে ওর কি হবে? মার ওদের গা-সওয়া।"

—"আমাদের হাতের সুখ হবে আর মনের ঝাল মিটবে।"

—"কি বলেন মশায়?" বলে বাবুটি মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে পানের দাগে কালো বড়-বড় দাঁতগুলো বার করে গলায় হাসির মতো একটু শব্দ করলেন।

মন্মথ বললে, "মেরেই বা কি হবে? দিন ছেড়ে।"

—"আমিও তাই বলি। ক'জনকে আপনি ধরবেন? কত ভদ্রলোক চোর আছে। এই ধরুন না, দেশের চোরা-কারবারিদের কথা। ও আপনার পকেট মেরেছে, তারা ধনে-প্রাণে মেরে ফুলে উঠছে। কি বলেন?"

মন্মথ তাঁর কথার উত্তর দিলে না, সে আফিস থেকে বেরিয়ে এল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি চড়ের শব্দ ও শিশু-কণ্ঠের কান্না শোনা গেল।

তাতে মন্মথর মন দুলে উঠলো। সে থমকে দাঁড়ালো। ফিরে দেখলে, ছেলেটা চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বেরিয়ে আসছে।

মন্মথ মনে-মনে বললে, "ঠিক। কত ভদ্রলোক চোর আছে! তাদের ধরছে কে? সমাজে তাদের কত প্রতিষ্ঠা! চুরি করে, লুটে-পুটে নিয়ে তারা সেরা লোক হয়ে সকলের সম্মান কুড়োচ্ছে।"

ছেলেটা তার সামনে আসতেই সে ডাকলে, "এই শোন্।"

সে মনে করলে, তাকে বুঝি আবার মার খেতে হবে। তাই পালাবার জন্যে ছুট দিতেই মন্মথ তাকে খপ্ করে ধরে ফেললে; বললে, "তোর ভয় নেই। আর কেউ কিছু তোকে বলবে না। চুপ করে দাঁড়া।"

ইতিমধ্যে গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি জন-দুই যুবক এসে তাদের পাশে গলা ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন বাঁকা-বাংলায় বললে, "ওকে ছেড়ে দিন না, মশায়!"

মন্মথ তাদের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই ছেলেটাকে বললে, "তোর নাম কি?"

—"ওর নাম দিয়ে আপনার কি কাজ আছে?"



মন্মথ তাকে খপ্ করে ধরে ফেললে।

—"বাপু, তোমাদের কে ডেকেছে ?"

—"কে ডাকবে ? ও হচ্ছে আমাদের পাড়ার ছেলে।"

—"তোমরা কোন্ পাড়ায় থাক ?"

তারা মন্মথকে লক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বিদ্রূপ করলে এবং একটি গালাগালও দিলে। তারপর শিস্ দিতে-দিতে বাজারের ভেতর চলে গেল।

মন্মথ আবার বললে, "তোর নাম কি ?"

—"নিশা।"

—"কোথায় থাকিস্ ?"

—"ঐ দিকে।" বলে সে বাজারের দিকটা দেখিয়ে দিলে।

—"এই বাজারে ?"

—"না।"

—"তবে ?"

—"ঐ দিকে।"

আবার একটি ভিড় জমে উঠছিল দেখে মন্মথ নিশাকে টেনে নিয়ে রাস্তায় গেল। যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করলে, "তোর বাবা আছে ?"

—"না।"

—"মা ?"

—"না।"

—"ভাই-বোন ?"

—"নেই।"

—"থাকিস্ কার কাছে ?"

—"বুড়ী-মার কাছে।"

—"বুড়ী-মা ? সে কে ? আচ্ছা, চল্ তোদের বাড়ি যাবো। তোর কোন ভয় নেই।"

নিশা মন্মথকে নিয়ে বাজারের শেষ দিকে যেখান থেকে বস্তি আরম্ভ হয়েছে, সেখানে গিয়ে কতকগুলো ভাঙা কাঠের বাক্স পাশে দাঁড়ালো।

● নিশা ও মুনি
[illegible] মিত্র

মন্মথ দেখলো স্তূপাকার বাক্সর পিছনে একটা জায়গায় দুটো বড় বাক্সকে কুঠরির মতো করে তার মধ্যে পাতা রয়েছে চট্। সেই চটের ওপর উবু হয়ে বসে একটা বুড়ী টিনের কৌটোয় করে চা খাচ্ছে। তার সামনে বসে আছে একটা মেয়ে।



একটা বুড়ী···সামনে বসে আছে একটা মেয়ে।

মেয়েটাকে দেখেই মন্মথ চমকে উঠলো। ঐ তো নিশার সঙ্গিনী? মেয়েটা রোগা, কালো। তার মুখখানা লম্বা, চোখ দুটো মাঝারি, নাকটা একটু ভোঁতা, কিন্তু ঠোঁট দুখানি সুন্দর। খালি গা, পরনে কালো ময়লা একটু ন্যাকড়া। সে পা ছড়িয়ে বসে একটা কাগজের ঠোঙা থেকে মুড়ি-বেগুনি খাচ্ছে। আর তার সামনে একটা রাস্তার কুকুর দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে লেজ নাড়ছে।

জায়গাটা থেকে বিশ্রী একটা গন্ধ এসে মন্মথর নাকে লাগলো। অন্য সময় হলে সে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সরে আসতো। কিন্তু আজ সরে আসা তো দূরের কথা, সেদিকেই সে এগিয়ে চললো।

● নিশা ও তুমি
[illegible] মিত্র

মন্মথর আগে চললো নিশা। তাদের পায়ের শব্দে বুড়ী, মেয়েটা আর কুকুরটাও ফিরে তাকালো।

মেয়েটা মন্মথকে দেখেই বাক্সর ভেতরদিকে গিয়ে বুড়ীর পিঠের কাছে সরে বসলো। এবার মন্মথর বুঝতে বাকী রইলো না যে পয়সাগুলো ও-ই নিয়ে এসেছে। আর তাই দিয়ে খাওয়া হচ্ছে চা, মুড়ি ও বেগুনি। কিন্তু মন্মথর আফশোস্ হতে লাগলো, তার পকেটে আরও বেশি কিছু থাকলো না কেন? তার ছ'আনা পয়সা সার্থক হয়েছে।

সে বললে, "নিশা, ঐ তোর বুড়ী-মা?"

—"হাঁ।"

—"আর বাড়ি?"

—"ওই তো!"

—"এখানে কতদিন আছিস্?"

—"জানি না।"

—"চল্, তোর বুড়ী-মার সঙ্গে আলাপ করবো।"

—"ও কানে কম শোনে।"

মন্মথ নিশার সঙ্গে গিয়ে বুড়ীর সামনে দাঁড়াতেই বুড়ী চায়ের টিনটা নামিয়ে রেখে মুখখানা বিকৃত করে হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে বললে, "কাকে খুঁজছো?"

—"তোমার কাছেই এলাম।"

বুড়ী অবাক হয়ে গেল; বললে, "আমার কাছে তোমার মতো লোকের কি দরকার? তুমি কি পুলিশ?"

—"না। এম্নিই এসেছি। তোমার নাতি আমাকে ওর বাড়ি দেখাতে নিয়ে এসেছে।"

—"কেন? এ কি রাজবাড়ি? আচ্ছা, যখন এসেছো তখন ঘর-দুয়োরগুলো দেখে যাও।" বলে বুড়ী শুষ্ক হাসি হাসলে।

মন্মথ বললে, "রাগ করো না। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি না। দেখছি তোমরা বড় কষ্টে আছ। তোমার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই?"

—"না।"

—"এরা বুঝি তোমার নাতি-নাতনী ?"

—"এখন তাই-ই।"

—"আগে কি ছিল ?"

—"কেউ নয়। দু'-বছর আগে আমি থাকতাম ওই বাগানটার গাছতলায়। তখন চলতে-ফিরতে পারতাম। সেই যে আকাল এল, তখন ওই ছেলে-মেয়ে দুটোকে পেয়েছিলাম। ওই ছোঁড়াটার মা তো না খেতে পেয়ে আমার চোখের সামনেই একদিন মরে গেল। আর ওই ছুঁড়িটা কোথা থেকে যে ঘুরতে-ঘুরতে এসেছিল, কিছুই জানে না। কেবল কাঁদছিল। সেই থেকে ওরা আমার কাছেই রয়ে গেছে। ওরাই এখন এদিক-ওদিক থেকে যা পায়, আনে। নিজেরা খায়, আমাকেও খাওয়ায়। ছুঁড়িটার নাম ফুলি। ভিখিরীদের ধর-পাকড়ের সময় আমরা এখানে উঠে এসেছি।"

মন্মথ বললে, "তুমি কি একটুও চলতে-ফিরতে পারো না ?"

—"পারি। ওই কলটাতে যাই চান করতে। তবে আস্তে-আস্তে যেতে হয়।"

মন্মথর আর দাঁড়াতে মন চাইছিল না; বললে, "আমি বিকেলে আবার আস্‌বো। যদি পারি তোমাদের এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাবো। যাবে তো ?"

—"বুড়ীকে বসিয়ে খাওয়াবে এমন লোক কি দুনিয়ায় আছে, মাণিক ?"

মন্মথর মনটা গেল আরও ভিজে। বিকেলের দিকে সে যখন আবার গেল, তখন বেলা পড়ে আস্‌ছে। সে ঠিক করেছিল বুড়ীকে রাখবে তাদের বাগানে। ফুলিকে রাখবে বাড়িতে তার মায়ের কাছে, নিশাকে শিখাবে বাগানের কাজ। কিন্তু গিয়ে দেখলে—বাক্স দুটো শূন্য কোটরের মতো পড়ে আছে—কেউ নেই !

একটা লোক বললে, "বুড়ী কল থেকে আসবার সময় ময়লার গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। তাকে নিয়ে গেছে তুলে। ছেলে-মেয়েটা কোথায় গেছে জানি না।"

মন্মথ অসাড় হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে-আস্তে বাজারের দিকে চললো, যদি তাদের দেখতে পায়। কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পেল না। তারা দুটিতে পথের ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো কোন্ আঁস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে বলবে ?

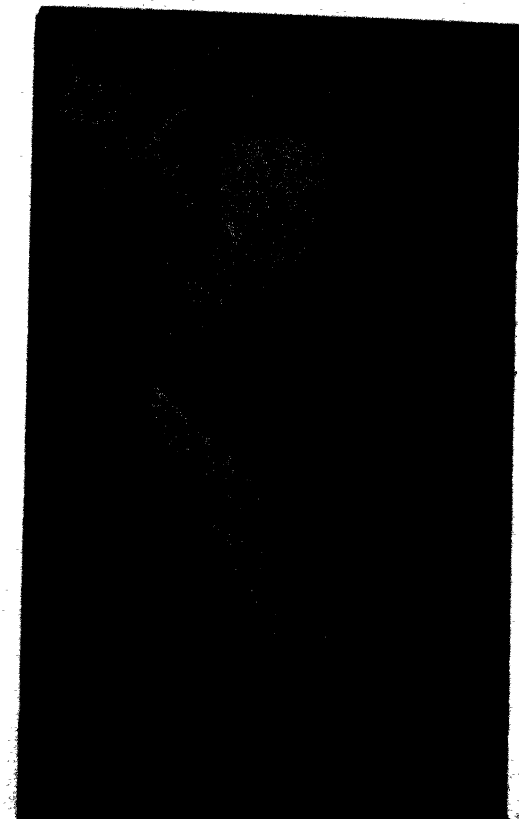
সুদূরের বাণী

জীবনের জয়যাত্রা

যা পচে গিয়েছে, যা মরে গিয়েছে, তাকে সিল্কের কাপড় দিয়ে আদর করে জড়িয়ে রাখলে কি লাভ? তাতে আর নব-জীবন আসবে না। আর যাতে জীবন নেই, যাতে থেমে গিয়েছে জীবনের স্পন্দন,—তা যেমন নিজে চলতে পারে না, অপরকেও চালাতে পারে না। তেমন জিনিস যদি আমাদের অতি প্রিয় জিনিস হয়, যদি আমাদের সব চেয়ে প্রিয় জিনিসই হয়, তবুও তাকে কবর দিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে—জীবন মানে এগিয়ে চল!

● কামাল আতাতুর্ক

আলপনা—



আঁধার-পথ কুঞ্জ-নিভৃতের
পাবার চাপি' আলোকে নেই,
আঁখির হৃদয়ে আছে-নীর
অতিথির আবাস নেই।



বাঘা

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

তোমরা ওদিকে কেউ কখনও গেছ, যেখানে রূপসা, ভৈরব আর পশর নদী এসে মিলেছে ?

সেখানে এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। জল, শুধু জল,—কলকল, ছলছল অবিরাম বয়ে চলেছে। এধারে যতদূর দেখা যায় কেবল ধানের ক্ষেত। বর্ষা-শরতে সবুজ ধানের পাতা ঢেউ খেলে চলেছে। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তোমার মনে হবে, সেটাও যেন একটা দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র, মেঘের কোলে গিয়ে মিশেছে! শীতে ধূ-ধূ করে শূন্য মাঠ।

মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট গ্রাম তারই মধ্যে যেন দ্বীপের মতো ভাসছে।

ওপারে কি আছে কে বলবে ? খাদা চোখে কিছুই দেখা যায় না। খুব সূক্ষ্ম ফিকে বনরেখার মতো কি যেন একটা দেখা যায়, কিংবা হয়তো যায় না,—চোখের ভুল হয়তো !

জন-মানবের দেখা এদিকে তুমি বেশি পাবে না। চাষের সময় কিছু কিছু চাষীকে দেখতে পাবে। সেই সময় দু-চারজন রাখাল-বালককেও দেখতে পাবে গাছের ছায়ায় বাঁশী বাজাতে। কিন্তু সে সব-সময় নয়।

বেশির ভাগ সময়েই দেখবে, একদিকে জনহীন দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, আর একদিকে অসীম জলরাশি কুটিল তরঙ্গ-ভঙ্গে খলখল হাসছে।

আর দেখবে, দু-একটি পাল-তোলা নৌকো নিঃশব্দে ভেসে চলেছে। তালে তালে দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে—ছপাৎ ছপ্।

নির্জনতা তোমরা অনেক রকম দেখেছ।

ক'লকাতা শহর রাত্রি একটার পর নির্জন হয়ে যায়। অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে শহরের আর সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সে হ'ল ক্লান্ত নির্জনতা। যেন সারা শহর সমস্ত দিন কুলির মতো খেটে ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে!

হাজারিবাগে ক্যানারি পাহাড়ের নিচে যদি শেষ অপরাহ্নে এসে বোসো, সেখানে নির্জনতার আর এক রূপ দেখবে। মনে হবে, সেই বিরাট পাহাড়ের পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবী যেন প্রশান্ত নীরবতায় তপস্যা করছে। তোমারও মন শান্ত হয়ে আসবে।

কিন্তু এ নির্জনতা অন্য রকমের।

একে ভয়ঙ্কর বলতে পারো। চারিদিকে চাইলে একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে মন ছম-ছম করতে থাকে। দেখছ না, নৌকোগুলো কেমন ভয়ে ভয়ে চলেছে। যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে অদৃশ্য কোন ভয়ঙ্করকে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছে!

আসলে এই জায়গাটা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

কয়েক বৎসর আগে এখানে একটা ভীষণ ঘটনা ঘটেছিল। সেই গল্পই তোমাদের শোনাবো।

আমাদের পাড়ায় রমেশবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন দীর্ঘকাল।

তাঁর ছেলে-পুলে ছিল না। শুধু স্বামী আর স্ত্রী আর একটি কুকুর। গবর্ণমেন্ট আফিসে ভাল মাইনেয় তিনি চাকুরী করতেন। পেন্‌সন্ নেবার পরেও কিছুদিন তিনি এইখানেই ছিলেন।

কিন্তু বয়স হ'লে ক'লকাতায় কোলাহল ভালো লাগে না। রমেশবাবু স্থির করলেন, জীবনের শেষ কয়টা দিন তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতেই কাটাবেন।

● বাঘা
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

চাকুরীকালেও গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর একেবারে ছিঁড়ে যায়নি। দুর্গম দেশ হ'লেও সময় পেলে মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন,—দু'চার বৎসর অন্তর।

যতদিন রক্তের জোর থাকে, কর্মব্যস্ত ক'লকাতা বেশ লাগে। রক্তের জোর কমে এলে মন যখন শান্ত হয়ে আসে, তখন মনে পড়ে, ছেলেবেলার লীলাভূমি পল্লী জননীকে, ছায়ায় ঘেরা, পাখি-ডাকা গ্রামকে।

রমেশবাবুর গ্রাম ওইদিকে, ওই রূপসা, ভৈরব আর পশরের সঙ্গমস্থান পেরিয়ে।

একদিন তিনি সস্ত্রীক রওনা হলেন সেই দেশের দিকে, ক'লকাতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে। আসবাব-পত্রের অধিকাংশই বিক্রি ক'রে দিলেন। গ্রামে কি হবে শহরে আসবাব-পত্রে—টেবিল-চেয়ার-খাটে? তা ছাড়া সেই দুর্গম দেশে ওগুলো নিয়ে যাওয়ার ঝামেলাও কম নয়! বুড়ো বয়সে সে-ঝামেলা পোষায় না।

সঙ্গে রইলো একটি ট্রাঙ্কে কিছু কাপড়-চোপড়; একটি কাঠের বাক্সে কিছু বাসন-পত্র আর একটি ক্যাশবাক্সে গহনা ও টাকাকড়ি।

আর বাঘা কুকুর।

তাঁদের বয়সের আর পথের দুর্গমতার তুলনায় এ মালও কম নয়। কিন্তু এগুলো নিতান্ত না নিয়ে গেলেই নয়। সেখানেও তো একটা সংসার পাততে হবে!

ক'লকাতা থেকে ওঁরা ট্রেনে গেলেন খুলনা।

তখন ভোর হচ্ছে।

সমস্ত দিন খুলনায় থেকে ওঁরা রাত্রি দশটার সময় একখানি পান্সী ভাড়া ক'রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রওনা হলেন।

গ্রীষ্মকালের রাত্রি। নদীতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। কেবিনের ভিতরে ওঁরা বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন।

বাইরে সজাগ প্রহরী রইল বাঘা।

আর মাঝি-মাল্লা।

রাত তখন বোধ হয় দুটো হবে।

● বাঘা
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

হঠাৎ স্ত্রীর অতি-সতর্ক ঠেলায় রমেশবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

কামরার মধ্যে মিটমিট ক'রে আলো জ্বলছিলো। সেই আলোয় চোখ মেলতেই রমেশবাবুর চোখে পড়লো, স্ত্রীর হাতে ছোট একটা চিরকুট !



কী সর্বনাশ !

নিদ্রাজড়িত চোখে রমেশবাবু পড়লেন :

"নৌকোর খোলে লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সাবধান !"

মুহূর্তে রমেশবাবুর চোখের ঘুম ছুটে গেল !

কী সর্বনাশ !

রমেশবাবু কান পেতে শুনলেন। সত্যাই তো ! নিচে, খোলের মধ্যে লোকের

যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে নড়া-চড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকটা ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত। সুতরাং এরা যে ডাকাত, তাতে আর রমেশবাবুর সন্দেহ রইলো না; এবং যখন ওরা অমন আরামে রয়েছে, তখন মাঝিরাও নিশ্চয় এর মধ্যে আছে।

কিন্তু এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কি ক'রে?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল, বুক দুরদুর করতে লাগলো।

কারও মুখে সাড়া নেই।

কিছুক্ষণ পরে রমেশবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বাইরে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলেন, নদীর জলে, গাছের ঘন-সন্নিবিষ্ট পাতায়, আবছা লোকালয়ে তখনও ঘুমের ঘোর ছাড়েনি। কুয়াশার মতো পাংলা অন্ধকারে সবই যেন ঝিমুচ্ছে!

এদিকটায় নদীর ধারে ধারেই লোকালয়। নদীও খুব বড় নয়। সেইজন্যেই ডাকাতেরা বোধ হয় তেমোহনায় নৌকো পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করছে।

সেখানটায় লোক নেই, জন নেই,—চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও লোকের সাড়া পাওয়া যাবে না। খুন এবং ডাকাতির পক্ষে সেইটেই প্রশস্ত স্থান।

এ অঞ্চল রমেশবাবুর পরিচিত। চারিদিক ভালো ক'রে চেয়ে-চেয়ে দেখলেন, বুঝলেন, সেখানটায় পৌছুতে আর দেরী নেই। এবং তারপরে তাঁদের অদৃষ্টে কি ঘটতে পারে ভেবে তাঁর হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার মতো হোল।

এইখানটায় যদি কোন রকমে নামা যায়!

কাছে গ্রাম আছে রাঙামাটি। সেখানে রমেশবাবুর চেনা লোক কেউ নেই। কিন্তু মাইল চার-পাঁচ দূরে থানা। সেখানে খবর দেওয়া যায়।

কিন্তু কারও সন্দেহ উদ্রেক না ক'রে এখানে নামবার উপায় কি?

রমেশবাবু সেই ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়াতেও ঘেমে উঠলেন! গলা শুকিয়ে উঠলো।

তাঁর স্ত্রী কাঠের মতো শক্ত হয়ে নিঃশব্দে শুয়ে।

রমেশবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

গলায় তাঁর স্বর আসছিলো না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে বললেন, একটা সিগারেট খাবে নাকি মাঝি?

ভোরের হাওয়ায় মাঝিরও কেমন ঝিমুনি আসছিল।

বললে, ছ্যান্।

সিগারেট সেবার জন্যে রমেশবাবু কেবিনের বাইরে এলেন। বললেন, রাঙামাটি গ্রামটা কাছাকাছিই হবে বোধ হয়—না মাঝি ?

মাঝি যেন চমকে উঠলো।

বললে, আপনি কি এদিককার গ্রাম চেনেন না কি বাবু ?

—কিছু কিছু চিনি। রাঙামাটির ঘাটে তোমাকে একবার নৌকো লাগাতে হবে মাঝি। এখানে একজনের কাছে কিছু টাকা পাব। আগেই চিঠি লিখে দিয়েছি। হয়তো ঘাটে এসে সে বসে থাকবে। এই সুযোগে টাকাটা নিয়ে আসতে হবে। আবার কবে এদিকে আসব ঠিক তো নেই !

—দিনের বেলা এখানেই থাকবেন নাকি বাবু ?

—ক্ষেপেছ ! আমার কি থাকবার উপায় আছে ? ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে যতটা যাওয়া যায়। বরং তেমোহনীর ঘাটে গিয়ে রান্না-বাড়া ক'রে আবার বিকেল বেলায় বেরুনো যাবে। কি বল ?

মাঝি বললে, সেই ভালো বাবু। নইলে আবার জোয়ার আসবে।

মাঝি বোধ করি ভাবলে, বাবু যদি আরও টাকা আনেন, মন্দ কি ? লুঠের ভাগ বাড়বে।

মাঝি লোভে লোভে নৌকো ঘাটে লাগালো।

রাঙামাটিতে সবে তখন লোকজন একটি-দুটি ক'রে উঠতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তাদের কিছু জানাতে রমেশবাবুর সাহস হ'ল না। কে জানে, তারাই বা লোক কেমন ?

এদিকের লোকের বিশেষ খ্যাতি নেই।

তিনি ছুটলেন থানার দিকে।

● থানা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

চার-পাঁচ মাইল নিতান্ত কম রাস্তা নয়। এতখানি পথ গিয়ে দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে যখন রমেশবাবু নদীর ঘাটে ফিরলেন, তখন দশটা বেজে গেছে।

তাঁরা সদলবলে ঘাটে এসে দেখলেন, ঘাট শূন্য। সেখানে নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই।

রমেশবাবু হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

সর্বনাশ হয়ে গেল!

তাঁর আসতে দেরী দেখে মাঝিরা বোধ হয় সন্দেহ ক'রে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে! নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বাঁচানো গেল না।

দারোগা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিক পরে দেখা গেল, বাঘা তীরবেগে এই দিকে ছুটে আসছে। বাঘা ছুটে এসে রমেশবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

রমেশবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, বাঘা, তুই কোথা থেকে?

বাঘার মুখের দুই কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। তার সর্বাঙ্গ জলে ভিজে। বাঘা একবার প্রভুর গা শুঁকেই, যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে আবার ছুটলো।

একবার ছোটে আর পিছনে চেয়ে কাউকে আসতে না দেখে ফিরে আসে। আবার ছোটে।

দারোগার সন্দেহ হ'ল।

তিনি সঙ্গের একজন সিপাহীকে বললেন, তুমি এঁকে নিয়ে এইখানে অপেক্ষা কর। আমি দেখি, কুকুর কি বলে।

ব'লে তিনি কয়েকজন সিপাহী সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে কুকুরের পিছন-পিছন চলতে লাগলেন।

অনেক দূর গিয়ে তেমোহনার কাছে এসে পৌঁছুলেন। সেখানটায় একটা চর জেগেছে।

বাঘা কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বিদ্যুদ্‌বেগে জলে দিলে ঝাঁপ। সাঁতরে উঠলো সেই চরে এবং নখ দিয়ে একটা জায়গা আঁচড়াতে লাগলো।

দারোগার কৌতূহল হ'ল।

● বাঘা
নীরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

কিন্তু তিনি চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, নৌকো দূরে থাক্, কোথাও একটা ডিঙ্গির চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

তিনি সঙ্গের একজন কনেস্টবলকে পোষাক খুলে চরে যেতে হুকুম দিলেন। চরে পৌঁছে সেই জায়গাটা খানিকটা খুঁড়তেই লাল পাড় শাড়ীর খানিকটা দেখা গেল।

লোকটা চীৎকার ক'রে উঠলো, লাস!

—মেয়েছেলের?

—হ্যাঁ, হুজুর!

বাঘা আবার সাঁতরে এপারে এল এবং দক্ষিণ দিকে ছুটতে আরম্ভ করলো। কোমরের রিভলভারটায় একবার হাত দিয়ে দেখে নিয়ে, দারোগাও তার পিছু-পিছু তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে একটা বাঁকের আড়ালে নৌকো সমেত সেই ডাকাতদলকে পাওয়া গেল। তারা বাক্স খুলে লুঠের মাল ভাগ করছিলো। বাঘা বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে একজনের ঘাড় কামড়ে ধরলো।

দারোগা বহু কষ্টে সেই লোকটিকে বাঘার হাত থেকে ছাড়ালেন। পরে জানা গেল, সেই লোকটিই রমেশবাবুর স্ত্রীকে খুন করেছিল। তাই তার উপর বাঘার অত রাগ!

দারোগা রিভলভার দেখিয়ে তখন সেই লোকগুলিকে বেঁধে ফেললেন। ইতিমধ্যে কনেষ্টবলরাও এসে গেল। তখন সকলকে সেই নৌকোয় চড়িয়ে তারা থানায় ফিরে এলো।

শুনে আশ্চর্য হবে, বিচারের সময় বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে সেই লোকগুলিকে দাঁড় করিয়ে বাঘাকে যখন আসামী সনাক্ত করতে বলা হ'ল, বাঘা আসল লোকগুলিকে জজের সামনে ঠিক সনাক্ত ক'রে দিলে,—একবার নয়, তিনবার!

বিচারে সব ক'জনের শাস্তি হয়ে গেল।



ঝড়ের রাত

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আকাশে আকাশে ঘন মেঘ জমে, 'গুরু গুরু' ডাকে বাজ,
বাতাসে বাতাসে প্রলয় ঘনায়, ভারি দুর্য্যোগ আজ।
রাত্রি গভীর, চারিধারে ছাওয়া ঘন-ঘোর আঁধিয়ার,
নীরব নিঝুম সারা গ্রামখানি, পথে কেহ নাহি আর।
কিছুকাল আগে শিবাদল ডেকে এখন করেছে চুপ্,
মুষল-ধারায় বৃষ্টি কেবল ঝরিতেছে ঝুপ্‌ঝুপ্।
এই দুর্য্যোগে গহন-নিশীথে পথ দিয়ে ও কে যায়?
'কেলো' ওর নাম, বাগ্‌দীর ছেলে, তোমরা চেনো না তায়।
কিবা হবে চিনে, গেঁয়ো ছোট লোক, নাহি কোনো পরিচয়,
তবু তারি কথা বলিতে বসিয়া চোখে মোর ধারা বয়।
বিধবা মায়ের দুইটি তনয়, এই নিয়ে সংসার,
কেলোর বয়স বারো বৎসর, ভিখুর বয়স চার।
দুখিনী বিধবা ছেলে দুটি নিয়ে কষ্টে করিত বাস,
কিছুদিন আগে রোগে ভুগে সেও ফেলে শেষ নিঃশ্বাস।

মায়েরে হারায়ে সেই হতে কেলো ভিখুর নিয়েছে ভার,
ছোট শিশু ভিখু দাদারে ভিন্ন কারেও না জানে আর।
কেলো ভালোবাসে ভিখুরে বড়ই, আদরের ছোট ভাই,
মায়ের অভাব ঘুচাতে যে তার চেষ্টার ত্রুটি নাই।



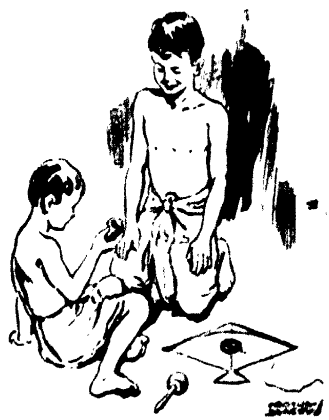
ভাঙা-কুঁড়েটায় কোনোরূপে হায়
মাথা গুঁজে তারা রয়,
সারা দুনিয়ার মাঝখানে ছিল
ঐটুকু আশ্রয়।
এখানে-সেখানে মজুর খেটে সে
পয়সা যা-কিছু পায়,
তাই দিয়ে অতি কষ্টে-সৃষ্টে
দিনগুলি কেটে যায়।
কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় ফেরে,
কভু হ'য়ে যায় রাত,
দুই ভাই মিলে কভু ছাতু খায়,
কভু জুটে যায় ভাত।

কত দিন কেলো রাত করে ফিরে দেখে তার ছোট ভাই,
কেঁদে-কেঁদে যেন ঘুমায়ে পড়েছে, খাওয়া কিছু হয় নাই।
ভিখুরে জাগায়ে আদরে সোহাগে গালে দিয়ে তার চুমু,
খাবার খাওয়ায়ে আবার তাহারে দিয়েছে পাড়ায়ে ঘুম।
মায়ের জন্ত ভিখু যদি কাঁদে, হু-হু করে তার প্রাণ,
নিজের দুঃখ অন্তরে চেপে করে সান্ত্বনা দান।

● ঝড়ের রাত
[illegible]

সেও তো বালক, ছোট শিশু সেও, তবু দায়িত্ব ঢের,
কেলোর বুকের দুখের আগুন কেহ নাহি পায় টের।
হাট হতে যবে ঘরে ফেরে কেলো, পয়সা জুটিলে তার,
ভিখুর জন্যে নিয়ে আসে কিনে খেলেনা চটক্‌দার।
লাটিম্, লাটাই, ঘুড়ি, রাঙা-লাঠি, যখনি সুবিধা হোক,
মেলা হতে আনে ভাইটির তরে ঘুচাতে তাহার শোক।

সেই ভিখু, সেই প্রাণের ভাইটি
কয়দিন হতে হায়,
অসুখে পড়েছে, বেহুঁস রয়েছে,
নাহি কিছু খায়-দায়।
গাঁয়ের লোকেরা গ্রাহ্য করে না,
নাহি লয় বড় খোঁজ,
ভিখুর অসুখ মনে হয় যেন
বেড়ে যায় রোজ রোজ!
"দাদা" বলে আর ডাকে না ভাইটি
কথা নাহি কিছু কয়,
দেখে শুনে তার শোচনীয় দশা
কেলোর জেগেছে ভয়।



গাঁয়ে নাহি কোনো ভালো ডাক্তার, নাহি কোনো কবিরাজ,
মনে ভাবে কেলো ওষুধের তরে শহরে যাবে সে আজ।
শহরে রয়েছে ডাক্তারখানা, আছে বড় ডাক্তার,
ভিখুর জন্যে ব্যবস্থা কিছু করিবেই এইবার।

চিকিৎসকেরে বুঝায়ে বলিবে, ধরিবে তাহার পায়,
ওষুধ আনিয়া ভিখুরে খাওয়াবে, ভালো হয়ে যাবে তায়।
যদি কিছু দাম লাগে ওষুধের, মনে ঠিক করে লয়,
সম্বল আছে কাঁসার থালাটি, করিবে সে বিক্রয়।



সব ঠিক করে একদিন ভোরে
হাতে লয়ে থালাখানা,
বহুদূর সেই শহরের দিকে
করিল সে প্রস্থান।
শহরে আসিতে দুপুর ঘনালো,
সব শুনে ডাক্তার—
আন্দাজে তারে ঔষধ দিল
'কুইনান্ মিক্শ্চার।'
গ্রামের ব্যাধি তো ম্যালেরিয়া—তাই
করে ঠিক অনুমান,
রোগী না দেখেই কেলোর কথায়
ঔষধ করে দান।

দুঃস্থ কেলোর অবস্থা বুঝে ডাক্তার সদাশয়,
শিশি ভরে তারে দিল ঔষধ, দাম কিছু নাহি লয়।
থালা বেচে কেলো দুই টাকা পেলো, খরচ হোলো না আর,
টাকা দুটো তার ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে বাড়ী চলে এইবার।

আধখানা পথ পাড়ি দিল যেই হঠাৎ উঠিল ঝড়,
আকাশে আকাশে গরজি' উঠিল মেঘ সে ভয়ঙ্কর।

ওষুধ বগলে তাড়াতাড়ি চলে, মাঝে এক নদী রয়,—
সন্ধ্যার আগে এই নদী পার হতে হবে নিশ্চয়।
দুর্যোগ ক্রমে বেড়ে বেড়ে ওঠে, তেড়ে তেড়ে ছোটে বায়,
নামিল বাদল, ঝম্ ঝম্ জল সুরু হয়ে গেল হায়।
পথ-ঘাট সব হোলো একাকার, নির্জ্জন চারিধার,
ঘন-দুর্যোগে নদীতে আসিতে সন্ধ্যা হইল পার।

ছোট সেই নদী জলে ভরে গেছে
এসেছে ভীষণ বান,
উপায়-বিহীন কেলো নদী-স্রোতে
করিল লম্ফদান।
কোনো রূপে নদী সাঁতারি' সাঁতারি',
অবশেষে পেল কূল,
ওষুধের শিশি যতনে আনিতে
হয় নাই তার ভুল।
পার হয়ে নদী চলে নিরবধি,—
তখন গভীর রাত,—
হঠাৎ কে যেন পিছন হইতে
চাপিয়া ধরিল হাত!



বিজলী-আলোকে কেলো দেখে চেয়ে—গাঁয়ের চৌকিদার,
বজ্র-মুঠিতে চাপিয়া ধরেছে দুর্ব্বল হাত তার।
বলে সে কেলোরে, "ধরেছি এবার,—ওরে বজ্জাত চোর,—
আঁধারে গা-ঢেকে চলেছিস্ কোথা? মতলব কিবা তোর?

● ঝড়ের রাত
শ্রীসুনির্মল বসু

কাল রাতে গাঁয়ে হয়ে গেছে চুরি জমিদার-বাড়ীতেই,
তোরই এই কাজ, ওরে ছুঁচো-পাজি, সন্দেহ কোনো নেই।
না হলে এ-রাতে, এই ঝড়-জলে মানুষ তো কোন্ ছার,—
আশ্রয় ছেড়ে পথে-ঘাটে বার হয় না'ক জানোয়ার।"
চৌকিদারের কথা শুনে ভয়ে কাঁপিল কেলোর প্রাণ,
"ছেড়ে দাও, আমি চোর নই—" কেলো উত্তর করে দান।



কেলোর কাঁদন, সব আবেদন
হয়ে গেল নিষ্ফল,—
চৌকিদার সে গরজি' কহিল,
"সঙ্গে কি আছে বল্?"
থালা বিক্রীর দুটি টাকা শুধু
ট্যাঁকে গোঁজা ছিল তার,
তাই গুঁজে দিয়ে তার হাতে কেলো
পেয়ে গেল উদ্ধার।
বাড়ীতে ফিরিতে দেরী হয়ে গেল,—
কি করিছে ভিখু ভাই?
তাড়াতাড়ি বাকী পথটুকু যেতে
বারে বারে ভাবে তাই।

এই দুর্যোগে ভিখুর মনেতে কতই জাগিছে ভয়,—
ঐ তো অদূরে গ্রাম দেখা যায়, আর বেশী দূরে নয়।
বাড়ী এলো কেলো, হায় হায় হায়, একি হোলো আজ হাল্—
ঝড়ের দাপটে জীর্ণ ঘরের উড়ে চলে গেছে চাল্।

● ঝড়ের রাত
নির্মল বসু

খুঁটি নড়ে গেছে, মাটি ঝরে গেছে, পড়ে গেছে তার ঘর,—
ভয়াবহ এই দৃশ্যে কেলোর কেঁপে ওঠে অন্তর!
"ভিখু—ভিখু, ওরে ভাইটি আমার,—কেমন আছিস্ বল্?"
পাগলের মত ভাঙা ঘরে ঢোকে, চোখে ঝরে যায় জল।
"এই যে এনেছি ওষুধ এবারে, আর তোর ভয় নাই,—
দেরী হয়ে গেল, ক্ষমা কর্ মোরে, কথা বল্ ভিখু ভাই।"
কে বলিবে কথা? কেলো দেখে চেয়ে দেওয়ালের কোণটায়,
ভিখুর স্তব্ধ দেহ পড়ে আছে জলে-ভেজা বিছানায়!
দেহে প্রাণ নাই, অসাড় সে দেহ, বুকে নাই স্পন্দন,
জড়ায়ে ধরিয়া ভাইটির দেহ কেলো করে ক্রন্দন।
রজনীর শেষে ঝড় থেমে গেছে,—বৃষ্টি ঝরিয়া যায়,—
ভাইটিরে বুকে চেপে কেলো কাঁদে—"ফিরে আয়, ফিরে আয়!"

আঁধারে আলো

● আমি একজন ভদ্রলোককে জানি, জীবনের প্রথম যুগে, যাঁর দুখানি পা-ই নষ্ট হয়ে যায়। ভদ্রলোক একদিনের জন্যও তার জন্যে দুঃখ করেন নি, বা ভগবানকে অভিশাপ দেন নি। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভগবানকে ডেকে বলতেন, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমার হাত দুখানি বজায় রেখেছ। সেই হাত দিয়ে তিনি পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি ডাক্তারী বই লিখে রেখে গিয়েছেন। সেই বই চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁর নামকে অমর করে রেখে দিয়েছে।

—বার্ট্রাণ্ড রাসেল



দৈত্য ও রাজকন্যা

—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার ছিল একটি পরমাসুন্দরী কন্যা। রাজকন্যা যখন তিনমাস বয়সের, তখন মহারাণী একদিন সমুদ্রস্নান করতে করতে ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। মহারাজ অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, রাণীমাকে আর পাওয়া গেল না।

মা-হারা রাজকুমারীকে বুকে তুলে নিয়ে সমুদ্রকে অভিসম্পাত দিতে দিতে মহারাজ রাজপুরীতে ফিরে এলেন। সেই থেকে তিনিই হলেন তার বাপ এবং মা দুইই।

রাজকন্যা হল মহারাজের চক্ষের মণি, গলার হার। এক দণ্ডও তাকে কোলছাড়া করতেন না, শুধু রাজসভায় বসে রাজকার্য্যের সময়টুকু ছাড়া।

বাপের অত্যন্ত আদরে আদরে রাজকন্যা হয়ে উঠল অসম্ভব জেদী শিশু। কিন্তু কার সাধ্য সে কথা মুখে উচ্চারণ করে?

রাজকন্যা যা' চায় তা' যতই অসম্ভব হোক্ না, রাজামশাই যেমন করে হোক্ এনে দেন। একদিন মহারাজ রাজসভায় বসে রাজকার্য্য করছেন, রাজকুমারী রাজ-প্রাসাদের মধ্যে উদ্যানে বুড়ো দাসীর কোলে বসে রূপকথা শুনছে। রূপকথায় বুড়ো

দাসী বর্ণনা করছিল এক দৈত্যের কাহিনী। কাহিনী শুনতে শুনতে পাঁচ বছরের রাজকুমারী হঠাৎ বলে উঠলো—আমি দৈত্যকে একবার দেখবো।

বুড়ো দাসী তো রাজকন্যার কথা শুনে প্রমাদ গণলে! তাকে যত ভোলায়—ওমা—দৈত্য দেখবে কি রাজকুমারি! সে যে ভয়ঙ্কর দেখতে—পাহাড়ের মতো উঁচু—মেঘের মতো কালো—তাদের চোখ হয় জ্বলন্ত আগুনের ভাঁটা—কাণ হয় মানকচুর পাতার চেয়েও মস্তো মস্তো—আর দাঁতগুলো তাদের—

রাজকুমারী রেগে কেঁদে অনর্থ বাধিয়ে বলে, না—না—না—আমি দেখবই—দেখবই। রাজকুমারীকে ভোলাতে পারে না রাজপুরীর একশো আট দাসী। তারা কত খেলনা দিয়ে—খাবার দিয়ে—অন্য নানা গল্প বলে রাজকন্যার দৈত্য দেখবার বায়না ভোলাবার চেষ্টা করে—কিন্তু তাতে রাজকন্যার জেদ যায় আরও বেড়ে।

রাজার কাণে খবর গেল। রাজকার্য্য ফেলে রাজামশাই সভা থেকে উঠে এলেন ছুটে অন্তঃপুরে কন্যার কাছে। দেখেন, উদ্যানের ধূলায় রাজকন্যা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে—স্নান করেনি, খায়নি—রাজপুরী শুদ্ধ সকলে কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না।

রাজা তাড়াতাড়ি এসে মেয়েকে বুকে তুলে নিলেন—কী হয়েছে মা? কেন তুমি এমন করে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছ? কী চাই তোমার, বলো—এখ্খুনি তার বন্দোবস্ত করছি।

—বাবা, আমি দৈত্য দেখবো। সেই সোনা-পাহাড়ের কালো মেঘের মত যে দৈত্য, তাকে আমি দেখতে চাই।

—দৈত্য দেখবে? ওঃ, এ—ই কথা! এ আর এমন কি ব্যাপার? এখুনি আমি তোমার জন্যে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য ধরে আনছি মা—তুমি ওঠো—দুধ খাও—সর খাও—ক্ষীর-ছানা একটু মুখে দাও।

রাজকন্যা হাসতে হাসতে ধুলো থেকে উঠে বসল, তারপর বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—বাবা কখন্ দৈত্য নিয়ে আসবে বলো না?

মহারাজ বললেন—দৈত্য এখুনি আনতে পারি মা, কিন্তু সে যদি এসে আমার রাজ্যে কোনও বিপদ ঘটায় বা আমাকেই মেরে ফেলে রাজা হয়ে বসে—তাই ভাবছি।

নির্বোধ রাজকন্যা তার শিশুবুদ্ধি-বশে বললে—না বাবা—আমি দৈত্য দেখবই দেখব—আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।

রাজা বললেন—আচ্ছা মা, তাই হবে।

রাজা ঘোড়ায় চেপে বর্শা হাতে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন পাহাড়তলীর দেশের ওপারে, যেখানে প্রকাণ্ড মরুভূমির পরপারে এক বিরাট খাড়া কালো পাথরের পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

সেই পাহাড়ের চুড়োয় থাকে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য। তাকে বন্দী করে আনা সহজ নয়। শক্তিতে তাকে হারানো যাবে না, বুদ্ধির প্যাঁচে যদি যায়।

রাজা করলেন কি, একটি সুন্দর সোনার হরিণ গড়ালেন স্যাকরাদের দিয়ে। হরিণটি মস্তবড় হরিণ হোলো। তার শিঙের ডালপালাগুলিতে হীরে-মণি-মুক্তা ঝকমক করতে লাগলো। মহারাজ সেই হরিণের পেটটি তৈরি করেছিলেন ফাঁপা। তার মধ্যে তিনি ঢুকলেন নিজে, হাতে নিয়ে একটা মস্তবড় কাছি আর প্রকাণ্ড জাল। এই জাল আর কাছি, সুতো লোহা পিতল তামা দিয়ে তৈরি নয়। মানুষের চুল দিয়ে তৈরি। মহারাজ সন্ধান জানতেন, ঐ দৈত্যকে একমাত্র মানুষের চুল দিয়ে ছাড়া আর কিছু দিয়ে বন্দী করা সম্ভব নয়।

দৈত্য যে অরণ্যে শিকার খুঁজতে আসে, সেই অরণ্যে সোনার হরিণটি চরে বেড়াতে লাগলো। বোকা দৈত্য সোনার হরিণ চরে বেড়াচ্ছে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে হরিণটিকে ধরবামাত্র হরিণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হরিণটি দেখে দৈত্য খুবই খুসি হয়ে উঠল। সুন্দর পুতুল-হরিণটিকে নিজের হাতের তালুতে বসিয়ে নিয়ে দৈত্য তার পাহাড়ের উপরে বাড়ীতে ফিরে গেল। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে হরিণটিকে নিজের শোবার ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রেখে দিলে।

গভীর রাত্রে দৈত্য যখন অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন চুপি চুপি রাজামশাই হরিণের পেট থেকে বেরিয়ে মানুষের চুলের জালখানি দিয়ে দৈত্যকে চাপা দিলেন। তারপরে চুলের কাছি দিয়ে বেশ করে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বাঁধলেন। দৈত্য ঘুম ভেঙে রাগে গর্জ্জাতে লাগলো।

মহারাজ বললেন—দৈত্য, আমার একটিমাত্র আদরের মেয়ে, সে দৈত্য দেখার বায়না ধরেছে, তাকে দেখাবার জন্য আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তার দেখা হলে আমি তোমাকে আবার এখানে এনে ছেড়ে দিয়ে যাবো। আমা হতে তোমার কিছু অনিষ্ট হবে না।


"ও বাবা—আমি দেখবো না—আর দেখবো না দৈত্য !"

মহারাজ দৈত্যকে বন্দী করে যখন নিজের রাজ্যে এসে ঢুকলেন, বন্দী দৈত্যের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে প্রজারা দলে দলে ছুটে পালাতে লাগলো।

রাজকন্যা দৈত্য দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো দুই চক্ষু মুদে, ও বাবা—আমি দেখবো না—আর দেখবো না দৈত্য। শীগ্‌গির ওকে তাড়িয়ে দাও।

রাজা তখন দৈত্যকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তার নিজের রাজ্যে। সেখানে খুব কৌশলে তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন।

● দৈত্য ও রাজকন্যা
শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

দৈত্য কিন্তু ভুলতে পারলে না তার অপমান। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল। সে করলে কি, সাত-বৎসর বাদে এক অমাবস্যার অন্ধকার নিশুতি রাত্রে রাজার রাজ্যে এসে ঘুমন্ত রাজামশাইকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

রাজামশাই প্রথম-প্রথম খুব সাবধানে ছিলেন, তাই দৈত্য কিছু করতে পারেনি। তারপরে সাত-বৎসর কেটে যাওয়ার পর ধারণা হল তাঁর, দৈত্য নিশ্চয়ই ভুলে গেছে তার রাগ। অসাবধানতার সুযোগে দৈত্য এসে ঠিক রাজ্যে হানা দিয়ে প্রজাদের মেরে-ধরে বাড়ীঘর সব চূর্ণ বিচূর্ণ ও রাজ্য ছারখার করে রাজপ্রাসাদ থেকে রাজাকে ধরে নিয়ে গেল।

রাজকন্যা সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখে, রাজপ্রাসাদ ছারখার—রাজ্য শ্মশান—দৈত্য এসে তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে।

দুঃখে, মনস্তাপে রাজকন্যা ভেঙে পড়লো। তারপর চিন্তা করে বুঝতে পারল, তারই অন্যায় জেদের দোষে আজ তার বাবার ও প্রজাবর্গের এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে।

রাজকুমারী মনে-মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করল—যেমন করেই হোক্, তার বাবাকে ও বাবার রাজ্যকে উদ্ধার করবে সে।

রাজকুমারীর ছিল এক জোড়া শুক-সারী পাখী। সোনার পিঞ্জর থেকে শুক-সারী রাজকুমারীকে ডেকে বললে—রাজকন্যা, একা একা কোথাও না গিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে তোমার মাকে ডাকো; তিনি তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় বলে দেবেন।

রাজকুমারী সমুদ্রতীরে গিয়ে অনেক করে সাগর-দেবতার স্তবস্তুতি করতে লাগল আর তার মাকে ডাকতে লাগ্‌ল—মাগো—মা—মা—মা—

সাতদিন সাতরাত্রি এমনি স্তবস্তুতি ডাকাডাকির পর এক শুক্লা চতুর্দ্দশীর গভীর রাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এসেছে, সেই জোয়ারের ঢেউয়ের উপরে এক পরমাসুন্দরী নারীমূর্ত্তির দেখা পেলে রাজকন্যা। তিনি বললেন—বাছা, আমিই তোমার মা। তুমি আমাকে এত ডাকাডাকি করছো কেন?

রাজকন্যা মাকে সমস্ত বিপদের কথা জানালে।

● দৈত্য ও রাজকন্যা
শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

মা বললেন, বাছা, এই ঝিনুকগুলি নাও। এর মধ্যে তুমি তাকালেই তোমার চেহারার অবিকল প্রতিচ্ছবি পড়ে যাবে। তোমার প্রতিচ্ছবি-আঁকা শুক্তিটির খোল্ বন্ধ করে তোমার মাথার রেশমের মত নরম কুচকুচে কালো লম্বা চুল জড়িয়ে সেই শুক্তিটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে। আমি ঢেউদের হুকুম দিয়ে দেব, তারা দেশ-দেশান্তরে পৃথিবীর সর্বত্র তোমার প্রতিচ্ছবি আর চুল পৌঁছে দেবে। পৃথিবীর নানা দেশ-দেশান্তরের রাজপুত্রেরা এই ছবি ও চুল দেখে তোমাকে খুঁজতে বেরুবে। তারা এসে তোমায় বিয়ে করতে চাইলে বলবে, যিনি আমার বাবাকে দৈত্যের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে পারবেন, সেই মহাবীরকে আমি বরমাল্য দেবো। এই ছোট শঙ্খটি নাও, যদি কখনও খুব বিপদে পড়ো, এই শঙ্খের খোলের ভিতরে তোমার চোখের এক ফোঁটা অশ্রু ফেললে এর ভিতরে আবার আমার দেখা পাবে।

রাজকন্যার মা সমুদ্রের ঢেউয়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজকুমারীর চোখের সামনে জেগে রইল শুধু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত উঁচু নীল জলের ঢেউয়ের ছুটোছুটি, আনাগোনা!

রাজকুমারী সমুদ্রতীরে বসে বসে ঝিনুকগুলি খুলে খুলে ভিতরে তাকায় আর ঝিনুকের ঝিকমিকে বুকের মধ্যে রাজকুমারীর অপূর্ব সৌন্দর্য্যময় প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। রাজকুমারী ঝিনুকটি অমনি ডালা বন্ধ করে ফেলে নিজের মাথার কোঁকড়া নরম মস্ত লম্বা এক-এক গাছি সরু চুল জড়িয়ে বেঁধে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঢেউয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে ছুটে এসে কাড়াকাড়ি করে সেটি নিয়ে দূরে-সুদূরে পালিয়ে যায়। এমনি করে রাজকন্যা শত-শত হাজার-হাজার ঝিনুক সমুদ্রের ঢেউদের মারফৎ দেশ-দেশান্তরে পাঠিয়ে দিল।

সারা পৃথিবীর দেশ-বিদেশে সাড়া পড়ে গেল। সমুদ্রের তীরে লোকে কুড়িয়ে পায় সেই চুল-জড়ানো সুন্দর চিত্র-বিচিত্র ঝিনুক। চুলের দৈর্ঘ্য ও রূপ দেখেই লোকে অবাক্ হয়ে যায় প্রথমে। তারপরে ঝিনুকের ডালা খুলে ঝিনুকের বুকের

ভিতর আঁকা দেখে এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী ছোট্ট রাজকুমারীর ছবি। তাই দেখে লোকের চোখের পাতা পড়ে না, বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে থাকে—মুখে কথা সরে না।

সকল দেশেরই নিয়ম, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বা সকলের চেয়ে আশ্চর্য কোনও জিনিষ পাওয়া গেলে তা' রাজসভায় এনে রাজাকে উপহার দেওয়া। দেশে-দেশে রাজা আর রাজকুমারেরা সেই ছবি ও চুল দেখে পাগল হয়ে রাজকন্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজকন্যা এদিকে শূন্য রাজপুরীর প্রাসাদ-চূড়ায় একা বসে বসে কাঁদে আর ভাবে—কবে আসবেন সেই বীরকুমার, যিনি তার বাবাকে আনবেন দৈত্যের কারাগার থেকে উদ্ধার করে!

আজও উদ্ধার হয়নি তার বন্দী পিতার, আজও চোখের জল বন্ধ হয়নি রাজ-কন্যার। এখনও দেশ-দেশান্তরের বীর রাজকুমারেরা কালো ঘোড়া, সাদা ঘোড়া আর লাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে আসছে রাজকন্যার সন্ধানে। এখনও তারা পৌঁছোয়নি এসে।

আঁধারে আলো

- **যারা মূর্খ, যারা কোনকালেই কোন কিছু করবে না, তারাই শুধু বলে, অসম্ভব! এ জগতে মানুষের অসম্ভব বলে কিছু নেই, কিছু থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও অসম্ভব নেই, আছে শুধু, যারা মূর্খ, যারা অলস, তাদের অভিধানে। আমি অন্ততঃ আমার জীবনের অভিধান থেকে, এই একটি শব্দ চিরকালের মত কেটে দিয়েছি।**

—নেপোলিয়ন



প্রহর

—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(যুদ্ধের গল্প)

১৪ নং ফিল্ড্ এ্যাম্বুলেন্স।

ছিলাম সেকেন্দ্রাবাদের আই, এম, এইচে, হঠাৎ একদিন দিল্লী থেকে হুকুম এলো ৫নং মোবাইল সার্জিক্যাল ইউনিটে এ্যানাস্থেটিস্ট্ হয়ে যেতে হবে।

রিয়ার হেড্ কোয়ার্টারে এসে খোঁজ নিয়ে জানলাম ৫নং মোবাইল সার্জিক্যাল ইউনিট তখন নগিডক্ পাসের মুখে ১৪নং ফিল্ড্ এ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে এ্যাটাচড্ হয়ে কাজ করছে।

আর্মীতে ঢুকবার পর এই আমার সর্বপ্রথম ফিল্ড্ সার্ভিস। এর আগে দু'বছর বরাবর পিস্ স্টেশনেই কাটিয়েছি।

যুদ্ধের ভয়ংকর উলঙ্গ ভয়াবহ দৃশ্যটা এর আগে কখনো চোখে পড়েনি। যাহোক কোনমতে এসে ত' ফিল্ড্ এ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছান গেল।

যে সার্জিক্যাল স্পেশ্যালিষ্টের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হবে তার নাম মেজর হাবিবুল্লা খান্।

জাতিতে পাঠান। দীঘল বলিষ্ঠ চেহারা।

টক্‌টকে গায়ের রং।

চোখ দুটো কটা।

লাহোর মেডিকেল কলেজ থেকে এম্, বি, বি-এস্ পাশ করে বিলাত থেকে এফ্, আর, সি, এস্, হয়ে এসেছেন।

অত্যন্ত অমায়িক সাদাসিদে ধরণের লোক।

কাজের তখন অত্যন্ত ভিড়!…

বুথিডংয়ের ডিফাইন এরিয়াতে তখন জাপানীদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে।

প্রত্যহ এ্যাড্ভান্স ড্রেসিং স্টেশন থেকে ১৪।১৫টি পর্যন্ত ক্যাসুয়ালটি আসছে।

কারো হাত উড়ে গেছে, কারো বুকে বুলেটের গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। কারো গ্রেনেড্ ফেটে নাড়ী-ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে। সে এক বীভৎস ব্যাপার! কী রক্ত! দেখলে গা শিউরে উঠে!…

মগিডক্ পাসের মুখেই একটা নালার আশে-পাশে ১৪নং ফিল্ড্ এ্যাম্বুলেন্স তাদের ময়দানী হাসপাতাল খুলেছে।

বর্ষার সময় পাহাড় হতে ঢল নেমে এই সব নালা জলে উবু-চুবু হয়ে উঠে, গ্রীষ্মকালে বেশীর ভাগই হয়ে যায় শুকনো খট্খটে, তবে দু'এক জায়গায় আধ হাঁটু বা গোড়ালী পর্যন্ত জল থাকে!

সেই নালার আশে-পাশে বিস্তর ঘন বুনো হোগলার বন।

সেই ঘন হোগলার বনের ভিতরে ভিতরে সব গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে চারপাশে কঞ্চি ও হোগলার বেড়া তুলে, উপরে ত্রিপল বিছিয়ে তার উপরে আবার হোগলা পাতা দিয়ে সব ছোট-বড় খুপ্রীর মত তোলা হয়েছে। এমন চমৎকার কেমোফ্লাজ করা হয়েছে যে সাত আট হাত দূর থেকেও বুঝবার উপায় নেই সেখানে কী আছে।

মনে হবে কেবলই হোগলার বন। উপর থেকেও নজরে পড়বে না। ঐ সব ছোট ছোট খুপ্রীর মধ্যে কতকগুলি রোগীদের থাকবার জন্য ওয়ার্ড রূপে ব্যবহার করা হয়; কোনটায় ড্রেসিং রুম, কোনটায় মেডিকেল স্টোর, কোনটা অপারেশান রুম, কোনটা এম, আই, রুম। ওরই আশে-পাশে মাটীর মধ্যে সব দু'তিন হাত গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে 'ডাগ আউট্' করা হয়েছে। তার মধ্যে সব অফিসাররা থাকে, আর কতক-গুলোতে থাকে পার্সোনেলরা।

সামনেই দেখা যায় নালাটা পার হলেই ধু-ধু করছে বন-জঙ্গল, তারও ওদিকে ধূসর রংয়ের মায়ু পাহাড়ের শ্রেণী যেন, আকাশের বুকে ঢেউ তুলেছে।

দিনের বেলাটা কোনমতে কেটে যায়, নানা কাজকর্মের ভিতর দিয়ে, দিনের আলো নিভে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হয়ে আসে গম্ভীর ভয়াবহ। মাঝে মাঝে 'টোয়েন্টি ফাইভ্ পাউণ্ডারর্সে'র আকাশ-ফাটান প্রচণ্ড শব্দ…বুম্…ম্…ম্… দূরের মায়ু পর্বতশ্রেণীর পাষাণ-গাত্রে তার প্রতিধ্বনি জাগে গুম্…ম্…ম্…করে। নানা প্রকারের পোকা অদ্ভুত সব কট্‌কট্ শব্দ করে।

দু'একটা রাত-জাগা বুনো পাখীর কুশ্রী শব্দ!…

মাঝে মাঝে হোগলার বন রাতের বাতাসে সর-সর শব্দ জাগায়, যেন মৃতের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মত করুণ!…

আলো জ্বালাবার উপায় নেই, সিগ্রেট খাওয়ার উপায় নেই!…কথা বলবার উপায় নেই!…

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে সুরু হয়ে 'স্ট্যাণ্ড টু' অর্থাৎ রেডি ও এ্যালার্ট হয়ে থাক। রাত্রি সাড়ে আট্‌টায় কোন কোন দিন 'স্ট্যাণ্ড ডাউন' হয়, আবার কোন কোন দিন 'স্ট্যাণ্ড টু' সারা রাত্রিই থাকে!

বেশীর ভাগই রাত্রে বড় একটা কাজকর্ম থাকে না।

আমার পাশের গর্তেই মেজর হাবিবুল্লা থাকেন। মাঝে মাঝে রাত্রে যখন ঘুম আসে না, স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারাবৃত বুকখানাকে ফালি ফালি করে থেকে থেকে কামানের গর্জন শোনা যায়, চুপি চুপি উঠে মেজরের গর্তে গিয়ে ঢুকি।

দু'জনে বসে বসে কত রাত্রি পর্যন্ত গল্প করি ফিস্ ফিস্ করে চাপা গলায়। সেদিন দুপুরের দিকে সিক্ রেজিমেণ্টের একটা আহত সিপাইকে নিয়ে এল। বহুদিন লোকটা ছুটী পায়নি, বাড়ীতে একটিমাত্র ছেলের মরণাপন্ন অসুখ, ছুটীর দরখাস্ত করায় ও, সি, বলেছে এখন ছুটী মিলবে না। বেচারী অবশেষে নিজের রাইফেলের গুলী চালিয়েছে থুত্‌নীর নীচে রাইফেলের চোংটা রেখে। সামনের দিকে নাক, চোখ, মুখ সব উড়ে গেছে, কপালটা উড়ে গিয়ে ঘিলু বের হয়ে পড়েছে।

● কথা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

উঃ, সে কি নিদারুণ দৃশ্য।···হাসপাতালে আনার আগেই লোকটা মারা গেছে।

সে রাত্রে মেজরের গর্তে বসে ঐ লোকটার কথাই হচ্ছিল, কোনমতেই যেন আমি সেই বীভৎস রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত মুখখানা ভুলতে পারছিলাম না।

মেজর হাসতে হাসতে বললেন, 'ক্যাঃ চৌধুরী, তোমরা বাঙ্গালীরা বড় সেন্টিমেন্টাল, বড় নার্ভাস।'

'কিন্তু তাই বলে ওই রকম ভয়ংকর বীভৎস মৃত্যু!···'

'কিন্তু লোকটা বেঁচে গেল!···আর তাকে সংসারের চিন্তা করতে হবে না। মা, বাবা, স্ত্রী পুত্র কন্যার চিন্তা করতে হবে না!' বলতে বলতে সহসা যেন মেজর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি কথা বলতে বলতে মেজর হঠাৎ অমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন।

বুঝতাম লোকটার মনের মধ্যে কোথায় একটা গোপন ব্যথা আছে। সর্বদাই হাসতেন, কখনো তাঁকে গম্ভীর হতে দেখিনি!···কিন্তু কখনো তার নিজের সংসারের কথা কিছু বলতেন না!···

হঠাৎ এক সময় মেজর বললেন, 'চৌধুরী, তোমার কোন ছোট ভাই আছে?'

'আছে, আমার এক দাদা আছেন!···'

'আপনার মেজর?'

'আমার! হাঁ আমারও একটি ছোট ভাই আছে। জান চৌধুরী, সংসারে সেই আমার একমাত্র বন্ধন!'

'আপনার চাইতে কত ছোট তিনি বয়েসে?'

'আমার চাইতে তের বছরের ছোট!···ওয়াজিরিস্থানে আমাদের বাড়ী, আমার বাবা ছিলেন চাষা-ভূষা লোক। সাধারণ গৃহস্থ! আমার এক দূর সম্পর্কীয় কাকার লাহোরে ছিল প্রকাণ্ড চামড়ার ব্যবসা!···আমার ছোট ভাই আনোয়ারের যখন মাত্র দেড় বৎসর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান। আমি চলে গেলাম লাহোরে কাকার কাছে, চাষের কাজ করা আমার মোটেই ভাল লাগত না, কেন যেন বড়

● ক্রমশ

[illegible]

ইচ্ছা হত লেখা পড়া শিখে ডাক্তার হই! লাহোরে এসে স্কুলে ভর্তি হলাম। তারপর নিজের চেষ্টায় বৃত্তি পেয়ে পেয়ে শেষ পর্যন্ত বিলাত ঘুরে আসি! নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে সংসারে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি ফিরাবার অবকাশ পর্যন্ত পাইনি। বিলাত থেকে যখন ফিরে এসে গ্রামে গেলাম আমার ভাইয়ের বয়স তখন একুশ বছর!···দুর্দান্ত, বেপরোয়া, সারা দিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। মা বুড়ো হয়ে গেছেন, দেখবার ক্ষমতা নেই!··· মাকে আর ভাইকে নিয়ে লাহোরে চলে এলাম প্র্যাকটিস্ করবো বলে!··· তিন বছর কী অক্লান্ত চেষ্টা করেছি ভাইকে মানুষ করবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারলাম না!··· সে সর্বদা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আড্ডা দেবে! রাত্রে বাড়ী ফিরবে না। প্রথমটায় কত বুঝাতাম, তারপর একটু-আধটু বকাবকি···কিন্তু সে দুর্বার!···এতটুকু গ্রাহ্য তার নেই! একবার কোথায় চলে গেল, তিন দিন পরে বাড়ী ফিরল। খুব করে গালাগালি দিলাম। বললাম, বের হয়ে যা বাড়ী থেকে! এক পয়সা রোজগার করতে পারিস না, বুড়ো হয়েছিস্, দাদার রোজগারের ভাত খেতে লজ্জা করে না?

আনোয়ার বাড়ী হতে বের হয়ে চলে গেল। সবে খেতে বসেছিল, না খেয়েই উঠে চলে গেল। মা দুঃখ করতে লাগলেন। তাঁকে বললাম, ভাবছো কেন মা, ও যাবে কোথায়, খিদে যখন পাবে তখন আপনিই এসে হাজির হবে! কিন্তু একদিন দুদিন করে সপ্তাহ মাস গড়িয়ে গেল, সে আর বাড়ী ফিরে এল না। মা আনোয়ারের শোকে শয্যা নিলেন। অনুতাপের গ্লানিতে আমি নিরন্তর দগ্ধ হ'তে লাগলাম। কাগজে কাগজে আমি আনোয়ারের খোঁজে বিজ্ঞাপন দিলাম, হুলিয়া দিলাম, কিন্তু তার সংবাদ আর পাওয়া গেল না। একদিন আনোয়ারের নাম করতে করতে সমস্ত অপরাধের বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে মা চোখ বুজলেন!··· কোলের সন্তান বলে মা তাকে বড় ভালবাসতেন। অভাগিনী মা আমার!···'

মেজর হাবিবুল্লার গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল।

রাত্রির বুকখানা সহসা যেন ছিন্ন ভিন্ন করে কোথায় অদূরে একটা বম্ পড়ল ডিঁ বম্···

● কথায়
[illegible]

থর থর করে মাটী কেঁপে উঠল।

'আর তার খোঁজ পান নি ?'

'না!···

আমি কোন মতেই তাকে যেন ভুলতে পারি না চৌধুরী, শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবলই চোখের পরে ভাসে আমার ভাইয়ের সেই ক্ষুধা-ক্লিস্ট মুখখানি!'

পাঠান হাবিবুল্লার চোখে বুঝি জল!···

* * * * *

দিন দুই পরের কথা। এ্যাড্‌ভান্স হেড কোয়ার্টার থেকে সংবাদ এসেছে জাঠ রেজিমেন্টের কতকগুলো ক্যাসুয়ালটী আসছে!···

রাত্রি তখন আটটা!···

গর্তের মধ্যে ঢাকনী দেওয়া আলোর সামনে আমি আর মেজর চুপ করে প্রতীক্ষায় বসে আছি!···

বাইরে নার্সিং অর্ডারলী রামপিয়ারীর গলা শোনা গেল, সাব মরীচ্ আ গিয়া!···

মেজর খান উঠে দাঁড়ালেন!···

দু'জন এ্যাম্বুলেন্স সিপাই ষ্ট্রেচারে করে কম্বল ঢাকা একটা রোগী নিয়ে এসে গর্তের মধ্যে ঢুকল।

আহতকে অপারেশন টেবিলের পরে শোয়ান হলো।

মেজর ইউসল্ লোসনে হাত ধুয়ে গ্লাবস্ পরছেন, আমি ধীরে ধীরে আহতের মুখের উপর থেকে কালো কম্বলটা সরিয়ে দিলাম।···

বুকে এবং পেটে তিন চারটে গুলী লেগেছে।

কণ্ঠনালীটা ভেঙ্গে গেছে। বেড্‌স্!

এ্যাড্‌ভান্স ড্রেসিং ষ্টেশন হতে যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছিল রক্তে সেটা ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। আমি মেজরের দিকে ফিরে বললাম, 'ব্লিডিং বোধ হয় বন্ধ হয়নি মেজর?···'

'একবার পালস্‌টা দেখতো চৌধুরী ?'

● কথা
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

পালস্ দেখলাম বড় ক্ষীণ !···ফিল্ড কার্ডে লেখা আছে, ফ্রেন নড়ি এখনো রিমুভ করা হয় নি !···

ক্লোরোফরম দিতে লাগলাম !···

মেজর এসে ব্যাণ্ডেজ খুলে অপারেশন সুরু করলেন।

কিন্তু পেট কেটে দেখা গেল লিভার, কোলন, স্টমাক্ সব কিছুই ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। আমি এদিকে ঘন ঘন পালস্ পরীক্ষা করছি !··· হঠাৎ যেন মনে হলো পালস্ পাচ্ছি না। বললাম তখুনি মেজরকে !···

মেজর অপারেশন থামিয়ে মুখ তুলে চাইলেন !··· Stop !

হঠাৎ একটা হেচ্‌কী তুলে লোকটা স্থির হয়ে গেল।

মেজর একবার শুধু বললেন, 'স্যরি !···'

তারপরই সব সেলাই করতে লাগলেন !

সেলাই করা হয়ে গেলে, সেই রক্ত মাখা হাতেই কম্বলটা মৃতের মুখের পরে টেনে দিতে গিয়ে সহসা যেন মেজর ভূত দেখবার মত চমকে থেমে গেলেন !···

'কি হলো মেজর !···'

'আলো···আলোটা ভাল করে একবার তুলে ধর ত চৌধুরী !···কে !···কে !···'

আমি তাড়াতাড়ি আলোটা তুলে ধরলাম !···

মেজর থর থর করে কেঁপে উঠলেন,···'কে !···কে !··· দেখ দেখ চৌধুরী, ওর ফিল্ড কার্ডটা দেখ ! কী নাম ওর !···'

তাড়াতাড়ি আমি পাশেই স্ট্রেচারের পরে রক্ষিত ফিল্ড কার্ডটা তুলে নিলাম, সিপাই : আনোয়ার খান···বয়স ২৬।···

মেজর পাগলের মত কার্ডটা আমার হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে আলোতে পড়লেন এবং পরক্ষণেই সেই দুর্ধর্ষ পাঠান মৃতের বুকের পরে লুটিয়ে কেঁদে উঠলেন : ভাইজান ! মেরে ভেইয়া !··· মেরে পিয়ারে !···

উঃ সে কী মর্মন্তুদ দৃশ্য !

● ● ●

● কথা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরের দিন সকাল বেলা নালার ধারে গর্ত খুঁড়ে আনোয়ারের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হলো!···

প্রত্যহ রোজ···খুব ভোরে উঠে মেজর এক মুঠো বুনো ফুল নিয়ে গিয়ে মাটির কবরের পরে ছড়িয়ে দিয়ে কবরের পাশে নিঝুম হয়ে বসে থাকতেন!···

মাঝে মাঝে গভীর রাত্রেও কবরের ধারে গিয়ে বসে থাকতেন!···মেজর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। সর্বদা চুপচাপ, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না। নিজের মনে শুধু কাজ করে যান।

হঠাৎ এমন সময় জাপানীরা নগিডক্ পাসের চারিদিক ঘিরে ফেলল,···নং ডিভিশন সম্পূর্ণ ঘেরাও হয়ে গেল!···

সে এক কী ভয়ংকর দিন।

প্রতি মুহূর্তে আমরা শত্রুর পদশব্দ শুনছি!···

চারিপাশে পাহারার কড়াকড়ি!···সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে!···একদিনের রেশন তিনদিনে খাচ্ছি!···

সেদিন রাত্রে অমনি ভয়ে ত্রস্ত হয়ে গর্তের মধ্যে চুপটি করে পিস্তলটি হাতে করে বসে আছি, হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল 'হল্ট্'! পাস ওয়ার্ড!···

কোন সাড়াশব্দ নেই!

তারপরই হঠাৎ একটা গুলীর আওয়াজ!···সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ণ চীৎকার। আবার গুলীর শব্দ।

একটা গোলমাল শোনা গেল।

চেয়ে দেখি সব অফিসাররা গর্ত হতে বের হয়ে যাচ্ছে, আমিও বের হলাম!

ব্যাপার কী?···

মেটে-মেটে জ্যোৎস্না উঠেছে আকাশে! অস্পষ্ট আলো-ছায়া যেন ভৌতিক বলে মনে হয়!···

শুনলাম কে একজন অন্ধকারে ঐদিকে যাচ্ছিল, হল্ট্ বলবার পর পাস-ওয়ার্ড না বলতে পারায় সেন্ট্রী গুলী করেছে।

● ক্রমশ

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিন্তু লোকটা গুলি খেয়েও পালাবার চেষ্টা করে, সেন্ট্রী আবার গুলি করে।

যেখানে কবর দেওয়া হতো, সেখানে যেতেই আমরা সব বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম!

যাকে গুলি করা হয়েছে সে আর কেউ নয়।

মেজর হাবিবুল্লা খান! পিঠের ভেতর থেকে ভল-ভল করে রক্ত বের হচ্ছে। সামনেই একরাশ বুনো ফুল ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত!

তখনই তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো।

কিন্তু বাঁচান গেল না, শেষরাত্রের আলো ফুটবার আগেই তার প্রাণবায়ু বাতাসে মিলিয়ে গেল: মরবার আগে শুধু একটি কথা সে আমাকে বলে গেছিল: চৌধুরী ভাই, আমি ত' চললাম। কিন্তু তুমি যতদিন এখানে আছো, দুটি করে বুনো ফুল আমার হতভাগ্য ভাইয়ের কবরের পরে ছড়িয়ে দিও, কাল দিনের বেলায় কাজে সময় পাইনি, তাই রাত্রে ফুল দিতে যাচ্ছিলাম। পাস ওয়ার্ড জানতাম না।···আর···আর তার পাশেই আমায় কবর দিও।

আনোয়ারের পাশেই মেজর হাবিবুল্লা খানের কবর দেওয়া হলো!···

আঁধারে আলো

● যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে

হে মোর স্বদেশ,

মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে

পরি তারি বেশ।

—রবীন্দ্রনাথ

বদন সর্দ্দারের লাঠি



—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

সে আজ বহুকালের কথা বলছি। পূজোর ছুটিতে বাড়ীশুদ্ধ সব গেছলুম দেওঘরে হাওয়া খেতে। ভারি ফুর্ত্তি! ইস্কুল-কলেজের উৎপাত নেই, পড়াশুনোর উৎপাত নেই;—স্রেফ্ খাও-দাও আর দল বেঁধে টো-টো করে হল্লা করে বেড়াও। দলটিও দিব্যি ভারি ছিল। আমাদের বাড়ীতেই খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো এবং আরও নানাতুতো ভাই নিয়ে প্রায় ডজনখানেক হবে। তার ওপর আবার কলকাতার ক্ষিতীশবাবুরাও দেওঘরে গিয়ে উঠেছেন। তাঁদের বাড়ীর ছেলেপুলের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়! কাজেই দলটি দিব্যি জমকালো হয়ে উঠেছিল।

প্রতিদিনের মত সেদিনও বিকেলেরদিকে দল বেঁধে সব বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছি। খোলা পথ। গাড়ী-ঘোড়ার হাঙ্গামা নেই, লোকজনের ভিড় নেই, লরি-চাপা পড়বার ভয় নেই, ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি নেই। দিব্যি বেপরোয়া বেড়িয়ে বেড়াও আর হল্লা কর।

করছিলুমও তাই। কেউ গান ধরেছে, কেউ চলতে চলতে একটা কাঠবিড়ালী দেখে তার পিছু-পিছু খাঁই-খাঁই করে ছুটেছে, কেউ পথ ছেড়ে মাঠে নেমে পড়েছে কি-একটা অচেনা গাছ থেকে অচেনা ফুল সংগ্রহ করবার জন্যে। সে এক কাণ্ডই আলাদা। এর কাছে কলকাতা?—আরে ছোঃ!

চলতে চলতে এসে পড়েছিলুম একটা সাঁকোর কাছে। ছোট্ট একরত্তি সাঁকো।—

ইটের গাঁথুনি। সরু একটা নালার জল তলা দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। তারই ওপর এই সাঁকো।

সাঁকোর দুদিকে চওড়া ইটের পাঁচিল। লোকে ইচ্ছে করলে অনায়াসে তার ওপর বসে থাকতে পারে। একটি লোক বসেও ছিলেন। মোটা বেঁটে-সেঁটে আধাবয়সী ভদ্রলোক।

বুল্টুটা আমার কাছ ঘেঁসে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে—ভদ্রলোকের লাঠিটার দিকে একবার চেয়ে দেখ নবু-দা।—বাপ্স, লাঠি ত নয়—যমের ডাণ্ডা!

চেয়ে দেখি, বুল্টু নেহাৎ বাড়িয়ে বলেনি। সত্যিই এরকম জবর লাঠি সচরাচর দেখা যায় না। দেখতে দেখতে প্রায় পনের জোড়া চোখ গিয়ে পড়ল লাঠিটার ওপর।

চেয়ে দেখি, ভদ্রলোকের মুখখানা গর্বে এবং খুসিতে ভরে উঠেছে। কিন্তু সে ভাবটা চাপা দিয়ে সহজ কণ্ঠেই বললেন—বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি তোমরা?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ!

কতদূর যাবে?

এই যতটা পারা যায়!

ভারি গলায় ভদ্রলোক বললেন—বেশ, বেশ, কিন্তু সঙ্গে লাঠি না নিয়ে বেরিয়েছ কেন?

বললুম—লাঠি নিয়ে কি করব বলুন?

ভদ্রলোক প্রায় ধমকে উঠলেন—কি করবে মানে?—লাঠি নিয়ে সবাই যা করে তাই করবে! তারপর গলাটাকে একটু নরম করে নিয়ে বললেন—না, না, একটা লাঠি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখবে। বিশেষ করে এইসব বিদেশ-বিভুঁই জায়গায়।

বললুম—কেন বলুন দেখি?

বিরক্ত হয়ে বললেন—কেন কি আবার! পথে হাজার রকম বিপদ ঘটতে পারে তো! ফস্ করে বাঘ-ভালুক বেরুতে পারে। তারপর ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়াও বিচিত্র নয়। অন্ততঃ সাপ-খোপের পাল্লায় পড়তে কতক্ষণ!—আরে বাপু, বিপদের অন্ত আছে নাকি?

● যম-সর্দারের লাঠি
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পানু বললে—আপনি বুঝি তাই পথে বেরুলেই লাঠি সঙ্গে রাখেন ?

ভদ্রলোক সগর্ব্বে বললেন—পথে বেরুবার সময় নয় শুধু, এই লাঠিটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, এমন কি ঘুমোবার সময় পর্য্যন্ত।

হিরুটা মহা ফাজিল। সে আমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বললে—বাঘ ভাল্লুক স্বপ্নে এসে যে বিপদে ফেলবে, সে পথটিও বন্ধ করেছেন ভদ্দরলোক।

ভদ্রলোক সমানে বকে চললেন—আরে বাপু! সাবধানের মার নেই,—বুঝেছ কি না!—বলে লাঠিটা বার বার জোরে জোরে মাটিতে ঠুকতে লাগলেন।

বুন্টু বললে—আপনার যা লাঠিখানি, ও আর হাঁকড়াবার দরকার নেই, দূর থেকে দেখেই চোর-ডাকাত সেলাম ঠুকে চোঁ-চাঁ দৌড় দেবে।

ভদ্রলোক একটা গর্ব্বের হাসি হেসে বললেন—এ লাঠি বড় যে-সে লাঠি নয় হে!—এর পেছনে দস্তুরমত ইতিহাস আছে। এটি হচ্ছে বদন-সর্দ্দারের লাঠি;—মদন-পুরের বদন-সর্দ্দার।—নাম শুনেছ নিশ্চয়ই!

বললুম—আজ্ঞে, কৈ শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন—শোননি?—তবে শোন,—বদন-সর্দ্দারের মত লাঠিয়াল বাংলাদেশে আজ পর্য্যন্ত বড় কমই জন্মেছে।

তারপর কিছুক্ষণ থেমে আবার সুরু করলেন—বলি মদনপুরের জমিদারের নাম শুনেছ ত?—না তাও শোননি?

বললুম—বাংলাদেশে কত জমিদার আছে, সকলের নাম কি আর…

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন—বাংলাদেশে হাজার গণ্ডা জমিদার আছে তা জানি, কিন্তু মদনপুরের জমিদারদের সঙ্গে তাদের কারুর তুলনাই হয় না। ওঁদের দাপটে বাঘে-গরুতে এক গামলায় জল খেতো,—বোঝো কাণ্ডটা। এ-হেন জমিদার-বাড়ীর সেরা লাঠিয়াল ছিল বদন-সর্দ্দার, আর এই যে লাঠিটা দেখছ, এটি ছিল বদন-সর্দ্দারের সবচেয়ে সেরা লাঠি।

গল্প ক্রমেই জমে উঠছিল।—বললুম—বদন-সর্দ্দারের লাঠি আপনি কি করে পেলেন?

বললেন—বদন-সর্দ্দার যে আমার ঠাকুরদার দেহরক্ষী ছিল।

বললুম—আপনি তাহলে মদনপুরের…

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন—হ্যাঁ, মদনপুরের বাবুরা বলতে আমাদেরই বোঝায়। এই যে লাঠিটা দেখছ, এটি হচ্ছে আসল লাঠির আধখানা। বাকি আধখানা আছে আমার জ্যাঠতুতো দাদা কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের কাছে। এই থেকেই বুঝতে পারছ আসল লাঠিটা কত লম্বা ছিল।

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার সুরু করলেন—তোমরা মেধা-ডাকাতের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই!

মাথা চুলকে আমতা আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিলুম, ভদ্রলোক তার আগেই বলে উঠলেন—শোননি ত? নাঃ, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। মেধা-ডাকাতের নাম শোননি?—যার ভয়ে একদিন,—নাঃ, তোমরা অবাক করলে দেখছি!

বললুম—খুব দুর্দ্দান্ত ডাকাত ছিল বুঝি?

বললেন—দুর্দ্দান্ত বলে দুর্দ্দান্ত! তার ভয়ে বাংলার বড় বড় জমিদারেরা রাত্তিরে ঘুমোতে পারতো না। অবিশ্যি মদনপুরের জমিদারদের কথা আলাদা।

বললুম—আলাদা কেন?

ভদ্রলোক সগর্ব্বে বললেন—তাঁদের যে বদন-সর্দ্দার ছিল। মেধা-ডাকাত ছিল যেমন বুনো ওল, বদন-সর্দ্দার ছিল ঠিক তেমনি বাঘা তেঁতুল। শেষকালে এই বদন-সর্দ্দারের হাতেই মেধা-ডাকাতের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল।

আমাদের দলটি আগেই ভদ্রলোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, এইবার আরো ঘেঁসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক হঠাৎ লাঠিটা উঁচু করে ধরলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এই লাঠি দিয়েই বদন-সর্দ্দার মেধাকে ঘায়েল করেছিল। তারপর একটা প্রকাণ্ড খাঁড়া দিয়ে তার মুণ্ডুটা কেটে একটা কাঠের বারকোশের ওপর বসিয়ে ঠাকুরদা মশাইকে উপহার দিয়েছিল। যে খাঁড়া দিয়ে মেধার মুণ্ডুটা কেটেছিল, সে খাঁড়াটা আজও আমাদের মদনপুরের বাড়ীর দোতলার বৈঠকখানার দেয়ালে ঝুলছে।

ঝুণ্টু বললে—বদন-সর্দার কি করে তাকে মারলে ?

তবে শোন—বলে ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন—মেঘা-ডাকাত কোথাও ডাকাতি করবার আগে চিঠি পাঠাতো। অবিশ্যি ডাকাতি করত সে বড় বড় জমিদারের বাড়ীতেই। চিঠিতে লেখা থাকতো, অমুক দিন অমুক সময় যাচ্ছি, তৈরী থাকবেন।

আমার বয়েস তখন বারো কি তেরো। বেশ মনে পড়ে, সেদিন রাসপূর্ণিমা। আমাদের বাড়ীতে খুব ধুমধাম করে রাস হোতো। তিনদিন-তেরাত্তির হরদম উৎসব চলতো।—ঢালাও ব্যাপার!—যাত্রা, থিয়েটার, পুতুল-নাচ, তজ্জা, কথকতা, একটা না একটা চলেছেই চলেছে।—তার আর বিরাম নেই।

রাত্তির তখন দুটো কি আড়াইটে হবে। আসরে বসে সব যাত্রা শুনছি—হঠাৎ মেঘা ডাকাতের চিঠি এসে হাজির। সে লিখেছে—আগামী শনিবার রাত নটার সময় যাচ্ছি, অভ্যার্থনার আয়োজন করে রাখবেন।

অন্য কোন জমিদার হলে তখুনি উৎসব বন্ধ করে দিতেন, ঠাকুরদা-মশাই কিন্তু একটুও দমলেন না।

পানু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—চিঠিটা দিলে কে ?

ভদ্রলোক বললেন—আমাদেরই পুরোনো উড়ে মালী ঈশ্বরা। কে-একজন তার হাতে চিঠিটা দিয়েই সরে পড়েছিল।

বললুম—চিঠিটা পেয়ে আপনার ঠাকুরদা কি করলেন ?

অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন—চিঠিটা পেয়ে তিনি আসরের মধ্যেই উঠে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর স্বাভাবিক ভারী এবং গম্ভীর কণ্ঠে চিঠিটা পড়ে সবাইকে শোনালেন। চিঠি-পড়া শেষ করে বললেন—একটা উৎসব ফুরোতে না ফুরোতে আর একটা উৎসব সুরু হবে।—এ তো আনন্দের কথা! কথাটা শেষ করেই তিনি পিছন ফিরে বদন-সর্দারের দিকে চেয়ে বললেন—উৎসবটা যেন ঘটা করে হয় বদন!

বদন মুখে কিছুই বললে না, শুধু হাতের লাঠিটা তার পিল্‌পের মত চওড়া আর নিরেট কাঁধটার ওপর বার বার সজোরে ঠুকতে লাগলো। আমার হাতে এই যে লাঠিটা দেখছো, এই লাঠিটাই ছিল তখন তার হাতে।—বলেই ভদ্রলোক লাঠিটাকে

বারকতক মাটিতে ঠুকলেন। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি একসঙ্গে লাঠিটার ওপর গিয়ে পড়লো। লাঠিটাকে আমরা যেন নতুন চোখে দেখতে লাগলুম।

ভদ্রলোক বলে চললেন—পরের দিন সকালথেকেই চারিদিকে 'সাজ-সাজ' রব পড়ে গেল। হাতে মাত্র দুটো দিন। বদন-সর্দার তার লাঠিয়ালদের নিয়ে দুবেলা মওড়া দিতে সুরু করলে। বাড়ীর মেয়েরা গোবিন্দজীর মন্দিরে পূজোর পর পূজো পাঠাতে লাগলেন। ঠাকুরমা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে জোড়া মোষ মানত করে বসলেন।

দেখতে দেখতে শনিবার এসে হাজির হোলো। সকাল কাটলো, দুপুর কাটলো, বিকেল কাটলো, সন্ধ্যেও কেটে গেল। বাড়ীর মেয়েদের আর ছেলেপুলেদের দোতলার হলঘরটায় পুরে বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে দেওয়া হোলো। আমরাও তার মধ্যে পড়েছিলুম।

অন্ধকার ঘর; কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কানে কেবল একটা গুণ-গুণ আওয়াজ আসছে—'হে গোবিন্দজি, হে মধুসূদন, হে মা সিদ্ধেশ্বরী'—এমনি আরো কত কি! এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগলো। রাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বুকের টিপ্‌টিপিনিও সেই সঙ্গে দ্রুততর হয়ে আসছে। ঠাকুরমা সমানে একঘেয়ে চাপা সুরে দেব-দেবীদের নাম আওড়ে চলেছেন।

হঠাৎ দূরে একটা হল্লা উঠলো—বিকট হল্লা! জানলার কাছেই বসেছিলুম। ভয়ে ভয়ে খড়খড়ির একটা পাখী তুলে দেখি—দূরের একটা বাঁশবন মশালের আলোয় একেবারে লাল হয়ে উঠেছে, আর সেই লকলকে মশালগুলো অন্ধকারে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে আমাদের বাড়ীর দিকে। সে কি হল্লা!—কানে বুঝি তালা লেগে যায়!

তারপর কি যে হোলো বুঝতেই পারলুম না; হঠাৎ চেয়ে দেখি, মশালগুলো সব নিবে গেছে, আর সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেবল কাল কাল মাথা আর লাঠির ডগাগুলো। তারপরেই চোখের কাজ গেল থেমে, চলতে লাগলো কেবল কানের কাজ।—কেবল খটাখট্ আওয়াজ আর তার সঙ্গে আহতদের বিকট আর্তনাদ।

জানলার কাছ থেকে সরে এলুম। সর্বশরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো।

● বদন-সর্দারের লাঠি
[illegible] চৌধুরী

অন্ধকারে তখনও ঠাকুরমার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সে স্বর আগেকার চেয়ে অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে এবং থরথর করে কাঁপছে।

এমনি করে কতক্ষণ যে কেটেছিল তা টের পাইনি। বোধহয় ঘণ্টা দুয়েকের ওপর কেটে গেছলো।—কোন কিছু অনুভব করবার শক্তি তখন হারিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ ঝনাৎ করে আমাদের ঘরের দরজাটা গেল খুলে।

সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও সজোরে ধড়াস্ করে উঠলো। 'মাগো'—বলে চিৎকার করে উঠে ঠাকুরমা ঝাপটে ধরলেন আমাকে।—আমিও জড়িয়ে ধরলুম ঠাকুরমাকে।



বারকোশটার ওপর রয়েছে একটা প্রকাণ্ড কাটা মুণ্ডু। [পৃষ্ঠা ১৬৯

পরক্ষণেই কানে এলো যবন-সর্দারের কণ্ঠস্বর—জয় গোবিন্দজি কি জয়, জয় সিদ্ধেশ্বরী মায়িকি জয়, জয় কর্তাবাবুকি জয়! সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কারা চেঁচিয়ে উঠলো—জয় যবন-সর্দার কি জয়!

ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলুম! ঠাকুর-মা আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়েছিলেন—ধীরে ধীরে মাথা তুললেন।

মশালের আলোয় তখন ঘরের কোলের বারান্দাটা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। সেই আলোয় দেখলুম—ঠাকুরদা মশাই তাঁর বিপুল শরীরখানি নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকছেন। তাঁর ঠিক পিছনেই আসছে বদন-সর্দ্দার। হাতে তার প্রকাণ্ড একটা কাঁঠালকাঠের বারকোস, আর সেই বারকোসটার ওপর রয়েছে একটা প্রকাণ্ড কাটা মুণ্ডু! চোখ দুটো সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলে না,—আপনা হতে বুজে গেল।

আবার যখন চোখ চাইলুম, তখন দেখি, বদন-সর্দ্দার ঠাকুর-মার সুমুখে হাতদুটো জোড় করে হাটুগেড়ে বসে রয়েছে, আর ঠাকুর-মা তাঁর মোটা মোটা হাত দুটি থেকে মোটা মোটা সোণার তাগা দুটো ধীরে ধীরে খুলছেন।

এই পর্য্যন্ত বলেই ভদ্রলোক একবার থামলেন; তার পর হাতের লাঠিটা উঁচু করে ধরে আবার সুরু করলেন—এই সেই লাঠি, যে লাঠি দিয়ে বদন-সর্দ্দার মেধা ডাকাতকে ঘায়েল করেছিল। তারপর যে খাঁড়া দিয়ে তার মুণ্ডটা কেটেছিল, সে খাঁড়াটা তোমাদের দেখাতে পারলুম না। যদি কোন দিন মদনপুরে যাও, তাহলে দেখাতে পারি।

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক দূরের শালবনটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন। মনে হতে লাগলো, সন্ধ্যার সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে তিনি অতীতের সেই সব ছবি কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করছেন।

* * *

সে দিন সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে মদনপুরের বদন-সর্দ্দারের কীর্ত্তি-কলাপের কথা ফলাও করে মেয়েদের কাছে বললুম।

এ হেন বদন-সর্দ্দারের লাঠি আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি;—চালাকি নয়! খা খার কাকী-জেঠীর দলকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিলুম। উৎসাহটা ছোটকাকীমারই সব চেয়ে বেশী। মাস্কে বড় হলে কি হবে, বয়েসে ছোটকাকীমা আমাদের চেয়ে বড় জোর দু-চার বছরের বড়। কাজেই আমাদের সঙ্গে জমতো খুব।

● বদন-সর্দ্দারের লাঠি
শ্রীবিশপতি চৌধুরী

ছোটকাকীমা ধরে বসলেন—লাঠিটা এনে একবার দেখিয়ে যেতে হবে।

বললুম—পাগল নাকি! অতবড় একটা ঐতিহাসিক জিনিস;—যার-তার কাছে কেউ কখন ছেড়ে দেয়!

ছোটকাকীমা নাছোড়বান্দা।—বল্লেন, আমরা ত আর চুরি করে নিচ্ছি নারে বাপু!

আমরা ত হেসেই খুন! একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি! আমাদের না হয় কু-মতলব নেই, কিন্তু যাঁর লাঠি তিনি বিশ্বাস করবেন কেন? বিশেষ করে অত বড় একটা বিখ্যাত জিনিস!—কার মনে কি আছে কে জানে?

ছোটকাকীমা কিন্তু কিছুতেই দমতে চান না। অবশেষে কথা দিতে হোলো—আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখবো।

* * *

পরদিন বিকেলের দিকে ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার সেই সাঁকোটার কাছে দেখা।—হাতে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাঠি।

ভয়ে ভয়ে বললুম—আজ্ঞে, লাঠিটা যদি একদিনের জন্যে দেন!—বাড়ীর মেয়েরা দেখবার জন্যে বড্ড জেদাজেদি করছে।

ভেবেছিলুম, ভদ্রলোক আমার কথা শুনে মারতে আসবেন। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ তিনি প্রকাশ করলেন না। বরং খুব উৎসাহের সঙ্গেই বললেন—বেশ ত, নিয়ে যাও!—কালই কিন্তু ফেরৎ দিতে ভুলো না।—বুঝতেই ত পারছ কি রকম মূল্যবান্ জিনিস।

খুব উৎসাহের সঙ্গে বললুম—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!—কাল সকালেই আপনার বাড়ীতে গিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসবো।

বললেন—আমার বাড়ীটা তাহলে চিনিয়ে দিই চল।

বেশি দূর যেতে হোলো না। কাছেই বাসা—নিতান্ত সাধারণ ধরণের একতলা বাড়ী। ছোট্ট গেটের পিলের ওপর ট্যাবলেট্ মারা। তাতে লেখা রয়েছে—'মদন-ভিলা'।

● মদন-সর্দারের লাঠি
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

লাঠিটা নিয়ে বাড়ী ফিরতেই মেয়ে-মহলে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ছোট-কাকীমা ত একেবারে আনন্দে লাফালাফি সুরু করে দিলেন! মদনপুরের মদন-সর্দারের লাঠি!—চাড্ডিখানি ব্যাপার নয়!

অনেক রাত পর্য্যন্ত সেদিন ঐ লাঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কাটলো। এত বড় একটা ঐতিহাসিক বস্তু আমাদের অধিকারে এসেছে মাত্র একটা দিনের জন্যে।

রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম—মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়া লম্বা-চওড়া এক দশাসই পুরুষ।—ইয়া পাকানো গোঁপ, ইয়া গালপাট্টা, ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া গদ্দানা! চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বল-জ্বল করছে। লাল টকটকে একটা কাপড়ের ফেটি কপালের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে টাইট্ করে মাথায় জড়ানো;—তারি দুপাশ দিয়ে নেমেছে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বাবরি চুল।—হ্যাঁ, চেহারা বটে!

* * *

পরদিন সকালে লাঠি নিয়ে সদলবলে চলেছি মদন-ভিলার দিকে। হল্লা করতে করতে চলেছি। হঠাৎ পথের মাঝখানে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা।

অবিনাশবাবু হচ্ছেন এখানকার একজন মুরুব্বি ব্যক্তি। দেওঘরের স্থায়ী বাসিন্দা এঁরা। খুব জমাটি লোক। ছেলে-বুড়ো সকলের সঙ্গেই দিব্যি জমিয়ে নিতে পারেন। বাইরে থেকে কেউ দেওঘরে এলে অবিনাশবাবুর কাজ যায় বেড়ে। বাসা ঠিক করে দেওয়া, গয়লা জুটিয়ে দেওয়া, চাকর-বাকর খুঁজে দেওয়া, এ সব ত আছেই; তার ওপর আবার রোজ দুবেলা নিজে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যাওয়া আছে।

দূর থেকে অবিনাশবাবুকে দেখে সবাই উৎসাহে লাফিয়ে উঠলুম। ভদ্রলোককে আজ রীতিমত চমকে দেওয়া যাবে। চিরটা কাল দেওঘরে বাস করেও ভদ্রলোক যে জিনিস আবিষ্কার করতে পারেন নি, দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে আমরা তা আবিষ্কার করে ফেলেছি।—চালাকি নয়!

প্রসঙ্গটা সুরু করবো কি ভাবে মনে মনে তাই ঠিক করছি; এমন সময় অবিনাশবাবু নিজেই প্রশ্ন করে বসলেন—এ লাঠি তোরা কোথা থেকে পেলি বল্ ত?

খুব গম্ভীরভাবে বললুম—এ কার লাঠি জানেন?

ভদ্রলোক সহজ কণ্ঠেই বললেন—তা আর জানি না!

বললুম—কার বলুন ত?

ভদ্রলোক বললেন—মদন-ভিলার দত্ত-মশাইয়ের লাঠি ত?



ও লাঠি ত আমিই দিয়েছি। [পৃ: ১৭৩

একটু হেসে বললুম—তা ঠিক; কিন্তু এর পেছনে কতবড় ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, তা নিশ্চয়ই জানেন না।

ভদ্রলোক অবাক্ হয়ে আমার মুখের পানে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন—ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে?—তার মানে?

বললুম—তার মানে দত্ত-মশাই যাঁর কাছ থেকে এই লাঠি পেয়েছেন, তিনি একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

হো-হো করে হেসে উঠে ভদ্রলোক বললেন—তার মানে তোরা বলতে চাস, আমি একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি!—ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে!

বললুম—আপনার কথা কে বলছে?—দত্ত-মশাই যাঁর কাছ থেকে লাঠিটা পেয়েছেন, আমরা তাঁর কথা বলছি।

● মদন-সর্দারের লাঠি
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

ভদ্রলোক বললেন—ওতো একই কথা হোলো। যার নাম ভাজা-চাল, তারি নাম মুড়ি।

কিছুই বুঝতে না পেরে বললুম—একই কথা মানে?

ভদ্রলোক বললেন—ও লাঠি ত আমিই দিয়েছি দত্তমশাইকে!

বললুম—আপনি দিয়েছেন?

বললেন—হ্যাঁ, আমিই দিয়েছি।—কেন দিতে নেই নাকি? ভদ্দরলোক বার বার তারিফ করতে লাগলো লাঠিটার; কাজেই ভদ্রতার খাতিরে দিয়ে দিতে হোলো। বারগণ্ডা পয়সা দাম বৈত নয়!

বিস্মিত হয়ে বললুম—তবে যে দত্ত-মশাই বললেন, বদন-সর্দ্দারের কাছ থেকে পেয়েছেন!

ভদ্রলোক অবাক্ হয়ে বললেন—বদন-সর্দ্দার?—সে আবার কে?

অতঃপর বদন-সর্দ্দারের কাহিনীটা সংক্ষেপে শুনিয়ে দিতে হোলো।

সব শুনে ভদ্রলোক প্রথমটা ত হেসেই খুন। তার পর হাসির বেগটা একটু কমলে বললেন—খাসা গল্প বানাতে পারে ত লোকটা! তোদের কাছে খুব পটি মেরেছে ত!

ক্যাল্ ক্যাল্ করে আহাম্মকের মত অবিনাশবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম। মনে মনে বললুম—হে বসুন্ধরা, তুমি দয়া করে দু-ফাঁক হও মা, আমরা তোমার মধ্যে সেঁদিয়ে যাই।

মা-বসুন্ধরা যে সত্যি সত্যি দু-ফাঁক হন নি, এবং আমরাও যে তাঁর পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাই নি, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ; কারণ, তাহলে আজ আর তোমাদের জন্যে গল্প লিখতে পারতুম না।

আঁধারে আলো

● যে সবচেয়ে বেশী দেয়, সেই সবচেয়ে বেশী পেয়ে থাকে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস



হুমায়ুন কবির

ছয়টি বছর আকাশে বাতাসে
বাজিয়াছে রণভেরী,
আজিকে ক্লান্ত মানুষ শুধায়,
"শান্তির কত দেরী ?"
অস্ত্রের রোল থেমেছে ভূতলে,
মৃত্যু-মাতন সাগরের জলে,
অন্তরীক্ষে আর নাহি জ্বলে,
প্রলয়ের দাবানল।
শুধায় ক্লান্ত মানুষ, "কোথায়
শান্তির সুধাজল ?"

মানুষ হেনেছে মানুষে আঘাত
প্রকাশ্যে অগোচরে,
সৈনিক আর নাগরিক বলি
কোন ভেদ নাহি ক'রে।

দুগ্ধ-পোষ্য শিশু শত শত
চোখের পলকে আহত-নিহত,
নব-যৌবনা কিশোরীরা কত
দলিত, অঙ্গহারা—
ছয় বছরের পিশাচের নাচ
এতদিনে হ'ল সারা ?

থামিয়াছে আজি ভুবন ভরিয়া
অস্ত্রের ঝঞ্ঝন—
উঠে আহতের আর্ত্ত-বিলাপ
ব্যথিতের ক্রন্দন।
সংঘাত-মাঝে শান্তির বাণী
কহিয়া ঘুচাবে অন্তর-গ্লানি
সে মহামানব কোথা নাহি জানি
আজো সাধনায় বসি',
ধরার আর্ত্ত ক্রন্দন উঠে
তারি লাগি নিঃশ্বসি'।

শত মানুষের পরাধীনতার
নিভাইবে তুষানল,
ধরাতলে ঘুচে যাবে চিরতরে
শোষণ চাতুরী খল।

● যুদ্ধশেষে
হুমায়ুন কবির

জাতিতে জাতিতে যত বিদ্বেষ
স্বাধীন ভুবনে হবে নিঃশেষ,
নাহি আর রবে হিংসার লেশ
উদার মুক্তি-মাঝে,
জীর্ণ জগতে নব-জীবনের
আহ্বান কোথা বাজে?

আঁধারে আলো

● বঙ্গযুবক! বিশ্বাস করো তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান্ তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী। অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না। তোমরাই আত্মত্যাগে ভারতমাতার প্রতিপালন করিবে। বিশ্বাস করো কখনো নিষ্ফল হইবে না। তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে!

—গিরীশচন্দ্র ঘোষ



রামধনুর দেশে

—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

পৃথিবী আগে ছিল মস্ত বড়—তা'র আদি-অন্ত ছিল না। এ-যুগে উড়োজাহাজের কৃপায় জানা গেছে পৃথিবী এমন-কিছু বড় নয়, মাত্র সাত দিনে পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ করা যায়। তা ছাড়া এ-যুদ্ধে দেখা গেল, মানুষের অসাধ্যও যেমন আর কিছু নেই, তেমনি দুর্গম ব'লেও আর কিছু এর পরে থাকবে না। জার্মানী থেকে বোমা গিয়ে পড়ে ইংলণ্ডে, জাপানের বোমা গিয়ে পড়ে আমেরিকায়। মানুষের বুদ্ধি আর গবেষণা, দুরূহ আর দুর্গমকে জয় করার জন্য যুগ-যুগান্তর থেকে সাধনা ক'রে চলেছে।

এ ছাড়া আর একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই বৎসর পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর ও অভিনব বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেটির নাম 'এটমিক্ বোমা'। দুটি মাত্র এটমিক্ বোমা ফেলে সম্প্রতি জাপানের দুটি বিরাট শহরের অধিকাংশকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। এটমিক্ শক্তির প্রলয়ঙ্কর শক্তির চেহারা দেখে আজ পৃথিবীর মানব-সমাজ মূঢ়, ভয়ার্ত ও অভিভূত! কিন্তু এই এটমিক্ শক্তি যদি কোনোদিন মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো হয়, সেদিনও পৃথিবীর লোক বিস্ময়াবিষ্ট হবে। ধরো, যে দেশে বৃষ্টি হচ্ছে না, সেখানে মেঘ উড়িয়ে এনে কৃত্রিম শৈত্যের সাহায্যে বৃষ্টি নামানো হবে। হয়ত পৃথিবীতে কঠিন ব্যাধি নামক কিছু থাকবে না,—কারণ মানুষের শরীরের বীজাণুকে পরিবর্তন ক'রে দেওয়া যাবে। যে কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে, হয়ত সেই মৃত্যুর কারণটিকে লোপ করা হবে। এসব ছাড়াও বৈজ্ঞানিকেরা নাকি এই এটমিক শক্তি দিয়ে এমন সব বিষয় আবিষ্কার করে, যা এই বিশ্বসৃষ্টির সকল রহস্যকে

উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হবে। অনেকেই বলছে, এতদিন পরে জ্যোতিষ্কলোকে যাওয়া মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য হোলো।

সুতরাং গত ছয় বছরের সর্বগ্রাসী ও প্রলয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম শুধু যে নিরীহ মানুষের সমাজে দুঃখ, ব্যথা ও মৃত্যু ঢেলে দিয়ে গেল,—এই এটমিক্ শক্তি আবিষ্কারের ফলে হয়ত সেই বিয়োগান্ত নাটকের ভিতর থেকে একটা মহৎ সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াবে।

কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বড়ই হোক, সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের পিপাসা কোনো যুগে বদলাবে কিনা এখনও বলা কঠিন। আমরা আজও বিরাট হিমালয় দেখে যেমন অভিভূত হই, বিশাল সমুদ্র দেখে তেমনি স্তব্ধ হয়ে থাকি। কোথায় সুন্দর পারিজাত-কানন, কোথায় আগ্নেয়গিরির আশ্চর্য দৃশ্য, কোথায় অগাধ সাগরের মাঝখানে রক্তপ্রবাল-দ্বীপের পুষ্পোদ্যান—এগুলি আমাদের কাছে আজও অপরূপ। আজ এমনি একটি দৃশ্যের বর্ণনা করবো।

সেটি হোলো আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এই বিরাট জলপ্রপাত যে ভূভাগটির সম্পদ—সেই ভূভাগের নাম হোলো রামধনুকের দেশ। সেখানকার আকাশ আর শূন্যলোক চিরদিন রামধনুর বিচিত্র বর্ণসজ্জায় ভ'রে থাকে। সূর্যের আলোর সঙ্গে বায়ুস্তর আর জলকণার মিশ্রণে সেই রামধনুগুলি পলকে-পলকে নতুন আকার ধারণ করতে থাকে। ঠিক যেন মনে হয়, শূন্যলোকে আকাশের দেবতারা নেমে এসে শত-শত ধনুর্বাণ নিয়ে নিঃশব্দে তীর ছোড়াছুড়ি করছেন, এবং সেখানে একটি অস্থির চঞ্চল জয়-পরাজয়ের খেলা চলেছে!

সুদূর আফ্রিকার জাম্বেসি নদীর ধারে এই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যিনি আবিষ্কার করেন, তিনি ইতিহাসের সেই সুবিখ্যাত মিশনারী ইংরেজ ডাঃ লিভিংস্টোন্। তাঁর আগে আর কোনো শ্বেতচর্মী আফ্রিকার এই ভূভাগে পদার্পণ করেন নি, অথবা এই প্রপাতও দেখেন নি। লিভিংস্টোন্ যাবার আগে আফ্রিকার স্থানীয় আদিবাসীরা এই জলপ্রপাতটিকে বলতো, 'মসিওয়াটুনিয়া' অর্থাৎ সঙ্গীতময় ধূম্রজাল।

● রামধনুর দেশে
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ডাঃ লিভিংস্টোন্ ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ পরিব্রাজক। পৃথিবীতে তখনও ক্রীতদাস ব্যবসায়-প্রথা চলিত ছিল—লিভিংস্টোন্ স্বয়ং দুর্গম আফ্রিকায় গিয়ে দুরারোহ ও বিপজ্জনক অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ভ্রমণকালে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন। কত বিপদ, কত ভয়, কত উপবাস ও কত বিরোধিতা,—কিন্তু তাদেরই ভিতর দিয়ে এই অদম্যপ্রাণ-সম্পন্ন ইংরেজটি একদিকে যেমন খৃস্টধর্ম প্রচার করতেন, অন্যদিকে তেমনি দাস-ব্যবসায় প্রথাকে উচ্ছেদ করার জন্য দিবারাত্র চেস্টা করতেন। তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অসুবিধার কথা ছিল এই, আফ্রিকায় যা'রা ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে ব্যবসা চালাতো, তা'রা অনেকেই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান লোক। লোভ ও লাভের জন্যই তারা এই কুকর্ম করতো। তা'রা একজোট হয়ে অনেক সময়ে লিভিংস্টোনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতো, তাঁকে হত্যা করার ফন্দী আঁটতো।

লিভিংস্টোন্ যখন আফ্রিকায় ভ্রমণ করতেন, তখন এ-যুগের কোনো যানবাহন ছিল না। রেলপথ সেখানে নেই, মোটর নেই, ঘোড়ার গাড়ী, কিছুই নেই,—এবং সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা, চলাচলের কোনো রাস্তাও নেই। হাজার-হাজার মাইল-ব্যাপী হিংস্র জানোয়ার-ভরা জঙ্গল ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। গাছের ফল বিষাক্ত, জলাশয় দুস্ট বীজাণুপূর্ণ। বড়-বড় নদী অগম্য এবং প্রবল স্রোতস্বিনী। চারিদিকে সিংহ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জানোয়ার!

সভ্যতার চিহ্ন কোথাও নেই, সঙ্গী নেই,—শুধু আরণ্যক হিংসাপরায়ণ আদিবাসীরা চারিদিক থেকে মাঝে-মাঝে শত্রুতা করে। একবার এক সময় ডাঃ লিভিংস্টোন্ এক বিশালকায় সিংহের কবলে পতিত হন। সিংহটি তাঁকে সহসা অতর্কিতে আক্রমণ করে, এবং তাঁকে পায়ের তলায় ফেলে তাঁর একটি বাহু চিবোতে থাকে,—তাঁর বাহুর হাড়ভাঙ্গার শব্দ হয়।—তবে বিস্ময়ের কথা, হৈ-হট্টগোলে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়ে যান। সেই থেকে তাঁর ভাগ্যের চাকা একটু ঘুরে দাঁড়ায়। এই অবধারিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার ফলে সেখানকার আদিবাসীরা তাঁকে দেবদূত ব'লে মনে করে, এবং সেই থেকে সেই বর্বর আদিবাসীদের কাছ থেকে তিনি নানাভাবে সাহায্য পেতে থাকেন।

পরিব্রাজক লিভিংস্টোন্ অতঃপর আবার অভিযান সুরু করেন।

● মালদহ থেকে
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

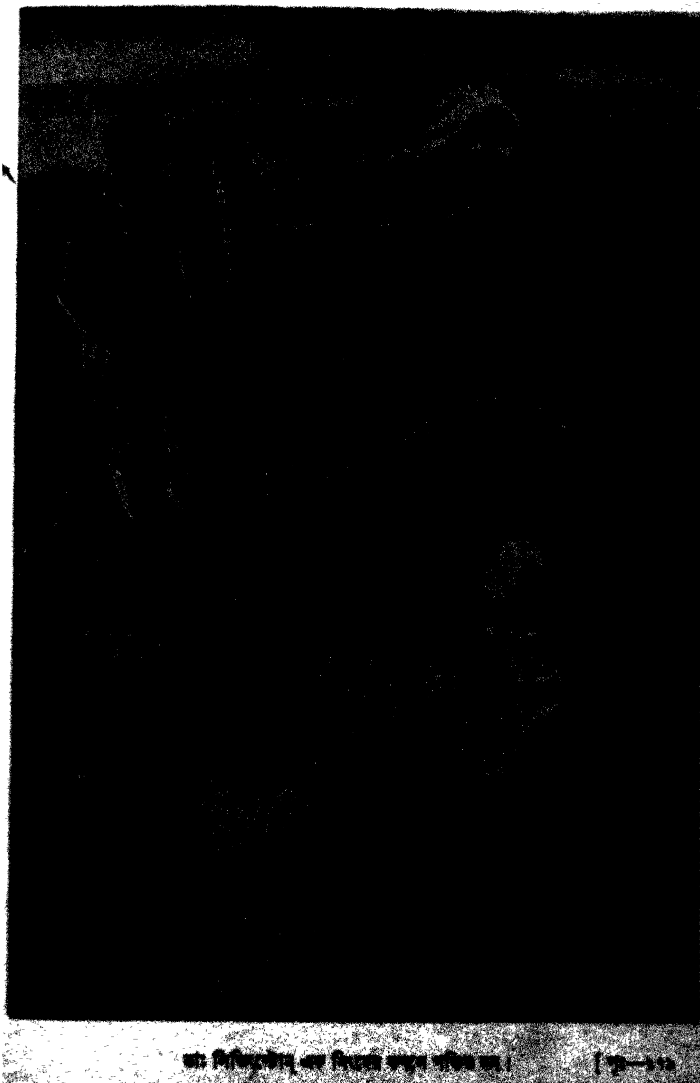
এবার এই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের একটুখানি ব্যক্তিগত পরিচয় দেবো। ভবিষ্যতে অনেক বড় হবে, এমন অনেক লোক নিতান্ত সামান্য হয়ে জন্মগ্রহণ করে। একদা যে-ব্যক্তি সমগ্র ইংলণ্ড ও জগতে 'সিংহ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তরুণ বয়সে তিনি চরকায় সুতো কাটতেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তিনি ছাত্র ছিলেন, এবং অনেকে জানতো তিনি চিকিৎসকের পেশা নিয়ে যাবেন এখানে-ওখানে। কিন্তু পাস করার পর ঘটনাচক্রে গভর্ণমেণ্টের কাজের সহায়তার জন্য ১৮৪০ খৃস্টাব্দে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হয়—উদ্দেশ্য, সেখানকার কুরুমান-অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় বেচুয়ানাদেরকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা।

কুরুমান-অঞ্চলে গিয়ে লিভিংস্টোন্ হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে ছ'মাস ধ'রে সেখানকার আদিবাসিগণের মধ্যে দিন যাপন করেন। তাদের সংস্কার, ভাষা, অভ্যাস, বিশ্বাস—এ-সমস্ত তিনি নিখুঁতভাবে জানতে চান্—এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ধর্মোপদেশ প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এ-সকল কাজে লিপ্ত থাকলেও তাঁর মন প'ড়ে থাকে ভ্রমণের দিকে—নতুন দেশকে জানবার, নতুন মানুষের সমাজকে বোঝবার এবং দুর্গমকে জয় করবার বাসনা তাঁর মনে নিত্য জাগরূক থাকতো। সে-বাসনা এত তীব্র ও আন্তরিক যে, তিনি স্বদেশে ফিরবার নাম করতেন না।

প্রায় ন'বছর এইভাবে কাটিয়ে লিভিংস্টোন্ একদল তরুণ দুঃসাহসীকে নিয়ে আবার একদিন আফ্রিকার দুর্গম ভূভাগের দিকে অভিযান আরম্ভ করেন। পথ-ঘাট অতিশয় কষ্টসাধ্য—এবং তৃষ্ণায় জল পেতে হ'লে আদিবাসীরা বালুমাটি দু'হাতে তুলে তবে নীচের থেকে জল বা'র করতো। কোনো অস্ত্রদ্বারা মাটি অথবা বালু খোঁড়া তারা পাপ ব'লে মনে করে। জল সেই ভূভাগে ভারি দুষ্প্রাপ্য। দুর্গম আফ্রিকার ঠিক সেই মধ্যকেন্দ্র-ভূমিতে একদিন লিভিংস্টোনের দল দূরে একটি বৃক্ষচ্ছায়াময় জলাশয় লক্ষ্য ক'রে যখন দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়—দেখা যায়, সেটি একটি মরীচিকামাত্র। সেদিন ব্যর্থতার হতাশায় তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

এইভাবে চলতে-চলতে তাঁরা নব-নব দেশ, নদী ও পর্বত ইত্যাদি আবিষ্কার করতে থাকেন। পরবর্তী কালে তাঁদের রচিত মানচিত্র অনুসরণ ক'রে বহু ব্যবসায়ী

● রাজকন্যার দেশে
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল



[illegible]

ও অভিযানকারী সুবিধালাভ করেন। এর প্রায় দু'বছর পরে লিভিংস্টোন্ আফ্রিকার মধ্যভাগে জাম্বেসি নদী আবিষ্কার ক'রে পৃথিবী-বিখ্যাত হন।

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর এইভাবে তিনি অরণ্যে, পর্বতে, নদীতীরে এবং আদিবাসীদের বসতির আশেপাশে ভ্রমণ ক'রে বেড়ান। অতঃপর যেদিন কেপ্‌টাউনে তিনি এসে উপস্থিত হন, সেদিন সভ্যজগতের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু স্বদেশে ফিরবার কোনো মোহ অথবা লোভ তাঁকে বশীভূত করতে পারে নি,—তিনি কেপ্‌টাউন থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলি রসদ ও জ্যোতির্বিদ্যা আয়ত্ত করার কতকগুলি উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আবার তাঁর সেই ক্লান্তিকর যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। বেচুয়ানায় তাঁর সেই নির্জন আশ্রমটি তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে!

এই সময় বুয়োর জাতি নানাবিধ উৎপাত করতে থাকে এবং বৃটিশের সঙ্গে তাদের এখানে-ওখানে সংঘর্ষ বাধে। মাঝখানে একটি চুক্তির ফলে যখন বৃটিশ প্রভাব সেখান থেকে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়, সেই সময় সহসা একদিন বুয়োররা লিভিংস্টোনের ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে কতকগুলি লোককে হত্যা করে এবং তারপর তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুইশত ছেলে-মেয়েকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস বানায়। তা'রা লিভিংস্টোনের ঘর-বাড়ী নষ্ট করে, তাঁর লাইব্রেরী ধ্বংস করে, তাঁর ঔষধপত্র তচনচ ক'রে দেয়, এবং তাঁর যথাসর্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে চ'লে যায়।

লিভিংস্টোন্ এ'তে পরাজয় স্বীকার করেন নি। তিনি অধিকতর উদ্যমে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার বিলাতে আসেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি যেন নূতন বেগে ফিরে আসে! তিনি আগে ছিলেন এক মিশনারী, কিন্তু এবার থেকে একজন পাকা অভিযানকারী হয়ে ওঠেন। কষ্টসাধ্য ভ্রমণ ও অভিযান,—তিনি একা অসীম শক্তির সঙ্গে চালিয়ে যেতেন। তাঁর একমাত্র কল্পনা—অরণ্যের দুরূহ গহ্বরলোকে গিয়ে তিনি সভ্যতার আলো জ্বালাবেন। বুয়োরদের শত্রুতা, জলহীন মরুভূমি, দাস-ব্যবসায়ী লোভী আরব বণিক, জলাভূমির রোগ-বীজাণু এবং দু'-কূলপ্লাবী নদীর ধারা,—এরা ছিল তাঁর অভিযানের পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা। কিন্তু তবু তিনি অগ্রসর হন, এবং একে-একে ভূগোলের বিস্ময়কর

● রামধনুর দেশে
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আবিষ্কার করতে থাকেন। বিশাল হ্রদ, বিরাট জলপ্রপাত, অজানা পর্বতরাজি এবং অনাবিষ্কৃত নদ-নদী—এসব দেখতে-দেখতে তিনি চ'লে যান। আজ সমস্তই লিভিংস্টোনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সত্যি বলতে কি, মধ্য-আফ্রিকা ভূভাগটি যে ইউরোপের কাছে আজ এত পরিচিত, এ কেবল সেই আদর্শবাদী মিশনারীটির জন্যই। রোগে তিনি বিবশ, দুর্বলতায় শীর্ণ—তবু তিনি বনে-বনে, পর্বতে-কান্তারে এবং পথে-পথে ঘুরেছিলেন।

বহুদিন এইভাবে অতিবাহিত করার পর লিভিংস্টোন্ তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সার্থকতার পথে এগিয়ে আসেন। মধ্যদেশের দুর্গম অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যাবার পথে তাঁর একমাত্র চিন্তা হোলো, যদি সমুদ্রের সঙ্গে কোনো একটা পথের যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়! সেই পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি জগতের অন্যতম বিস্ময় আবিষ্কার করেন।

সেখানকার আদিম অধিবাসীরা কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না, তারা যেমনই নিঃস্পৃহ, তেমনি নিরাসক্ত। কিন্তু তারাই মধ্যে-মধ্যে লিভিংস্টোন্‌কে বলতো, অমুক অঞ্চলে এক রকম ধোঁয়া দেখা যায়, কিন্তু সেই ধোঁয়ার ভিতরে কেমন যেন একটা সুরের ধ্বনি শোনা যায়! ব্যাপারটা কি, তা তারা কিছু জানে না। লিভিংস্টোন্ সেই অঞ্চলে যাবার সুবিধা পেয়ে এবার সেখানকার তদন্ত আরম্ভ করেন।

প্রথম সেই বিরাট জলপ্রপাতের দৃশ্য-বর্ণনায় লিভিংস্টোন্ বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় দীর্ঘ বাষ্পোদ্গম—সেটা বাস্তবিকই ধোঁয়ার মতন। আফ্রিকায় যেমন মাঝে-মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের আগাছায় আগুন জ্বালানো হয়—ঠিক সেই রকম এই ধূম্রবাষ্প পাঁচ-ছয় মাইল দূর থেকে নজরে পড়ে। ধীরে-ধীরে দেখা যায়, সর্বসমেত পাঁচটি দীর্ঘকায় বাষ্পের মণ্ডলী ওপর দিকে উঠে বাতাসের দিকে প্রবাহিত হয়,—সেগুলি যেন নীচের দিকে বিশ্রাম ক'রে রয়েছে বৃক্ষ-জটলার সীমারেখায়! ধূম্রমণ্ডলীর অগ্রভাগ মিশে গেছে মেঘের সঙ্গে। নীচের দিকে সেগুলো শাদা, ওপর দিকে ছায়াময় কালো, সুতরাং ধোঁয়ার মতন দেখা যায় বৈ কি!

লিভিংস্টোন্ অভিভূতের মতন ধীরে-ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন।

● যাযাবরের দেশে
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বিহঙ্গ-কাকলী গানের সঙ্গে দূরের সুরের ঝঙ্কার, রঙীন মেঘের দল, জলকণিকার সস্নেহ স্পর্শ—মনে হয়, তিনি যেন স্বর্গের পারিজাত-কাননের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলেছেন।

পারিপার্শ্বিক ভূভাগের সৌন্দর্য কী অপরূপ! নদীর দুই তীরে বৃক্ষলতাবিতান ও বিচিত্র সুন্দর সুগন্ধ ফুলের কী শোভা—আর মাঝে-মাঝে সেই জাম্বেসি নদীর মাঝখানে ছোট-ছোট সুন্দর খেলা-ঘরের দ্বীপ। তিনি একটি ছোট নৌকাযোগে নদীর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। ভাসতে-ভাসতে এক সময় সেই বিশাল জলপ্রপাতের ঠিক ওষ্ঠপ্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তিনি সেই জায়গার বর্ণনা ক'রে বলেন, প্রায় আধ মাইল চওড়া একটি জলস্রোত প্রায় একশো ফিট উঁচু থেকে সেখানে দুরন্ত বেগে নেমে এসে সহসা একটি পনেরো-কুড়ি গজ খাদার মধ্যে ঢুকে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে ছুটছে!



দেখলেন, জলপ্রপাতটি অন্তত এক মাইল চওড়া। [পৃঃ ১৮০

তাঁর সেই অভিভূত অবস্থা কেটে যাবার পর তিনি প্রথম দিন সেখানে থেকে ফিরে

আসেন। দ্বিতীয় দিন আবার তার ধারে যান। এবার দেখলেন, জলপ্রপাতটি অন্তত এক মাইল চওড়া, এবং সেটি নামছে কম-সে-কম চারশো ফিট উঁচু থেকে, এবং এক একটি ফাটলের জল প্রায় একশো ফিট বিস্তৃত। সমস্ত জলধারাটা ত্রিশ-চল্লিশ গজ নালার ভিতর দিয়ে দৌড়য়—তারপরে সেটি ক্রমশ বিস্তীর্ণ হয়ে নদী সৃষ্টি করে। সমস্তটাই সরীসৃপের মতন আঁকাবাঁকা, ঘোরাফেরা। যখন সেই জল আছড়ে পড়ে, তখন সেটা শুভ্র তুষারের মতো ফেনার সৃষ্টি করে। চারিদিকে রক্তবর্ণ পর্বতের গায় একটি পটভূমিকার মতো দেখায়—এবং তাদেরই চতুষ্পার্শ্বে নীল সবুজবর্ণের বৃক্ষলতা ও শাকসব্জির অপরূপ সমারোহ! লাল, গোলাপী, ঘন লালাভ পীত—ইত্যাদি বর্ণের অফুরন্ত শোভাযাত্রা। লিভিংস্টোন্ এই মনোরম দৃশ্যের অবতারণা ক'রে বলেছেন, হয়ত অপ্সরী-কিন্নরীরা এইখানে এসে বিচরণ ক'রে যায়!

একদিন লিভিংস্টোন্ সমুদ্রগামী পথ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তার সেই আবিষ্কারের ফল হোলো, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা সুবিধা পেয়ে সেই পথে ক্রীতদাস চালান দিতে লাগলো। সেখানে দিকে-দিকে সেই ব্যবসায়ীদের অনাচার আর উৎপীড়নের চিহ্ন দেখে তিনি অতিশয় বেদনা বোধ করেন—তিনি নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হন।

এই প্রকার দুরবস্থা, তার ওপর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। মানুষের কল্যাণের কাজে এসে তিনি দেখেন, কল্যাণ অপেক্ষা অমঙ্গলই প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক আঘাত পান, যেদিন তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ জাম্বেসি নদীর তীরে সমাধিস্থ করেন। সুতরাং ভগ্নমনে তিনি সদলবলে আর একবার আফ্রিকা ত্যাগ করেন। আর কোথাও কোনো সুবিধা না পেয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব জাহাজখানি নিজের হাতে চালিয়ে ভারতের উপকূলে বোম্বাই বন্দরে নিয়ে আসেন। তখন সমুদ্রপথে অভিযান করার জন্য দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি,—ডাঃ লিভিংস্টোন্ আকাশের তারকা ও জ্যোতিষ্কলোকের গ্রহ-উপগ্রহ বিচার ক'রে নির্ভুল পথে ভারত-সাগর পেরিয়ে আসেন।

আবার পুনরায় তিনি বিলাত হয়ে আফ্রিকায় ফিরে যান, কারণ, আফ্রিকার নিঃশব্দ

আহ্বান তিনি ভুলতে পারেননি। কিন্তু সেই তাঁর শেষ যাত্রা। দুর্ভাগ্য, বিপদ, উৎপীড়ন, দুর্যোগ—এসব তাঁকে ছাড়েনি, কিন্তু তাঁর অদম্য প্রাণ, অপরিমেয় অধ্যবসায়। এবারের অভিযানও তাঁর নানা ঘটনাবহুল। কিন্তু এই সময় তার শরীর ভেঙে পড়ে।

সেটা বর্ষাকাল, চারিদিক স্যাঁতসেঁতে এবং জলে ডোবা,—তার ওপর হাড় দুর্বল। লিভিংস্টোনের অনুচরেরা বিধিমতে তার সেবা করে, তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা পায়। তারা ডালপালা ও বাঁকারির সাহায্যে একটি খাট প্রস্তুত ক'রে তাকে শোয়ায়, আর পাহারা দেয়। কিন্তু এই মহৎ জীবনের অন্তিমকাল তখন ঘনিয়ে এসেছিল। অবশেষে একদিন শেষরাত্রে চারটের সময় তার একটি সেবক উঠে দেখে, লিভিংস্টোন সেই বিছানার ওপর উপুড় হয়ে হাত দুটি জোড় ক'রে প্রার্থনার ভঙ্গীতে প'ড়ে আছেন, কিন্তু তখন তিনি পরলোকগত।

আফ্রিকার সেই দুর্গম অরণ্যলোকে লিভিংস্টোনের সমাধি এখনও রয়েছে একটি গাছের তলায়,—সমগ্র আফ্রিকা সকৃতজ্ঞ আনন্দ-বেদনায় তার সমাধির কাছে এখনো এসে দাঁড়ায়। তার হৃদয় ওখানকার মাটির নীচে আজও প্রোথিত রয়েছে।

লিভিংস্টোনের নশ্বর দেহ গেছে ইংলণ্ডে। কিন্তু সেই দেহ,—শুধু আত্মাহীন দেহ! তার সত্তার পরম প্রকাশ রয়ে গেছে সুদূর আফ্রিকার সমগ্র আকাশ-বাতাসে।

আঁধারে আলো

● হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই! বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, সকলেই আমার ভাই!

—স্বামী বিবেকানন্দ

সুদূরের বাণী

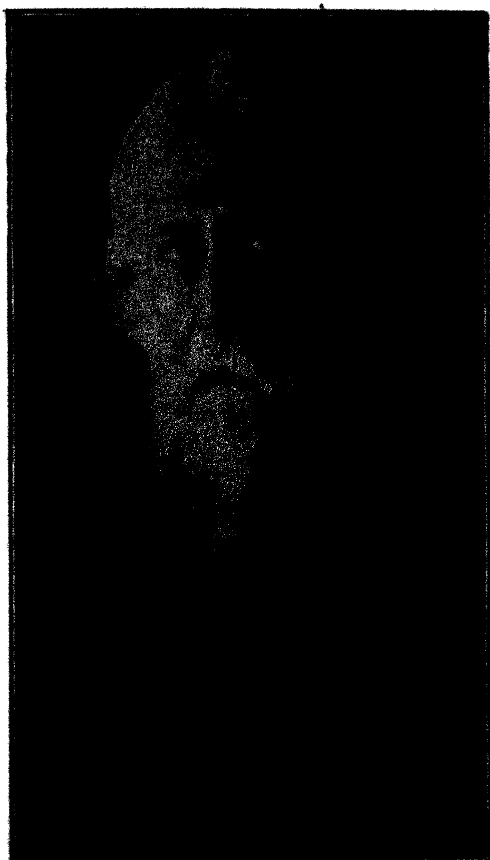
অন্তরের প্রার্থনা

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ-ক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে!
সাত কোটী সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননি,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি!

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলপনা—



কবিতা-কুঞ্জে চিত্র-বিলাসী
আত্ম-গগন-রবি,
আঁকি তোমারে ধরে' আলপনে,
কুঞ্জ-বিহারী কবি।



বন্য

—শ্রীসুকুমার দে সরকার

মাটি-কাটার কাজ নিয়ে সেবার সাঁওতাল পরগণায় ছিলাম। জরীপ হয়ে গেছে, —মাটি ত নয় যেন বলিষ্ঠ কোন দৈত্যের রক্তাভ মাংস-পেশী। দৃঢ় কঠিন, লাল কাঁকর মেশান এক-একটা চাঙড়। রাস্তা বেরোচ্ছে ঢেউ-খেলিয়ে অ জ গ র-সর্পিল, শালবনের ভেতর দিয়ে, বনগুল্মের ওপর দিয়ে, দিগন্তে-হারিয়ে যাওয়া কাঁসাই নদীর কূল ঘেঁসে।

সেই সেবারেই শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। আলাপ বললাম না, কেননা আলাপ বলতে পরিচয় বোঝায়। আমি একজনের কিছু জানলাম এবং সেও আমার কিছু জানল—এই আদান-প্রদান নিয়েই পরিচয়। শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আমার সেভাবে আলাপ হয়নি—অর্থাৎ পরিচয়ের দান হয়েছে, প্রদান পাইনি: কিংবা হয়ত যা পেয়েছি, তার প্রকৃত অর্থ বুঝিনি। মানুষকে মানুষ বোধহয় অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারে।

সেইমাত্র তাঁবু খাটান শেষ হয়েছে। সাঁওতালী সন্ধ্যার উদাস আকাশ অসীম। পূরবীর মীড় টান যেন পৃথিবীর অন্তরের হাহাধ্বনি ব্যক্ত করছে। কাঁসাইএর চালু

তটে একটা পাখী টি-টি করে ডাকছে। কুলীরা আগুন জ্বালাচ্ছে, তাঁবুর ভেতর বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময় তাঁবুর ধারে যেন কার অস্তিত্ব অনুভব করলাম!

"কে? কে ওখানে?"

নতশির, দীর্ঘদেহ, ঋজু গৌরকায় এক বৃদ্ধ তাঁবুর পরদা ঠেলে এসে সামনে দাঁড়াল।

"আমার নাম শ্রীনাথ ভট্টাচার্য।"

কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

"বাঙ্গালী?"

"আজ্ঞে হাঁ।—এসব পরগণাও একদিন বাংলার ভেতর ছিল।"

"কি চাই আপনার?"

"কাজ।"

"কি কাজ পারবেন আপনি?" কাশফুলের মত সাদা মাথার দিকে চেয়ে বললাম।

"সামনের বনের ভেতর দিয়ে আপনার রাস্তা যাবে। ও-বন আমার জানা।"

"কিন্তু কি কাজ পারবেন আপনি?"

"মাটি কাটা।"

হেসে উঠছিলাম, হঠাৎ চেয়ার শুদ্ধ আমার দেহটা শূন্যে উঠে গেল। দেখি, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য আমাকে শুদ্ধ চেয়ারটা খানিকটা তুলে ধরেছে আর যেন ঠিক চেয়ারের নীচে থেকে ছুটো কালো সাপ হিস-হিস্ করতে-করতে বাইরে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটেনি। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে চেয়ারটা নামিয়ে দিয়ে বিনীত গম্ভীর স্বরে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য বলল, "ভয় পেয়েছে। ভয় না পেলে কিছু বলে না; বোধহয় বেরোতে পারছিল না।"

"সাপ?"

"আজ্ঞে হাঁ। গোখ্রো।"

অদ্ভুত সন্ধ্যাটা থমথমিয়ে জমে উঠল। বিগত বিপদের সূচনায় নয়, শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের আবহাওয়ায়।

"আপনি ব্রাহ্মণ?"

"ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম।"

"লেখাপড়া জানেন ?"

"যা জানতাম ভুলে গিয়েছি। নতুন করে শিখছি আবার।"

"এই জঙ্গলে নিবান্ধব নিরালায় কি শিখছেন ?"

হাতটা ঈষৎ হেলিয়ে ভট্টাচার্য বলল, "এই সব।"

কাঁসাইএর ওপর থেকে ভেসে আসছে রহস্যময় উদাস শব্দ। শালবনে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। রক্তাভ অন্ধকার ধীরে-ধীরে আকাশের পরদায় যবনিকা টেনে দিচ্ছে।

শ্রীনাথ ভট্টাচার্যকে কাজে বাহাল করলাম।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও লোকটার অদ্ভুত শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় সামান্য পেয়েছিলাম। দরকার হলে গাঁইতি চালাতে ভট্টাচার্য জোয়ান সাঁওতালী কুলীর চেয়ে কম যেত না। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতার চেয়ে তার চোখে কি যেন ছিল। কুলীরা দুদিনেই তার অদ্ভুত বশ হয়ে পড়ল। তার যা কাজ সে সুসম্পন্ন করে দিয়ে যেত কিন্তু সন্ধ্যার পর আর ভট্টাচার্যকে পাওয়া যেত না। কর্মক্লান্ত দিনের পর মানুষ খোঁজে শুধু দেহের নয় মনেরও অবসর। কতদিন ডেকেছি, "ভট্চাজ্ মশাই, আসুন আজ একটু দাবা খেলা যাক্।"

একটু হেসে ভট্টাচার্য জবাব দিয়েছে, "ভুলে গেছি সরকার মশাই।"

"আসুন না শিখিয়ে দেব।"

"এ বয়সে আর ও শিখতে চাই না।"

একটু বিরক্ত স্বরেই বলেছি, "ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে যাবেন দয়া করে ?"

একদিন মেট কুলী মাপুরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "সন্ধ্যের পর ভট্টাচার্য কি করে রে ? পূজো-আচ্চা করে বুঝি ?"

"পূজো কুথায় বাবু ? হুই বনের ভেতর সেঁদিয়ে যায়।"

"বনের ভেতর ? রাত্তিরে ! কেন রে ?"

"কি জানি বাবু !"

● বন্ধ
[illegible]কুমার দে সরকার

আমাদের রাস্তা সেবার অপেক্ষাকৃত ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে। দুধারে শালের সার আর মাঝে-মাঝে তাদের টেকা দিয়ে ছড়িয়ে আছে সরল ইউক্যালিপ্‌টাসের দল। রাত্রে অদ্ভুত স্তব্ধতা, অদ্ভুত বন্য কোলাহল! সেবার বড় ভাল্লুকের উপদ্রব হয়েছিল। প্রায়ই ভোরে উঠে কুলীদের হৈ-চৈ লেগে যেত। কার ছাগলটা গেছে, কার মুরগীগুলো রাতারাতি সাবাড়। কুঁড়েঘরগুলোর আশেপাশে ভাল্লুকের পায়ের বড়-বড় ছাপ। সহর থেকে লাইসেন্স করে এক যোড়া রাইফেল আনিয়ে নিলাম। ভট্টাচার্য্য দেখে বললে, "শুধু-শুধু যেন ওগুলো ব্যবহার করবেন না সরকার মশাই। বনের খোলা জানোয়ার মানুষের বিচার-বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি।"

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, দূরের নীলাভ পাহাড়গুলোর ওপর মেঘের ছায়া পড়ছে, উড়ে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে। ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে আকাশ। শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁবুর পরদা ঠেলে ঢুকল।

"ভাল্লুক মহুয়া ফুলের মধু খাচ্ছে দেখবেন সরকার মশাই?"

লাফিয়ে উঠে রাইফেলটা টেনে নিচ্ছিলাম।

"ওটা থাক্ না।" ভট্টাচার্য্য হেসে বলল।

রাইফেলটা নিয়ে দাঁড়ালাম, "কোথায়?"

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে ভট্টাচার্য্য বলল, "আপনি দেখতে পাবেন না সরকার মশাই!"

যেমন এসেছিল বেরিয়ে গেল শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য।

সেদিন ভোরে মাথুরার জ্বর এল কাঁপিয়ে। বনে তখন বর্ষা নেমেছে। কাঁসাইএর ওপারে কে যেন বৃষ্টির সাদা পর্দ্দা টেনে দিয়ে গেল!

সারাদিন ভট্টাচার্য্যের দেখা নেই। মাথুরার জ্বর বেড়ে চলেছে। চোখ দুটো ঘোর লাল, ভুল বকে চলেছে আর মাথা চালছে। সন্ধ্যেবেলা সে বেহুঁস হয়ে পড়ল। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, সন্দেহ নেই। ডাক্তার হতাশ হয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যের পর কাকের মত ভিজে ভট্টাচার্য্য ফিরল, হাতে একরাশ কিসের শেকড়।

● বড়

[illegible] সরকার

সেই শেকড়গুলো গরম জলে ফুটিয়ে মাথুরাকে খাইয়ে দিতে বলে বলল, "ভাল হয়ে যাবে, ভয় নেই।"

"কি বলছেন ভট্চাজ মশাই ? ডাক্তার যে আশা দিলে না !"

"ভাল হয়ে যাবে।" এমন একটা স্বরে বলল সে যেন কিছুই হয়নি !

তাঁবুতে ফিরে এসে ডেক্-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিলাম। সারাদিনের ক্লান্তি, তার ওপর মাথুরার মুখের আসন্ন করাল ছায়া মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হঠাৎ মনে হোল, তাঁবুর ভেতরের কোণটায় একটা কালো ছায়া যেন নড়ে উঠল !

ভয়ের শিহরণ মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ এনে দিল। এক লাফে রাইফেলটা টেনে নিলাম।

তাক্ করেছিলাম কিনা জানি না। ভাল্লুকটা যেন তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর। একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ কানে এল যেন করাল ক্রুদ্ধ গর্জন ! তারপরে রাইফেলের বধির-করা শব্দ। কালো ছায়াটা বিদ্যুতের মত বেরিয়ে গেল।

সম্বিৎ ফিরে এল লোকজনের কোলাহলে। তার মধ্যে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের গলা কানে এল।

"ভাল্লুক ঢুকেছিল বুঝি ? কিছু বলত না সরকার মশাই, আপনিই বোধ হয় ভয় পেয়েছিলেন !"

রাগ চড়ে গেছে তখন মাথায়।

"আপনি থামুন। ভাল্লুকের হয়ে ওকালতি করবেন ত লোকালয়ে না থেকে ভাল্লুকের সঙ্গে বসবাস করলেই পারেন !"

"বর্ষার দুর্যোগে" ভট্টাচার্য্য বলে চলল, "তৈরী আশ্রয় দেখে ঢুকেছিল। জানোয়ার কিনা ! ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের ডেরা চেনেনি।" তারপরে লাইটটা টেনে নিয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়ে বলল, "চোট খেয়েছে দেখছি। রক্ত !"

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য বেরিয়ে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে ক্যাম্পখাটের ওপর চাদরটা মুড়ি দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম !

● গল্প

[illegible] দে সরকার

হঠাৎ মনে হোল মুখের ওপর গরম নিঃশ্বাস ফোঁস্-ফোঁস্ করছে। বুকের ওপর তীব্র একটা ভার। একটা পাশবিক বন্য গন্ধ আমার নিঃশ্বাস প্রায় রোধ করে ফেলেছে। দুই থাবার মধ্যে জাপটে ধরেছে আমায় ভাল্লুকটা।



তার পায়ে লতাপাতা দিয়ে কি বাঁধছে! [পৃঃ ১১১

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম। রাইফেলটা নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলাম। ছেঁড়া মেঘের ভেতর দিয়ে শেষ রাত্রের স্তিমিত পাণ্ডুর চাঁদ দিগন্তে হেলে



[illegible]

পড়েছে। দূরে একদল শেয়াল হোকা-হোয়া হেঁকে শেষ প্রহর জানিয়ে গেল। পৃথিবী তখন কালো সমুদ্রের ভেতর থেকে আলোর দিকে মুখ ফেরাচ্ছে।

দৃঢ় হাতে রাইফেলটা ধরে বনের ভেতর এগিয়ে চললাম। অদ্ভুত রহস্যময় বন যেন সেদিন আমায় যাদু করেছিল! গাছের পাতা বেয়ে টুপ্‌টাপ্‌ করে থেকে-থেকে জল-ঝরার শব্দ যেন ছেলেবেলার লুকোচুরি খেলার টু-দেওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল! কুচি-ফুলের ভেজা গন্ধ এক-এক জায়গায় মাতিয়ে তুলেছিল।

সেই আলো-আঁধারীতে মনে হোল, সামনে কি যেন নড়ে উঠল! তারপরেরটুকু উপকথা শোনাবে। তবু যা ঘটেছিল, নিছক সেইটুকু বলেই শেষ করব।

তোলা রাইফেল আপনি নেমে গেল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের কোলের ওপর পা তুলে দিয়েছে, আর ভট্টাচার্য্য এক মনে তার পায়ে লতাপাতা দিয়ে কি বাঁধছে!

ভাল্লুকটার একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ শুনে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, তারপর যেন সে আমাকেই আশা করছিল এমনিভাবে বললে, "একটা পায়ে গুলি লেগেছে। ভেঙ্গে গেছে পাটা। ভাল হয়ে যাবে।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, "আপনি যান সরকার মশাই! আহত জানোয়ার তার শত্রুকে কখনো ভোলে না। শুধু-শুধু রাইফেলের গুলি খেয়ে মরবে।"

নিঃশব্দে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। বাঁধা শেষ করে ভট্টাচার্য্য উঠে দাঁড়িয়ে মুখে কি যেন একটা শব্দ করল। তারপরে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল বনের ভেতর। পেছনে তার নেংচাতে-নেংচাতে আর গরর্‌ গরর্‌ শব্দ করতে-করতে পোষা কুকুর-ছানার মত ভাল্লুকটাও মিলিয়ে গেল। বন তাদের গ্রাস করে নিল।

সেই থেকে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের আর দেখা পাইনি।

তাঁবুতে যখন ফিরে এলাম, মথুরা এসে সেলাম করে দাঁড়াল। সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে।



—শ্রীমতী আশালতা সিংহ

সেজমামার বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি এসেছে, জোর তাগিদ, যেতেই হবে। আমরাও যাচ্ছি, ওদিকে সেজমামাও কলকাতা থেকে বিয়ের ছুটি নিয়ে যাচ্ছে; সাঁইথিয়াতে দেখা। এক কলাওয়ালার কাছে মামা কলা কিনছে প্ল্যাটফর্মে। সাঁইথিয়ায় গাড়ী বদল করে এই গাড়ীতেই আমরা উঠ্‌বো। আমাদের দেখে নির্মল-মামা ওরফে সেজ-মামা যেন হাতে স্বর্গ কিংবা তার চেয়েও বেশি—ধড়ে প্রাণ পেল। একমুখ অকৃত্রিম আনন্দের হাসি হেসে বললে, তোরা এসেছিস? আঃ! বাঁচলাম। কী যে এক মহা দুর্ভাবনায় পড়েছিলাম, বলতে পারিনে।

নির্মল-মামা এই বছর ডাক্তারি পাশ করে হাউস-সার্জেন হয়ে রয়েছে কলকাতার মেডিকেল কলেজে। কিন্তু তার এতই নার্ভাস স্বভাব ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও যে, সে কথা বলে শেষ করা যায় না।

একটু হেসে বললাম, বিয়ে করতে যাচ্ছ, তা, এমন একা কেন? আর এত রাজ্যের ভাবনাই বা কিসের? বেশ হাসিখুসি মুখে যাবে, তা না……

আমাদের মধ্যে মামা-ভাগ্নী বলে কোন সংকোচের দূরত্ব ছিলো না। আমি কলকাতার মেয়েদের কলেজে ইংরিজীতে অনার্স নিয়ে বি, এ, পড়ি। সেজমামা প্রায়ই দেখা করতে যায়, তার সঙ্গে অবাধে সবরকম গল্প-গুজবই করি। এমন ধরনের

ছুটিতে বাড়ী এসেছিলাম, সেখান থেকে মামাবাড়ী যাচ্ছি বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে। সঙ্গে মা আর ছোট ভাই নীরেন আছে। রাস্তায় এভাবে মামার দেখা পেয়ে ভারি মজা লাগ্‌লো।

সেজমামা নিজের মাথায় করুণভাবে একবার হাত বুলিয়ে বললে, মাথার এই বিপুল টাকের জন্যে একটা গান্ধী-টুপি সর্বদা ব্যবহার করি জানিস তো। আর অনেক-দিন থেকেই খদ্দর ছাড়াও আর কিছু-একটা বড় ব্যবহার করতে প্রাণ চায় না। এদিকে এই কাণ্ড—দেখ না, বলে পকেট থেকে ভাগলপুরের এক প্রকাণ্ড চিঠি বার করে দিলে।

চিঠিতে আমার অন্য সব মামারা বিপুল হর্ষভরে লিখেছে যে, নির্মল মামা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামা-মাত্র তারা তাকে কী বিরাট অভ্যর্থনা করবে। এক ডজন ফুলের মালা, ব্যাণ্ড, ব্যাগ্‌-পাইপ, সানাই, ফুল, লতাপাতা দিয়ে সাজানো মোটর কিছুই বাদ যাবে না।

চিঠি পড়ে হেসে বললাম, তা, এতে আর এত বিমর্ষ হবার কী আছে? বরঞ্চ আনন্দ ক'রো। তোমার জন্যেই এত আয়োজন!

মামা বললে, আনন্দ করি! আর এদিকে এই গান্ধী-ক্যাপ, আর খদ্দরের এই জামা-কাপড়, লোকে একটা কংগ্রেস-নেতা মনে করে বসে থাক্। ফুলের মালা, ব্যাণ্ড, প্রসেসন্! কিছুই তো বাদ নেই কর্দে।

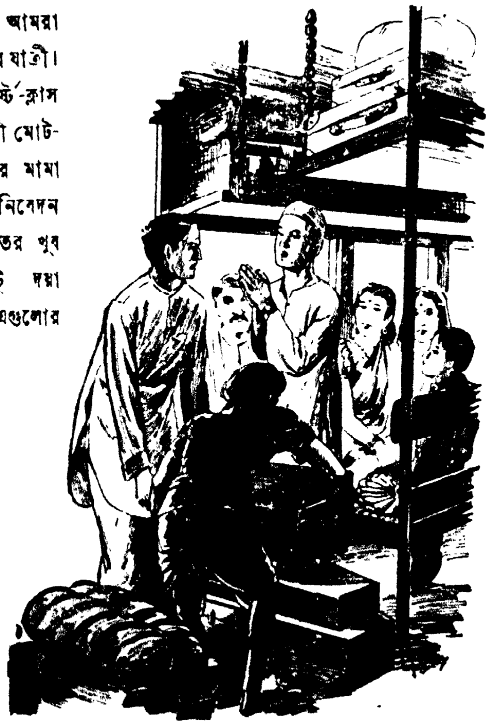
মা ছোট থেকেই সেজমামার ধরণ-ধারণ জানতেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, ভাবনা নেই, আমি সে-সব ব্যবস্থা করে দেবখন্। এখন তুই বলতো, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কলা কিনছিলি কেন? খিদে পেয়েছে বোধহয়? মুখখানি শুকিয়ে গেছে! আয়, আমি টিফিন-কেরিয়ার থেকে খাবার বার করে দিই। কলকাতা থেকে কিছু খেয়ে আসিস্ নি নিশ্চয়!

নির্মল-মামার সত্যি খুব খিদে পেয়েছিল। ভোর ছ'টার গাড়ীতে হাওড়ায় চড়েছে, কিছু খায়ও নি, সঙ্গে কিছু নেয়ও নি।

—দেখদিকি ছেলের কাণ্ড!—এই বলে মা কাঁচের প্লেটে নানারকম খাবার সাজিয়ে দিলেন।

● মামার কাণ্ড
শ্রীমতী আশালতা মিত্র

নির্মল-মামা সঙ্গে খাবার নিক্ বা নাই নিক্, নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়েছে কিন্তু। ব্যাঞ্জো, এস্রাজ, সেতার—কিছুই বাদ যায় নাই। যুদ্ধের সময় ট্রেণের ভীড় সর্বজন-বিদিত। তার উপর আমরা কেবল মাত্র ইন্টার-ক্লাসের যাত্রী। সেকেণ্ড-ক্লাস নয়, ফার্স্ট-ক্লাস নয়! এক-এক ঝলক যাত্রী মোট-ঘাট নিয়ে উঠ্ছে আর মামা করযোড়ে সকলকে নিবেদন করছে, এগুলো কলাজগতের খুব সূক্ষ্মতম বাহন! একটু দয়া রাখবেন। দয়া করে এগুলোর উপর বসবেন না, তাল সামলাতে পারবে না, বেচারাদের অতি সুকুমার আয়ু।—



"মশায়, এরা কলাজগতের অতি সুকুমার বাহন...... [পৃঃ ১৯৭]

মায়ের হাত থেকে মামা খাবারের রেকাবি-খানি নিয়ে সবেমাত্র লুচির ভিতর আলুর-দম্ ভরে এক কামড় দিয়েছে, এমন সময় ট্রেণের গতি মন্দীভূত হ'য়ে একটি বড় জংসন-ষ্টেশনে গাড়ী থামলো এবং পিল্-পিল্ করে অসংখ্য যাত্রী ট্রেণের এ-মুড়ো থেকে অন্য মুড়ো পর্য্যন্ত দিথিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো ট্রেণে কোন গতিকে একটুকু

জায়গা খুঁজে নেবার জন্যে। আমাদের এই কামরাতেও একটি দল উঠে পড়লো। সঙ্গে তাঁদের অসংখ্য বাক্স, তোরঙ্গ, পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি ইত্যাদি।

মামার আর খাওয়া হ'লো না। ব্যাঙ্কোর উপর কে একটি ভদ্রলোক তাঁর দশাসই রকমের প্রকাণ্ড এক তোরঙ্গ রাখতে যাচ্ছিলেন। খাবারের রেকাবি রেখে, হাত যোড় করে মামা স্থরু করলে, মশায়, এরা কলাজগতের অতি স্থকুমার বাহন······

ভদ্রলোক চোখ পাকিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন, আজকালকার এই যুদ্ধের বাজারে খাবার একমুঠো চা'ল, পরণের একখান কাপড় আর রেলগাড়ীতে সিকি ইঞ্চি জায়গা জোটাতে প্রাণ প্রাণান্ত, এখন ওসব কলা-ফলা বুঝি না মশায়! বরঞ্চ এই কলেরার সময় রাস্তায়-ঘাটে অন্য কোন রকম খাবারের পরিবর্তে কলাটা সেফ্‌লি (safely) খাওয়া চলতে পারে। ওপরে একটা খোসার আবরণ আছে কিনা, ভিতরটা বীজাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়! (জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে) এই কলাওয়ালা, ইধার আও। আনায় ক'টা করে দেবে বাবা, ঠিক-ঠাক বল দেখি! (জানালার বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, মামার দিকে মোলায়েম দৃষ্টিতে চেয়ে) ওই যে মশায়, আপনিও এক কাঁদি কিনেছেন দেখছি! আরম্ভ করে দিন।

মামা অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে ব্যাঙ্কো আর এস্রাজটা বেঞ্চির তলায় নামিয়ে রেখে যেন ভদ্রলোকের অনুরোধ রাখতেই সাইথেয়-কেনা কলার কাঁদি থেকে দু'টো ছিঁড়ে নিলে। আমার দিকে করুণ-নয়নে চেয়ে বললে, নীলিমা, তুইও দু'টো নে। নীরেনকেও দু'-একটা দে। কেনাই যখন হয়েছে!

বেঞ্চির তলায় কলার খোসা, পানের কস্‌, পোড়া বিড়ির টুকরো। এই নোংরা অসুন্দর আবেষ্টনে মামা তার প্রাণাধিক প্রিয় স্থকুমার কলার বাহন দু'টিকে রেখে মনে বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করছে, তা ওর মুখের পানে একটু নজর নিয়ে চেয়ে দেখলেই টের পাওয়া যায়। তাই ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, কি আর করবে বলো! আজকের এই জগতে স্থকুমার কলার কোন সমাদর নেই, তোমার ঐ যন্ত্র দুটোর চাইতে এখন···এখন······

ভেবে-চিন্তে খুব লাগসই রকম কি একটা যেন বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কথায়

● মামার কাণ্ড
শিল্পী আশালতা সিংহ

মাঝখানেই ওদিকের বেঞ্চি থেকে একটি অল্পবয়সী ছেলে শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্তে মামার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি বুঝি দেশসেবক কংগ্রেস-কর্মী? তাই মুখে আপনার সর্বদাই একটা ক্লান্ত করুণ ক্লিষ্ট ভাব! আর এই গান্ধী-টুপি, এ যেন দেশসেবার প্রতীক!

আমার ভাই নীরেন নিবিষ্ট মনে কলা খাচ্ছিল। সে আধখানা কলা মুখে পূরে বললে, না, মামা বিয়ে করতে যাচ্ছে কিন্তু মাথায় মস্ত বড় টাক। তাই সর্বদা বিমর্ষ হ'য়ে থাকে। ঐ টাকটা ঢাকবার জন্যেই গান্ধী-টুপি।

নীরেনটা এমন দুষ্টু! ভূ-ভারতে বুঝি এমন আর নেই! এমন মামার ভাগ্নী হ'য়ে গাড়ীশুদ্ধ লোকের কাছে কোথায় একটা শ্রদ্ধায় ভেজা নতি পাব, তা নয়, দুষ্টু ছেলে যা খুসি তাই বলে দিচ্ছে! কিন্তু ভাগ্যিস বাঁচোয়া, তার মুখে প্রকাণ্ড চাঁপাকলার অর্ধাংশ ছিল, তাই কথাগুলোর অর্ধেক মুখ-বিবরেই আটকে ছিল, তার উপর সে একটু তোত্‌লা তো আছেই। ছেলেটিও ওদিককার বেঞ্চিতে বসেছিলেন, কিছুই স্পষ্ট শুনতে পান নাই। আন্দাজি কিছু যেন বুঝেছেন এইভাবে নীরেনের দিকে চেয়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন, কি বলছো খোকা? তোমার মামার কথা? হ্যাঁ, তোমার মামা আমাদের দেশের গৌরব! এই এত তরুণ বয়সে দেশের জন্য এমন জীবন-মন-প্রাণ উৎসর্গ! সমস্ত সূক্ষ্ম সুকুমার বিলিতী বেশের অপরিসীম মোহ পরিত্যাগ করে এই বেশ…এই খদ্দরের টুপি……

নীরেনটা তখন কলা খাওয়া সম্পূর্ণ করে রুমালের অভাবে তার হাফপ্যান্টে হাত মুছতে-মুছতে আবার কি একটা বলবার উপক্রম করছে দেখে আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে চুপি-চুপি বললাম, ঐ দেখ বাক্সের উপর এ-মাসের 'মৌচাক'খানা রয়েচে। ধাঁধার জবাবটা ভেবে রাখ। পরশু পনের তারিখ না? ভাগলপুরে পৌঁছেই তোর জবাবটা পাঠিয়ে দেব। নাম বেরিয়ে যাবে। আর দেরী করলে ছাপার অক্ষরে নামটি খুঁজে পাবি না। এই অবসরে উত্তর বার করে রাখ।

পকেট থেকে পেন্সিল বার করে 'মৌচাকের' বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় নীরেন ধাঁধার জবাব বার করতে নিবিষ্ট হ'য়ে গেল। আমি ওদিককার বেঞ্চিতে উপবিষ্ট সেই

● মাথার কাজ
শ্রীমতী আশালতা সিংহ

ছেলেটির দিকে চেয়ে বললাম, হ্যাঁ, ইনিই আমাদের গৌরব এবং আদর্শের আশাদ্বল মামা। কিন্তু প্রত্যেক যুগের মহা মনীষীদের মত ইনিও নিজের মান-যশ এতটুকু চান না। বরঞ্চ কি করে নিজেকে লুকোবেন, তাই ভেবেই সর্বদা ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। এতবড় দেশপ্রেমিক, আজ এঁর আগমনবার্তা পেয়ে ভাগলপুরের উৎসাহী যুবকবৃন্দ প্রকাণ্ড একটি শোভাযাত্রা-সহযোগে আলোক, ফুলমালা এবং বাদ্যভাণ্ড-সহ এঁকে অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এঁর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, কেমন করে এ-সব এড়িয়ে যাওয়া যায়! তাই ভেবে ভেবে এক উপায় বার করেছি। এ উপায় বার করতে কম মাথা খাটাতে হয় নি।

ছেলেটির মুখ-চোখ দিয়ে শ্রদ্ধার জ্যোতি যেন ঠিকরে বার হচ্ছে! সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে মামার দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি সে উপায়? কিন্তু নাম-যশের প্রতি এই অত্যধিক ভীতি আর আত্মগোপনের প্রতি এই অপরিসীম প্রীতি,—সত্যিই মহা-পুরুষের লক্ষণ।

মামার আইবুড়ো-ভাতে দেবেন বলে মা নিজের ট্রাঙ্কে জরিপাড় চাদর, শান্তিপুরি ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর আঁচল থেকে চাবি খুলে নিয়ে আমি সেইসব বার করে দেখিয়ে বললাম, এই উপায়। এ-ছাড়া অন্য উপায় নেই। আত্ম-গোপনের জন্যে ক্ষণিকের তরে তাঁকে এই ভোল পরিবর্তন ক'রে বিয়ের বরটি সাজতে হবে। যাতে প্ল্যাটফর্মের উৎসাহী যুবকেরা গান্ধী-টুপি দেখে এঁকে আর দেশ-সেবক বলে চিনতে না পারেন।

বাক্স থেকে তোয়ালে, গামছা, সাবান, এসেন্স, স্নো, পাউডার যাবতীয় দ্রব্যাদি বার করে ছোট স্যুটকেসটায় কাপড়, জামা, চাদর এবং এই সমস্ত গুছিয়ে মামার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, যাও মামা, ওদিকের একটা খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় একবার চড়ো গিয়ে। এই তো সাহেবগঞ্জ এসে গেল। এখানে প্রায় ঘন্টাখানেক গাড়ী দাঁড়াবে। ফার্স্টক্লাসের কামরায় বাথরুমের কল খুলে দিয়ে স্নানটা সেরে বেশ পরিবর্তন করে এস। একটু এসেন্স দিতেও ভুলো না। লোকের চোখে ধুলো দিতে হ'লে ছদ্মবেশটা পুরোপুরি হওয়াই দরকার। এ তো আর তোমার বিলাসিতার

অন্যে নয়, এ তোমার আত্মগোপন। দেখো, ওটিন-স্নো আর ফেস্-পাউডারটাও একটু ব্যবহার করতে ভুলো না যেন! আয়না-চিরুণীও ওই স্যুট্‌কেসেই পাবে।

বাধ্য এবং বিনীত ভঙ্গীতে স্যুট্‌কেস হাতে মামা নেমে গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে গাড়ী ছাড়বার একটু আগে মামা যখন আমাদের এ কামরায় ফিরে এ'লো, তখন সত্যিই তাকে বিয়ের বরের মত দেখাচ্ছিল। কেবল গান্ধী-টুপিটা খুলে দেওয়ায়, টাকের অনাবৃত অংশটুকুতে মামা বারবার হাত বুলিয়ে ফেলছিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অল্পক্ষণ পরেই ভাগলপুর ষ্টেশন এসে গেল। আমার মামা-বাড়ীতে অনেক লোক। তার উপর সেজমামার বিয়ে খুব ধুমধাম করে হচ্ছে। কলকাতা থেকে তার বন্ধু-বান্ধবের দল তিন দিন আগে থেকে পৌঁছে গেছে, কেবল মামাই ডাক্তারি কাজে কিছুতেই ছুটি পায় নাই বলে এত দেরীতে আসছে। তাদের যে কথা সেই কাজ। ফুলের মালা, আলো, ব্যাণ্ড সমস্ত নিয়ে হৈ-হৈ করে তারা সব প্ল্যাট্‌ফর্মে হাজির! বিপুল কলরব করে তারা মামাকে নামালে, গলায় মালা পরিয়ে দিলে।

কামরায় সেই শ্রদ্ধাবনত-চিত্ত ছেলেটি এবং আরও অনেকে মুগ্ধ-বিগলিত দৃষ্টিতে এই দিকে চেয়ে ছিলেন। এবার আর কোন বচসা নয়, তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে হাতাহাতি করে মামার সুকুমার কলার যাবতীয় বাহন, এস্রাজ, সেতার, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি, এমন কি সাঁইথেয়-কেনা কলার অবশিষ্ট কাঁদিটিও সযত্নে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলেন। আমাদের ট্রাঙ্কগুলোও বাদ গেল না।

সকলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, এতবড় মহাপ্রাণ! কী গোপনতা! কী অদ্ভুত নির্জনে নীরবে আত্মদান! সেই ছেলেটি গদগদ-কণ্ঠে বললেন, কিন্তু এত করেও তো ভদ্রলোক নিজেকে ঢাকতে পারলেন না! ঐ তো সবাই গলে ফুলমালা পরাচ্ছে। ফুল ফুটলে সৌগন্ধ কি ঢাকা যায়? ভ্রমর আপনি ছুটে আসে।

যে ভদ্রলোক মামার ব্যাঞ্জোর উপর তোরঙ্গ চাপাতে গেছিলেন, তিনি মুগ্ধনেত্রে সেই তারের যন্ত্রটার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, আর এতবড় কর্মী হয়েও একজন উঁচুদরের কলারসিক! আমাদের দেশের দেশ-নেতারা এই দিকটাকে স্রেফ উপেক্ষা করেছেন। সেদিক থেকে এঁর বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়!

● বাবার কাণ্ড
শ্রীমতী আশালতা সিংহ

এখানেই যদি পঞ্চমাঙ্কের যবনিকা পড়তো, তাহলেই যেন ভালো হোত। ট্রেণটা ছাড়তেও বড় দেরী ছিল না, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব নষ্ট হয়ে গেল। মামার



খোলা টাকটার উপর কেবলই হাত বুলিয়ে যাচ্ছে !

কেমন কাণ্ড! অভিরাম বিমর্ষ মুখে যেন অসহায়ের মত খোলা টাকটার উপর কেবলই

হাত বুলিয়ে যাচ্ছে! মিছরি-মামা তাই দেখে বললে, ওরে ও-টাকের জন্যে অত ভাবনা কেন? সে ব্যবস্থাও আমরা করেছি। ও চাঁদু, দাও তো টোপরটা ওর মাথায় পরিয়ে! শাঁখ আনতেও ভুলিনি। আর মেয়েমানুষ না হ'লেও আমরা উলু দিতে শিখেছি।

সঙ্গে-সঙ্গে চাঁদু-মামা টোপরটি মাথায় পরিয়ে দিলে, শাঁখ বেজে উঠলো। চারিদিক থেকে উলুধ্বনি হ'তে লাগ্‌লো। কামরার লোকগুলির ছানাবড়ার মত দৃষ্টির দিকে চেয়ে নীরেন বললে, মামা বিয়ে করতে যাচ্ছে যে!

তাদের অবাক-চোখের সামনে দিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

এদিকে গাড়ীও ছেড়ে দিলে। ট্রেণ তো প্রায়ই লেট্ থাকে শুনি! আজ কি পাঁচ মিনিট আগে গাড়ীটা ছাড়তে পারলে না?

আঁধারে আলো

● যাহারা অধম-প্রকৃতি, তাহারা বিঘ্নের ভয়ে কোন নূতন কর্ম আরম্ভ করিতেই সাহস করে না; যাহারা মধ্যম-প্রকৃতি, তাহারা কর্ম আরম্ভ করিলেও বিঘ্ন দেখিলে মধ্যপথে বিরত হয়; কিন্তু যাঁহারা উত্তম-প্রকৃতি, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন-দ্বারা প্রতিহত হইলেও প্রারব্ধ কর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করেন না।

—বিশাখ দত্ত



পদ্মা ও মেঘনা

—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জলে জলে ওরে একাকার।
হারাল ধরার পারাপার।
আকাশে ও জলে মিতালি।
ধরা তুই কোথা মিলালি ?

মাটী নাই ওরে গাছ নাই।
আমরা মানুষ ভেসে যাই।
নদী আসে আর কত নদ।
কত সোজা পথ, বাঁকা পথ !

চলেছি চলেছি অবিরাম।
থির জল কভু উদ্দাম।
জলে জলে চোখ ধুয়ে লই।
জলের ধোঁয়ায় মিশে রই।

ঢেউ সাথে খেলি ভাই-ভাই।
কভু ঢুলি, কভু ছুটে যাই।
জল কোথা যায় ঠিক নাই।
আমি তারি সাথে শুধু ধাই।

ওরে জল, ওরে প্রিয় জল,
ওরে ছলছল, নিরমল,
ওরে তাপহরা সুশীতল,
ওরে লীলাভরা, খলখল,
তোর বুকে আজ দিয়ে বুক
জুড়াই এ প্রাণ যুগ যুগ।

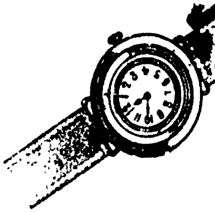
জুড়াই জুড়াই মিশে যাই,
জলে আমি, দেহে আমি নাই।
জলেতে আমাতে একাকার।
ধরা সাথে মেশে পারাবার।

আঁধারে আলো

- বাপ-মা তোমার যে নাম রেখেছেন, সে শুধু অন্য থেকে পৃথক করে ডাকবার উপায়। পৃথিবীর কাছে তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়ই হচ্ছে তোমার সত্যিকারের নাম।

—প্রাচীন পারস্য-উপদেশ

রিস্ট-ওয়াচ



—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঘটনাটাকে মিথ্যা বলতে পারলেই সুখী হতাম, কিন্তু যা আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাকে অস্বীকার করি কি করে? এবং অস্বীকার করতে পারছি না বলেই আজ এই লজ্জাকর কাহিনীর অবতারণা!

অনেকদিনের কথা। তখন জীবনের অন্ধকার অলি-গলিতে চোরা গহ্বরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভবিষ্যৎ জীবনের একটি সুদৃঢ় কাঠামো তৈরী করার স্বপ্নে বিহ্বল হয়ে একটি ছোট ছাপাখানা করে ছোট-খাট কাজ করি। আয় সামান্য,—এবং তারই বৃহদংশ ছাপাখানার ক্রম-বর্দ্ধমানে ব্যয় হয়ে যায়। অঙ্গে কোন বিলাস-আভরণ উঠবার স্বপ্নও তাই মনে জাগে না।

সেই রকম সময়ে একদিন আমার এক বন্ধু এলেন। প্রয়োজন তাঁর সামান্য—আমার জানা বিশ্বাসী কোন ঘড়ির দোকানে তিনি একটি রিস্ট-ওয়াচ সারাতে চান। ঘড়িটি তাঁরও নয়, তাঁর এক বন্ধু, সুবিনয়ের।

সুবিনয়বাবুকে আমিও চিনতাম। এককালে তিনি কোলকাতা সহরে থেকেই কোন এক রেলওয়েতে ভাল চাকরি করতেন। বন্ধুর কাছে শুনলাম, হৃদ্‌-রোগ হওয়ায়, কিছুদিন হলো রেলওয়ে থেকে তাঁর চাকরি গেছে—দারিদ্র্যের চরম-সীমায় তিনি নেমে এসেছেন।

সুবিনয়বাবুর কথা শুনে সত্যি দুঃখ হলো। নামের সঙ্গে চরিত্রের কোন বৈষম্য ছিল না বলে সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁর উপকার করবার সুযোগ পেয়ে, স্বেচ্ছায় ঘড়িটি সারিয়ে দেবার ভার নিলাম।

সারানো হলো, ঘড়িটি নিয়ে এলাম, অথচ বন্ধুটি আর আসেন না! কেমন যেন ইচ্ছা হলো—যে-কয়দিন বন্ধু না নিয়ে যান, সে-কয়দিন তো আমি ব্যবহার করতে পারি? আমার ঘড়ি নেই, অথচ একটা রিস্ট-ওয়াচ থাকলে কাজের কত সুবিধা!

ওয়াচটি হাতে বেঁধে নিলাম। সে এক নেশা—রিস্ট-ওয়াচ! কয়টা বেজেছে—হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি। ঘন-ঘন রিস্ট-ওয়াচের দিকে নজর চলে যায়—এক পুলকিত স্বপ্ন! অপূর্ব্ব এক ছন্দ-শিহরণ!

বন্ধুটি আসেন না। মাঝে-মাঝে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হয়—বন্ধুটি যদি না আসেন, বেশ হয়। কবে একটা রিস্ট-ওয়াচ কেনবার ক্ষমতা হবে, কে জানে? পরের ঘড়ি—তবু, আমার উপকারে তো আসছে!

এইভাবে দিন কাটে।

কাজের ভিড়ে শুধু গেঞ্জি গায়ে, রিস্ট-ওয়াচ হাতে ধারে-কাছে কতবার কত জায়গায় যে গেছি-এসেছি, তার ঠিক নেই। সে-সব আমি লক্ষ্যও করিনি কোনদিন। কিন্তু হঠাৎ সেদিন এক ব্যবসায়ী বন্ধুর রসিকতায় চমকে উঠলাম! রসিকতাটা আমার বেশ ও রিস্ট-ওয়াচ নিয়ে।

সত্যি তো, আমার এই পোষাক—আর তার সঙ্গে রিস্ট-ওয়াচ ঠিক খাপ খায় না! অথচ চাদর-পাঞ্জাবি পরে ছাপাখানার কালি-ঝুলি মাখার কাজও অচল। রিস্ট-ওয়াচটা খুলে ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখলাম।

টেবিলে তখন কাজের ভিড়। এক ভদ্রলোক এলেন কয়খানা বই কিনতে। বহু সময় নষ্ট করে, কয় আনা পয়সা দিয়ে বই দু'খানা তাঁর অন্যান্য জিনিষ-পত্রের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। কিছু সময় আবার অন্য কাজে ডুবে গেলাম। হঠাৎ কয়টা বেজেছে দেখার জন্য হাতের দিকে তাকালাম।

ঘড়ি সেখানে নেই! টেবিল খুঁজলাম—সেখানেও নেই! তন্ন-তন্ন করে সব খুঁজলাম, এমন কি দু'দিন আগে ছাড়া ময়লা জামার সব ক'টা পকেটও বাদ গেল না—কোথাও নেই! তবে কি সেই ভদ্রলোক (!)……

তখনই ছুটে গেলাম রাস্তায়। চৈত্রের পিচ-ঢালা তপ্ত-রাস্তা, চারদিক নিঝুম রাতের মত

● রিস্ট-ওয়াচ
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক

স্বরূ : যতদূর দৃষ্টি চলে, জন-মানব, পশু-পক্ষী কিছু নেই! ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চলে গেছেন। সমস্ত শরীর ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো—পৌষের নয়নাভিরাম শস্যক্ষেত্রের ছবি মনে-মাথায় অকস্মাৎ দেখা দিল। চোখের সামনে নেমে আসতে লাগলো এক অন্ধকার পটভূমিকা, সমস্ত বাতাস যেন এক মুহূর্তে পৃথিবী থেকে উবে গেছে!



সত্যিই তো, এই পোষাক—তার সঙ্গে চিট-ক্লাচ। [পৃঃ ২০০

বন্ধুটি এলে আমি কি বলবো? কি করে বলবো, তাঁর দরিদ্র বন্ধুর ঘড়ি আমি হারিয়ে ফেলেছি! হারিয়েছি আমারই চূড়ান্ত বোকামিতে, এবং তা হারিয়েছে শুধু আমারই একটি সুলভ সখ মেটাতে গিয়ে!

তার পরদিনই এলেন বন্ধুটি! কি-ই বা বলতে পারি? একে একে বলতে হলো সবই। জানালাম, ওর বদলে যে-কোন ঘড়ি কিনে দিতে আমি প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে ওয়েস্ট এণ্ড, সাইমা, লিম্‌টন, য়্যাংলো-সুইস্, ওমেগা—সব দোকানই ঘুরে এসেছি, কোথাও ঠিক ও-ধরণের ঘড়ি নেই।

বন্ধুটি প্রথমে ভর্ৎসনা করলেন। তারপর বললেন, সুবিনয়কে জানানো ছাড়া উপায় নেই; কারণ, অন্য ধরণের ঘড়ি দেখলেই তাঁর কাছে ধরা পড়তে হবে। কাজেই, পাপের বোঝা আর না বাড়িয়ে স্পষ্ট কথাই তাঁকে চিঠিতে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য কি ঘড়ি তাঁর চাই?

সুবিনয়বাবুর চিঠির জবাব এলো। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখছেন……"সব শুনে দুঃখ হলো, কিন্তু দোষ দেবো কাকে? তোমার বন্ধুকে বলো, তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আমার পক্ষেও সম্ভব হ'তে পারতো। কাজেই, অন্য কোন ঘড়ি আমার চাই না। যদি পারি, ভবিষ্যতে আমি নিজেই আর একটি কিনবো,—যদিও জানি এবং তুমিও ভাল করেই জানো, তেমন সুদিন আমার জীবনে আসা আর সম্ভব নয়; কিন্তু তা বলে তোমার বন্ধুর বন্ধুত্বের মর্য্যাদাকে আমি জরিমানার দায়ে কলঙ্কিত করারও পক্ষপাতী নই।"……

তারপর আরো বহুদিন কেটে গেছে। এমন সময় আমার সেই ভূতপূর্ব্ব ব্যবসায়ী বন্ধু হঠাৎ একদিন আমাকে একটি নতুন রিস্ট-ওয়াচ উপহার দিয়ে বসলেন।

ঘড়িটি হাতে নিয়ে চমকে উঠলাম! এক মুহূর্ত্তে চলে গেলাম ক্ষণ-বিস্মৃতির অন্ধকার-ঢাকা সুদূর অতীতে। এই ঘড়িটা দেখতে ঠিক সুবিনয়বাবুর সেই ঘড়ির মত!…নিজেরই কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো। কিন্তু এটা তো একেবারে নতুন! ঘড়িটি হাত পেতে নিলাম বটে, কিন্তু একটা দারুণ অস্বস্তিতে শরীর-মন পূর্ণ হয়ে রইল।

● রিস্ট-ওয়াচ
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সময়ে সবই সহ্য হয়। তারপর ধীরে ধীরে ঘড়িটিও হাতে সহ্য হয়ে এলো। সময়ের চাকা ঘুরতে লাগলো ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। আমার ছোট ছাপাখানা আজ আর ছোট নাই। সঙ্গে সঙ্গে



সুবিনয়বাবু কি কিছু সন্দেহ করলেন? [পৃঃ ২১০

অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি কত নতুন ও বিচিত্র পরিবেশে দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এককালে যে মেসে থেকে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতাম, সে কথাটা আজ যেন ভাবতেই পারি না!

● [illegible]

[illegible]

দেশ থেকে ফিরছি কোলকাতায়। মালপত্র সঙ্গে নাই, একা একটা ফাঁকা কামরার এক কোণে বসে আছি, চোখ বুঁজে রঙিন ভবিষ্যৎকে আরো রঙিন করে তুলছি। আচম্বিতে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ডাক শুনে চেয়ে দেখি, সুবিনয়বাবু!

তিনি এসে আমার পাশেই বসলেন। দুজনে কত কথা হলো। তাঁর বিচ্ছিন্ন জীবনের নানা কথা শুনে দুঃখের বোঝাই বাড়লো।

ঘড়ির কথা কিছুই হলো না। হঠাৎ বল্লেন—এই পরের স্টেশনেই নামবো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। ক'টা বাজলো?

অভ্যাস-মত হাত তুলে রিস্ট-ওয়াচ দেখলাম। ঘড়িটি দেখতে গিয়েই মনে হলো, সুবিনয়বাবু কি কিছু সন্দেহ করলেন? একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম—মুখে কি তাঁর কোন সন্দেহের চিহ্নও দেখা গেছে? তিনি কি কিছু ভাবলেন?

পরের স্টেশনে তিনি নেমে গেলেন।

মাত্র দশ মিনিট! যাঁর সঙ্গে জীবনে আর একদিনও দেখা হলো না, হয়ত আর হবেও না—তাঁর সঙ্গে ওই দশ মিনিটের জন্য দেখা হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? হয়ত তিনি ভেবেছেন, তাঁরই ঘড়িটা আমি ব্যবহার করছি সামান্য একটি মিথ্যা কথা বলে।

আমি জানি তিনি মহৎ। ও-কথা তাঁর মনেই আসতে পারে না। কিন্তু আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারি কি করে? তাঁর কাছে তো আমি চির-অপরাধী হয়েই রইলাম।

✿ ✿ ✿

আজও মাঝে মাঝে গভীর রাতে অভ্যাস-মত বাতি জ্বেলে ঘড়িতে ক'টা বেজেছে দেখি। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ওই ছোট্ট রিস্ট-ওয়াচটির বক্ষ-স্পন্দন শুনে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে, শরীরের সমস্ত রক্ত জমে নীল হয়ে আসতে চায়!



বিপদ

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মস্তবড় কাঠের নৌকাটা সারা গ্রামের বালক-বালিকাদের নিকট একটি বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে গত কয়েকদিন হইতে। চালানি কাঠের নৌকা, বড়-বড় গুঁড়ি পড়িয়া আছে নদীর ধারে, হাতীর মত বড়-বড় গুঁড়ি! কয়েকদিন হইতেই দেখিতেছে ডালু।

মা ডাক দেয়—ও ডালু, ও সান্টু, মুড়ি খেয়ে যা—

উহাদের দুজনের পাত্তা নাই! মা বলে—ওরা বসে আছে গিয়ে ছাখো সেই নদীর ধারে। শুধু খাবো আর গাঙের ধারে টো-টো করবো। কি বিপদেই পড়েছি এদের নিয়ে!

কিন্তু নৌকার মোহ হঠাৎ এদের পরিত্যাগ করে না। নদীর ধারে যেখানে

ঝিঙের ক্ষেতে বর্ষাকালের সন্ধ্যায় ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া আছে, সেখানেই বড় নৌকাখানা বাঁধা।

দেখিয়া-দেখিয়া ডালু-সান্টুর আর আশ মেটে না। অতবড় নৌকা গড়ায় কি করিয়া? কারা গড়ায়? নৌকার গোলুইয়ের দুপাশে দুটি বড়-বড় পেতলের চোখ। তার একটু ওপরে সিঁদুর লাগানো।

ডালু সান্টুকে বলে—নৌকো দেখলি?

—মস্ত বড়! আচ্ছা, ঐখানে চোখ কেন? নৌকো কি দেখতে পায় দাদা?



দুই ভাই হাঁ করিয়া নৌকা দেখিতেছে। [পৃঃ ২১০

—দূর বোকা! ও এমনি করে রেখেচে। সব নৌকোর কি চোখ থাকে? থাকে না।

—কি করে তুই জানলি?

—আমি তোর চেয়ে বড় যে! তুই কবে জন্মিচিস, আর আমি কবে জন্মিচি!

● বিপদ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন নদীর নীচু পাড়ে বসিয়া দুই ভাই হাঁ করিয়া দুই চক্ষু ভরিয়া নৌকা দেখিতেছে। নৌকার মাঝি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি নাম ?

—ডালু।

—উটি কেডা ?

—আমার ভাই সান্টু।

—কি জাত ?

—ব্রাহ্মণ।

—বাড়ী ক'নে ?

—এই গ্রামে।

—এসো, মোদের নৌকো দেখতি আসবা না ?

ডালুর খুব ইচ্ছা হইল নৌকা দেখিবার, কিন্তু মা যদি বকে! সাহস করিয়া উঠিতে পারিলে মজা হইত বটে, কিন্তু সাহস হয় না। এখন ঘাটে লোকজনের যাতায়াত, ইহাদের মধ্যে কেহ গিয়া মাকে বলিয়া দিতে পারে। এমন সময়ে আসিতে হইবে, যখন ঘাটে কেউ থাকে না। ডালু উদাসীন স্বরে বলিল—চল্‌রে সান্টু, বাড়ী যাই।

ভাইয়ের হাত ধরিয়া ডালু বাড়ী চলিয়া গেল।

পথের বাঁদিকে উঁচু ডাঙামত জায়গা, তাতে বড়-বড় আম-কাঁটালের গাছ। কোন-কালে এখানে ডিঙি-নৌকা আর বড় নৌকার কারখানা ছিল। অর্জ্জুন মাঝির কারখানা। কত ধরণের ছোট নৌকা, বড় মহাজনী নৌকা এখানে তৈরী হইত আগে—ডালু কারখানা দেখে নাই, দেখিয়াছে অর্জ্জুন মাঝিকে। মাজাভাঙা বাঁকাচোরা বুড়ো তেঁতুলতলার ঘাটে বসিয়া তামাক খায় আর মাছ ধরিবার ঘোয়াড়ি বোনে। কত ধরণের নৌকার গল্প ও নৌকা-ভ্রমণের গল্প করে অর্জ্জুন বুড়ো! ওর মুখে গল্প শুনিয়া পর্য্যন্ত নৌকার উপর তার অত্যন্ত মোহ। বড় মহাজনী নৌকা দেখিলে সে যেন কেমন হইয়া যায়!

সান্টু বলিল—দাদা, যাবি নে নৌকো দেখতে ?

—এখন না, সবাই চলে যাক ঘাট থেকে।

● বিপদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—ওরা নৌকাতে উঠতে বল্লে, উঠলি নে ?

—মা বকবে।

—আমাকে নিয়ে আসবি তো ?

—তুই আর আমি দুজনেই তো আসবো! সন্দেবেলা।

সান্টুর ভাল লাগিল না প্রস্তাবটা। সন্দেবেলা এই নদীর ধারে আসা যায় ? চিন্তে বাগদির ভিটের ঝাঁকড়া তেঁতুল-গাছটাতে হাঁড়াকাটার মা থাকে, ছোট-ছোট ছেলেকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গাছের মগডালে তোলে। সময়টা বড় খারাপ। সান্টু ভয়ের কথাটা দাদাকে বলিয়াই ফেলিল।

ডালু ধমক দিয়া বলিল—তুই বড্ড বোকা!

—কেন দাদা ? আর তুই বুঝি বোকা নস্ ?

—তোর মত না।

দিনের বাকি সময়টা কোনোরকমে কাটিল। ডালু ভাবে কখন যে সন্ধ্যা হইবে, কখন নৌকা দেখিতে পাওয়া যাইবে! কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না, ডালুর মন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। সান্টু অতশত বোঝে না। দাদা যেখানে, সেও সেখানে।

ডালু দুগাছা ছিপ লইয়া সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক আগে নদীর ধারে গেল। সঙ্গে চলিল সান্টু। বড় নৌকাখানা সেখানেই বাঁধা ছিল।

কাঠের নৌকায় মাঝি বলিল—খোকা, নৌকো দেখবা নাকি ?

ডালুকে দুবার বলিতে হইল না। সান্টুকে লইয়া তখনি সে নৌকায় উঠিল।

নৌকার মধ্যে কত কি যে জিনিস! মস্ত নৌকার খোলে লোকেদের বসিবার ও শুইবার জায়গা। রান্নার জন্যে উনুন আছে, হাঁড়ি আছে। বড় একটা বিলিতি কুমড়ো দড়ির শিকেতে ঝুলোনো।

মাঝিকে ডালু বলিল—তোমরা এখানে খাও ?

—হাঁ।

—কি রাঁধো ?

—যা পাই খোকা। আমরা গরীব লোক, কিনবার ক্ষ্যামতা নেই তো!

—আচ্ছা, তোমরা কত জায়গায় গিয়েচ ?

—তুমি চিনবে না সে সব জায়গা। বরিশাল জেলার নাম শুনেছ ? সেই বরিশাল জেলা !

—কি আছে সেখানে ?

—হাঙর আছে, কুমীর আছে, দুমুখো সাপ আছে। কত রকমের জানোয়ার আছে। লালমুখো বানর আছে। দু'মাথাওয়ালা তালগাছ আছে।

সান্টুর চোখ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে ডাগর-ডাগর হইয়া উঠিল। এমন কথা সে কখনো শোনে নি ! লালমুখো বানর ও দু'মাথাওয়ালা তালগাছ না জানি দেখিতে কি রকম ! সে বলিল—তালগাছে হাঁড়াকাটার মা আছে ?

—হ্যাঁ !

—হাঁড়াকাটার মা আছে তালগাছে ?

—সে আবার কি ?

ডালু বিজ্ঞের মত মুখখানা করিয়া বলিল—ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। কি বাজে কথা বলছে !

মাঝি বলিল—মস্তবড় কুমীর আছে সেখানে, বুঝলে ? তেমন কুমীর কখনো দেখোনি।

ডালু বা সান্টু কোনোদিন একটি অতি ক্ষুদ্র গিরগিটির মত কুমীরও দেখেনি, মস্তবড় কুমীর তো দূরের কথা ! দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল।

একজন বুড়ো মাঝি নৌকার গলুইতে বসিয়া বেগুন কুটিতেছিল। সে বেগুন-কোটা ফেলিয়া রাখিয়া এদিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও কি শুনচো খোকাবাবুরা ? আমি নিজের চোখে যা সাপ দেখেছি সুঁদর-বনের—

ডালু ও সান্টু উভয়েই অধীর আগ্রহে বলিল—কত বড় ?

—তালগাছের মত মোটা।

ডালু বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—উঃ রে ! আর কত লম্বা ?

—হাত ত্রিশ-চল্লিশ !

● বিপদ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডালু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল! এত বড় সাপ হয়, সে কখনো শোনেনি। সুন্দরবনের কাণ্ডই আলাদা! সত্যিই কি আশ্চর্য্য দেশ!

বুড়ো মাঝি গল্প করিতে লাগিল—সেবার সুঁদরবনে সুঁদরি-কাঠ আনতি গিইছিলাম। চোয়ামুখোর কাছারি থেকে তিন ভাটি গেলে তবে ভাঙনডাঙ্গার জঙ্গল, রাণীতলার জঙ্গল—বড্ড ভারি জঙ্গল। তারপর—

এখানে বৃদ্ধ গল্প বন্ধ করিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। ডালু-সান্টুর আর সহ্য হয় না, তামাক খাবার কি এই সময়? ডালু অধীর আগ্রহের সুরে বলিল—তারপর?

—তারপর আমরা খালে নৌকো নোঙর করে ভাঙনডাঙ্গার জঙ্গলে গিইচি মৌচাক ভাঙতি। একটা তালগাছের গুঁড়ির মত জিনিস এক জায়গায় পড়ে আছে। তার ওপর লতাপাতা। আমরা হেঁটে-হেঁটে থকে গিইছিলাম। যেমন বসলাম, অমনি দেখি নড়ে উঠচে! ওমা, তারপর দেখি সরে-সরে যাচ্চে গাছের গুঁড়িটা! তখন দেখি গাছের গুঁড়ি নয়, মস্তবড় সাপ নড়চে!

তখনি দেলাম ছুট্! হাঁ করে নিশ্বাস ফেলে সেই সাপে। প্রশ্বাস টানার জোরে ছোট-ছোট জানোয়ার এসে ওর মুখের মধ্যি ঢুকে যায়!

—তারপর কি হোল হ্যাগা?

—আবার কি হবে! পালালাম সোজা সোজা। আর কি সেখানে দাঁড়াই? বাঘও দেখিচি বড়-বড়—কিন্তু বাঘের চেয়েও সাপ বড্ড ভীষণ জানোয়ার, খোকাবাবুরা।

—কেন? বাঘের চেয়েও ভয়ানক?

—সাপ যে প্রশ্বাস টেনে নেয় কিনা? ঘাপটি মেরে থাকে জলের ধারে কোপ-ঝাপের আড়ালে। কেউ টের পায় না আগে থেকে, হঠাৎ টেনে নেয়। পাকে-পাকে জড়িয়ে ওর হাড়গোড় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলে বাবু! পিণ্ডি পাকিয়ে নেয় একেবারে!

বাহিরে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। কেরোসিনের ডিবিটা টিম-টিম করিয়া জ্বলিতেছে। ধোঁয়ায় নৌকার খোল প্রায় ভরিয়া আসিল। ডালুর গা

সে শিহরিয়া উঠিল! তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে, এখানে এ সন্ধ্যায় না আসিলেই হইত!

হঠাৎ সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

যখন ঘুম ভাঙিল, সে দেখিল নদীর ধার হইতে কিছুদূরে একটা আম-কাঠের বড় গুঁড়ির উপর শুইয়া আছে।

ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এখানে সে কেমন করিয়া আসিল?

সে দুই হাতে চোখ রগ[illegible]ইল। রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে। মাথায় [illegible]ড় ঝটপট্ করিতেছে, তারাভরা আকাশ।

সে এখানে কেন? নৌকা কোথায়? সান্টু কোথায়?

ডালু ছুটিয়া গেল নদীর ধারে। ওই তো সে বেনার ঝোপ নদীর পাড়ে। ওই-খানেই ওই বেনার ঝোপের মধ্যেই তো লোহার বড় নঙ্গর ফেলিয়া নৌকাটা দাঁড়াইয়া ছিল! সে নৌকা তো নাই! সান্টু কোথায়?

ডালু ভাইয়ের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

—সান্টু—উ-উ-উ—ও-ও সান্টু—উ-উ—

কেহ উত্তর দিল না। নৌকাই নাই, উত্তর দিবে কোথা হইতে?

ডালুর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল। নৌকাওয়ালারা সান্টুকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে নামাইয়া দিয়া ভাইটিকে লইয়া পলাইয়াছে। ছোট ভাইটিকে মারিয়া ফেলিবে হয়তো! ডালু ছুটিতে ছুটিতে আসিল।

ডালুর মা রান্নাঘরে কি কাজ করিতেছে, ডালুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এসো, তোমার পিঠের ছাল-চামড়া তুলি! বের করচি তোমার পাড়া বেড়ানো। সান্টু কই?

ডালু বলিল সব কথা। কাঁদিয়া বলিল—মা, সান্টুকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েচে। মেরে ফেলবে!

সে কি ভীষণ কান্না! কান্নার বেগে ডালু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মাও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

● বিপদ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন সময় বুকের পাঁজরে ঘা খাইয়া ডালুর কান্না থামিয়া গেল।

সে চাহিয়া দেখিল, বুড়ো মাঝিটা তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি বলিতেছে। সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো মাঝিটা।

ডালু বলিয়া উঠিল—সান্টু—আমার ভাই সান্টুকে কোথায় নিয়ে গিয়েচ?

—অ্যাঁ?

—চালাকি করো না! আমার ভাই সান্টু? কোথায় সে? মেরো না ওকে।

—আরে খোকাবাবু বলে কি? ঘুমের ঘোরে কি রকম গোঙাচ্চে আর বিড়বিড় করচে। এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি দেখচি!

নৌকার ও-খোল হইতে একজন মাঝি বলিয়া উঠিল—চকি জল ছাও। ছেলে-মানুষ স্বপন দেখেচে।

ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।—সেই নৌকা!

সেই নৌকার খোল! সেই বৃদ্ধ মাঝি তাহার সামনে। ওই তো সান্টু ঘুমাইতেছে! সান্টুই তো! সে ডাকিল—এই সান্টু, ওঠ্—ওঠ্—

দুই ভাই নৌকা হইতে নামিল। মাঝিরা বলিল—কি ঘুম রে বাবা! ছেলে-মানুষ সব। যাও খোকাবাবুরা, সাবধানে বাড়ী যাও। বড্ড অন্ধকার!

পথে আসিয়া ডালু ঠাস্ করিয়া ছোট ভাইকে এক চড় কসাইয়া বলিল—কেবল ঘুম, কেবল ঘুম! বাঁদর কোথাকার! আবার তোকে কোনোদিন সঙ্গে নিয়ে আস্‌বো, আসিস্ আবার। ঘুমুলি কি বলে নৌকোর মধ্যে তুই?

আঁধারে আলো

- গুণিগণের গুণই পূজাযোগ্য। স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদ বা বয়সের তারতম্য সম্মানের কারণ হইতে পারে না।

—ভবভূতি



নূতন ভৃত্য

—শ্রীনীলরঞ্জন দাশ, বি-এ

যুদ্ধের দিনে কত মুস্কিলে পড়ে যে মানুষ নিত্য !
সম্প্রতি আমি পড়েছি বিপদে লইয়া নূতন ভৃত্য।
কমলাকান্ত নামটি তাহার, কৃষ্ণবর্ণ দেহ ;
ডাকিলে তাহারে সাড়াটি পাবে না, ধীরে যদি ডাকে কেহ।
সে যে কানে খাটো, একথা কখনো স্বীকার করে না মোটে ;
কাজের হুকুম করিবামাত্র তামিল করিতে ছোটে।
একদিন তারে কহিনু আনিতে আমার নূতন 'জামা'—
ভাণ্ডার হ'তে তাড়াতাড়ি এনে হাজির করিল 'ধামা' !

আহারের পরে পান মুখে দিয়ে আনিতে বলিনু 'চুণ'—
পাক-ঘর হ'তে ছুটিতে ছুটিতে আনিল খানিক 'নূন'!
চাই যদি 'ঘড়ি', ছুটে তাড়াতাড়ি 'দড়ি' এনে দেয় হাতে ;—
'ছাতা'টি চাহিলে 'খাতা' আনে, আর পারি না তাহার সাথে!
একদা কহিনু—"বাজার হইতে কিনে আন্ 'চাল, আটা,' "—
কমলাকান্ত হন্তদন্ত নিয়ে এলো 'চার ঝাঁটা'!
বন্ধুরা এলে যদি বলি তারে আনিতে 'গরম চা'—
'খড়ম' আনিয়া হাজির করিবে, অথবা আনিবে 'দা'!
জরুরী পত্র লিখিয়া সেদিন করি' তারে সাবধান
কহিলাম—" 'ডাক-বাক্সে' এখনি ফেলে আয় চিঠিখান।"
তিনদিন পরে দেখি সেই চিঠি মোর ভাঙা 'হাতবাক্সে' ;—
তারে রাখা আর চলে না আমার, যেথা খুশি চ'লে যাক্ সে!

আঁধারে আলো

● হে ধনবান্! তোমার ঘরে যদি অন্ন থাকে, অর্থ থাকে মজুত,—আর তোমারই দেশ-ভাইরা যদি অর্থাভাবে, অন্নাভাবে মরে, তবে সে পাপ তোমাতেও অর্শাবে,—একথা স্মরণ রেখো।

—[illegible]

মুর্শিদাবাদের কাহিনী

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



গুড়ুম-গুড়ুম গুড়ুম। কামান গর্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি গোলা আকাশের মত উজ্জ্বল জ্যোতিতে চারিদিক প্রদীপ্ত করিয়া ছুটিয়া চলিল—যেখানে নবাব সরফরাজ খাঁ তাঁহার শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

আবার গোলা গেল কামানের মুখ দিয়া। আবার একটি কামানের গোলা নবাবের তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল।

নবাব উপাসনা করিতেছিলেন। তিনি সামান্য মাত্রও বিচলিত হইলেন না, নির্ভীক ভাবে—ধ্যানী, মৌন নবাব উপাসনা করিতে লাগিলেন। সেদিন প্রভাতে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেই প্রভাত বেলা প্রথম অরুণচ্ছটার সহিতই শত্রুপক্ষের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে নবাব সরফরাজের বিপক্ষে।

নবাব উপাসনা শেষ করিলেন। রণসাজে সজ্জিত হইলেন এবং আদেশ করিলেন হস্তী চালককে—হস্তী শিবির-দ্বারে আনিবার জন্য। নবাবের হুকুম প্রতিপালিত হইল। গম্ভীর ভাবে বীরত্ব প্রভায় দীপ্তিমান্ সরফরাজ খাঁ হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন—কোরাণ হাতে লইয়া। তাঁবুর ভিতর দিয়া যে গোলাটি চলিয়া গিয়াছিল, আর একটু হইলেই তাহা নবাবের গায়ে আসিয়া পড়িত।

সরফরাজ খাঁ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন ভাগীরথীর পূর্বপারে গিরিয়ার প্রান্তরে, অন্য দিকে আলিবর্দীর সৈন্যদল গঙ্গার পশ্চিম তীরে এক বিস্তৃত স্থান লইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। গিরিয়ার রণক্ষেত্রে আলিবর্দী ও বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত এই যুদ্ধ চলিল। কেন এই যুদ্ধ হইল, এইবার সে কথা বলিব।

—দুই—

নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন—তাঁহার একমাত্র পুত্র মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ। সরফরাজ খাঁ ছিলেন একজন ধার্মিক মুসলমান নবাব।

তখন মুর্শিদাবাদের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নবাব ও তাঁহার পক্ষীয়দের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন। সরফরাজ খাঁ সে সব জানিতেন, তবু তিনি মাতামহ মুর্শিদকুলি খাঁর মত সর্ব্বদা ধর্ম্মপালনে নিরত থাকিতেন।

নবাব বহু কোরাণ-পাঠক নিযুক্ত করিলেন; নিজে রোজার সময় উপবাসী থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তা করিতেন। সর্ব্বদা ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিরত থাকিতেন বলিয়া রাজকার্য্যে তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেন না। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য প্রজাপালন, বিচার, সূক্ষ্ম ভাবে রাজনীতি আলোচনা। এ সকলের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। এ জন্য দিকে দিকে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতি প্রজাদের তেমন ভালবাসা ছিল না! কেনই বা থাকিবে? রাজা যদি প্রজাকে না দেখেন, তাহাদের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগ না শোনেন, তবে কেই বা শুনিবে? কেই বা দুঃখী প্রজাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবে? আবার রাজ্যের যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে নবাব সরফরাজের মতের মিল হইল না, ফলে তাঁহারাও ভাবিতে লাগিলেন কি ভাবে নবাবকে দমন করিতে পারেন।

তুষের আগুনের মত ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, নবাব তাহা জানিয়াও জানিতে চাহিতেন না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেন না; তিনি আপনার মনের খেয়ালে চলিতেন ধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠানে, অন্য দিকে বিলাসে, ব্যসনে কাটিত তাঁহার দিন।

নবাবের সঙ্গে সর্ব্ব-সময়ে দুই হাজার ঘোড়সোয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত দেহরক্ষিরূপে এই সৈন্যদল ছিল তাঁহার গৌরবের জিনিস—ইহাদের লইয়া তিনি গর্ব্ব করিতেন। একদিন তাঁহার এই মোহ-নিদ্রা যখন ভাঙ্গিল, তখন নবাব বীরের মত, পুরুষের মত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন রণক্ষেত্রে। কামানের গোলায়, শত্রুর আক্রমণে তিনি ভীত বা শঙ্কিত হইলেন না! উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সহিত বাজিয়া উঠিল রণ-দামামা ও নাগরার রব গিরিয়ার বিশাল প্রান্তরে। মুর্শিদাবাদে গিরিয়ার ন্যায় বিশাল প্রান্তর আর কোথাও দেখা যায় না। দুই বার এই রণক্ষেত্রে ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।

—তিন—

সেকালে মুর্শিদাবাদে যাঁহারা প্রতাপশালী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ। এই জগৎ শেঠ, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও সুজাউদ্দীনের সময়ও নবাব-দরবারের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সরফরাজ নবাব হইয়া তাঁহার নিকট নবাব-সরকারের পূর্ব্ব-সঞ্চিত সাত কোটি টাকার

● মুর্শিদাবাদের পাকিপথ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দাবী করিলেন,—জগৎ শেঠ তাহা অস্বীকার করিলেন। সরফরাজ তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করিয়া এজন্ত অপমান করিলেন। জগৎ শেঠ সেই অপমানের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না, তিনি তাহার এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দী খাঁ, এ দুইজনও হইলেন সরফরাজের শত্রু। আলিবর্দ্দী খাঁ ছিলেন তুর্ক বংশের লোক। তাঁহার পিতামহ ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের 'দুধ ভাই'। সে কালে বিদেশীয়েরা ভারতে ও বাঙ্গালায় আসিতেন নিজ নিজ ভাগ্যান্বেষণে। আলিবর্দ্দীও সেইরূপ ভাবে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট। সুজা খাঁ ছিলেন ইহাদের মাতার আত্মীয়। সে সময়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ জীবিত ছিলেন। তিনি এই শ্রেণীর ভাগ্যান্বেষী যুবকদের মনে করিতেন রাজ্যের কণ্টক-স্বরূপ। মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ বিষণ্ণ মনে মাতা-পিতার নিকট উড়িষ্যা চলিয়া গেলেন। সেখানে সুজা খাঁ, আলিবর্দ্দীর মাতা-পিতার জন্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এইবার আলিবর্দ্দী খাঁকেও রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদও সেখানে আসিলেন,—উভয়ের ভবিষ্যৎ গৌরব ও সমৃদ্ধির পথ মুক্ত হইল। রণদক্ষ আলিবর্দ্দী ক্রমে ফৌজদার হইলেন, পরিশেষে বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদ এ-সময়ে মুর্শিদাবাদে বাস করিতেছিলেন এবং জগৎ শেঠ প্রভৃতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ভ্রাতা আলিবর্দ্দী খাঁকে নবাব সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে পত্র-বিনিময় করিতেছিলেন। এই সংবাদ নবাব সরফরাজের কাছে গোপন রহিল না,—তিনি প্রকাশ্ত দরবারে হাজি আহম্মদ ও তাঁহার সহায়কারী পরিজনদের লাঞ্ছনা করিতে ছাড়িলেন না।

হাজি আহম্মদ বলিলেন—সে যে অসম্ভব কথা! আমি শপথ করে বলছি, আমি এ-সব কিছুই জানি না! আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁর প্রভু-পুত্রের প্রতি অন্তায় কিছু করতে পারেন। আপনি আদেশ করুন—আমি নিজে আলিবর্দ্দীর কাছে যাই এবং তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসি।

সরফরাজের হিতৈষী বন্ধুরা বলিলেন—বন্দী করুন এই হাজি আহম্মদকে। বিশ্বাসঘাতককে প্রশ্রয় দিবেন না নবাব! এ সত্য গোপন করছে।

সরফরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি গৌয়াস খাঁ বলিলেন—বন্দী করে কি লাভ!—যেতে দিন হাজি আহম্মদকে আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট। যদি সে আলিবর্দ্দীকে দরবারে এনে হাজির করতে পারে, সে ত হবে পরম মঙ্গল!

● মুর্শিদাবাদের পাদিপথ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সরফরাজ খাঁ গৌয়াস খাঁর কথানুসারী হাজি আহম্মদকে যাইবার অনুমতি দিলেন—সঙ্গে দিলেন দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর, হাজির প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য।

অন্য দিকে আলিবর্দী খাঁ তাঁহার প্রধান প্রধান সামন্তবর্গকে মিলিত করিয়া বলিলেন—বন্ধুগণ, নবাব সরফরাজ খাঁ আমার প্রভুর পুত্র; কিন্তু তিনি আমার ভ্রাতা ও পরিবার-পরিজনকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। আমি সে অত্যাচারের চাই প্রতিবিধান করতে! আপনারা প্রতিশ্রুতি দিন আমাকে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করবেন।

হিন্দু, মুসলমান সকলেই পণ করিলেন—তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে আলিবর্দীকে সাহায্য করিবেন।

কৌশলী আলিবর্দী খাঁ গোপনে জগৎ শেঠকে তাঁহার যুদ্ধের আয়োজন ও মুর্শিদাবাদ আসিবার অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া লিপি পাঠাইলেন, আর এক লিপি পাঠাইলেন নবাব সরফরাজ খাঁকে। তাহাতে লিখিলেন—নবাব, আপনি আমার হিতৈষী ও আশ্রয়দাতা নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র। আমি আমার পরিবারবর্গের অবমাননার সংবাদ পাইয়াছি, সেজন্যই আপনার অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই এতদূর আসিয়াছি। আমি পরিবারদের সহ আবার পাটনা ফিরিয়া যাইব। আপনার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা আমার অভিপ্রায় নহে।

—চার—

সরফরাজ খাঁ কহিলেন—গৌয়াস খাঁ, তুমি শুধু আমার সেনাপতি নও, তুমি আমার বন্ধু! আলিবর্দী আর হাজি আহম্মদের এই প্রতারণায় আমি ভুলব না, প্রতারিত হব না। মিথ্যাবাদী এরা দুইজন!

গৌয়াস খাঁ বলিলেন—আমার প্রাণ থাকতে, দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে, কারো সাধ্য নাই আপনাকে পরাজিত করতে পারে! জীবন দিয়ে আমি রক্ষা করবো আমার প্রভুর প্রাণ, মান ও বংশ-মর্য্যাদা।

নবাব সরফরাজ বলিলেন—আমিও তাই চাই। যুদ্ধে প্রাণ দিব—তবু এই কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের স্পর্দ্ধা সহ্য করবো না।

সরফরাজকে আর একদল পারিষদ বলিলেন—কাজ কি সংগ্রামে? তার চেয়ে আলিবর্দী খাঁর পক্ষের নায়কগণকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করলেই ত তার পরাজয় হবে—যুদ্ধ নিবৃত্ত হবে।

একথা কিন্তু খাটিল না। বিপক্ষদল জগৎ শেঠের সাহায্যে নবাব-পক্ষের অনেককে পূর্ব্বেই উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন।

● মুর্শিদাবাদের কাহিনী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সরফরাজের আর এক সেনাপতি এইরূপ হীন নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। শত্রুদল সরফরাজের তোপখানায় গোলা-বারুদের পরিবর্তে ধূলা, মাটি ও ইট পাথর ভরিয়া রাখিয়াছিল তোপখানার দারোগাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া। তোপখানার দারোগা শাহরিয়ারকে পদচ্যুত করা হইল, সেখানে ফিরিঙ্গী আন্তনীর বেশক পুত্র পাঁচু ফিরিঙ্গী নিযুক্ত হইলেন। সরফরাজ খাঁ সসৈন্যে ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।



হুজুর নবাব, আমি আজ আলিবর্দীর মাথা কেটে এনে……[পৃঃ ২২৬

—পাঁচ—

দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গৌয়াস খাঁ বীরদর্পে শত্রুর বিরুদ্ধে অসাধারণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নবাব নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, রণক্ষেত্রে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেগে তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন। তিনি মাহুতকে আদেশ করিলেন—শত্রু-সেনার মধ্যে হাতী চালনা কর।

ওদিকে শত্রুর প্রবল আক্রমণে নবাবের অনেক সৈন্য হত ও আহত হইল, কেহ কেহ প্রাণভয়ে গিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিল, কেহ পলায়ন করিল। অল্পকাল যুদ্ধের পরই নবাবের সৈন্যদের মধ্যে এইরূপ ছত্রভঙ্গ দেখা দিল। নবাব ও গৌয়াস খাঁ তাহাতে সামান্যমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

● মুর্শিদাবাদের পানিপথ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রথম দিন কোন পক্ষই বিজয়ী হইতে পারিলেন না। নবাব সরফরাজ খাঁ যুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন।

পরের দিন প্রভাত-কালে—যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গৌয়াস খাঁ কহিলেন—শুনুন নবাব, আমি আজ আলিবর্দ্দীর মাথা কেটে এনে দিব আপনাকে উপহার!

সরফরাজ কহিলেন—বন্ধু, জানি আমি, তুমি পাঠান। পাঠান জানে প্রভুভক্তি। যাও বীর, যুদ্ধ কর। চল, যুদ্ধে অগ্রসর হই।

আবার রণ দামামা বাজিল। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি আর রণকোলাহল-ধ্বনি ভাগীরথীর তীরে তীরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আলিবর্দ্দী স্বয়ং সম্মুখ দিক্ দিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য সরফরাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দীর হিন্দু সেনাপতি নন্দলাল রণক্ষেত্রের অপর প্রান্তে গৌয়াস খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং নন্দলাল গৌয়াস খাঁর সহিত বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

আলিবর্দ্দী নবাব সরফরাজের শিবিরের দিকে বেগে অগ্রসর হইলেন, কামান গর্জ্জিল—গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুড়ুম!

সরফরাজ খাঁ আপনার শিবিরের সম্মুখে কামান-গর্জ্জন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন,—ভাবিতেও পারেন নাই, সৈন্যদল দ্বারা সুরক্ষিত তাঁহার শিবিরের কাছে কেমন করিয়া আলিবর্দ্দী আসিলেন!

তখন সরফরাজ খাঁ তাঁহার প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ করিয়া অতি দ্রুত আপনার হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শত্রু-সৈন্য লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে লাগিলেন। নক্ষত্রবেগে তাঁহার নিক্ষিপ্ত তীর শত্রু সৈন্যদের প্রাণনাশ করিতে লাগিল। ওদিকে শত্রু-সৈন্যেরা পশ্চাদ্দিক্ হইতে নবাব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। নবাব-শিবির ছিল অরক্ষিত।

এদিকে নবাবের তূণীরের সমস্ত তীর নিঃশেষিত হইয়াছে। শত্রু-সৈন্যেরা চারিদিক হইতে বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে চক্রব্যূহের মত ঘিরিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিয়েছে, এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া হস্তিচালক কহিল—জাঁহাপনা! আর রক্ষা নেই, আপনার প্রাণ রক্ষা করতে হলে, যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে হবে—নইলে যে প্রভু, আর কোন উপায় নেই!

চালক রণক্ষেত্র হইতে নিরাপদ স্থানে হস্তী চালনা করিতে উদ্যত হইলে, চিন্তাকুল নবাব সুপ্ত সিংহের মত সহসা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন—না—না, সে হতে পারে না। কখ্‌খনো না!

● মুর্শিদাবাদের কাহিনী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমি কাপুরুষ নই যে, প্রাণের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবো! বিশ্বাসঘাতকের রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত চাই আলিবর্দ্দীর—

গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!—

ভীষণ রবে আবার কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। নবাবের আর যুদ্ধ করিতে হইল না। বিপক্ষের একটি কামানের গোলা ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিয়া সুখ-লালিত নবাবের মস্তকে লাগিল—তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইল। নবাব চিরদিনের জন্য বীরের মত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

—ছয়—

—আলিবর্দ্দীর মাথা! বর্দ্দীর মাথা চাই!

এই ভীষণ চীৎকারে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া নন্দলালের আক্রমণ-গতি প্রতিহত করিয়া, গোলাম খাঁ আলিবর্দ্দীকে লক্ষ্য করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। আলিবর্দ্দী একটু পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গোলাম খাঁ নবাবের শিবিরের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলেন—নবাবের মৃতদেহ ধূলিতে অবলুণ্ঠিত, মস্তক দেহচ্যুত!

—একি! নবাব নাই! নবাব জীবিত নাই!

একটা উচ্চ ঘূর্ণিবায়ু মধ্যাহ্নের সূর্য্য-কিরণে উদ্দীপ্ত হইয়া হা—হা—হা—শব্দে ছুটিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিল—নবাব নাই! নবাব নাই!

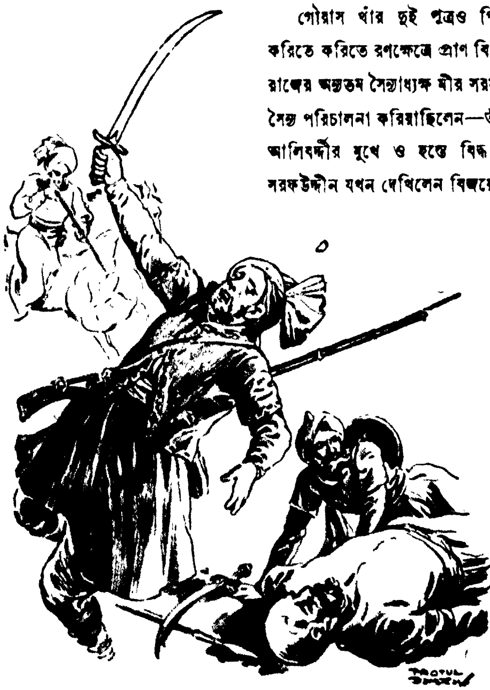
নন্দলালকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বড় আনন্দে, বড় উৎসাহের সহিতই গোলাম খাঁ আলিবর্দ্দীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, নবাব সরফরাজ খাঁ নিহত হইয়াছেন, যখন দেখিলেন, নবাবের সৈন্যেরা তাঁহার মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতেছে, যখন দেখিলেন কেবল নবাব-সৈন্য যুদ্ধে যোগদান না করিয়া দর্শকের ন্যায় তামাসা দেখিতেছে, আর যখন শুনিলেন মন্ত্রী আলমচাঁদ যুদ্ধে আহত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের পুত্রদ্বয় ও অতি অল্প কয়েকজন সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আলিবর্দ্দীর সৈন্যেরা সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

গোলাম খাঁর হস্তী ভীষণ রবে হুঙ্কার করিয়া শত্রু সৈন্যের দিকে শুঁড় উত্তোলন করিয়া ধাবিত হইল। এমন সময় সহসা একটি গুলি দেবন হাজারী নামক একজন বিপক্ষ সৈনিকের বন্দুক হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিঁধিল গোলাম খাঁর গায়ে। আহত বীর তৎক্ষণাৎ হস্তি-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেমন অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যাইবেন, সেই সময়ে আবার দুইটি গুলি আসিয়া তাঁহার গায়ে বিঁধিল।

● মুর্শিদাবাদের কাহিনী
নিখিলনাথ গুপ্ত

গৌয়াস খাঁ মৃত্যুকে বরণ করিলেন। আসন্ন মরণের পূর্ব্বেও তিনি নিজের তরোয়ালের আঘাতে ছেদন হাজারীকে ভীষণভাবে আহত করিয়াছিলেন। প্রভুর জন্ত প্রাণ দিয়া গৌয়াস খাঁ যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গেলেন, তাহা কেহ কি কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে?

গৌয়াস খাঁর দুই পুত্রও পিতার আদর্শে বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। নবাব সরফরাজের অন্ততম সৈন্তাধ্যক্ষ মীর সরফউদ্দীনও শেষ পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রে সৈন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন—তাঁহার নিক্ষিপ্ত দুইটি তীক্ষ্ণ শর আলিবর্দ্দীর মুখে ও হস্তে বিদ্ধ হইয়াছিল। শেষ সময়ে মীর সরফউদ্দীন যখন দেখিলেন বিজয়ের আর কোন আশাই নাই, তখন তিনি নিজের ক্ষুদ্র সৈন্তদল সহ বীরভূমের দিকে চলিয়া গেলেন।



গৌয়াস খাঁ মৃত্যুকে বরণ করিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচু ফিরিঙ্গীর দলের গোলন্দাজেরা পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু পাঁচু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভুর জন্ত নিজের তোপ ছাড়িয়া যান নাই।—পরে শত্রুরা আসিয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

এই যুদ্ধক্ষেত্রের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা বীর বালক জালিম সিংহের অসাধারণ পিতৃভক্তি ও বীরত্ব!

অসাধার বিজয়সিংহ নবাব-বাহিনীর একটি পার্শ্ব-দেশ রক্ষা করিতেছিলেন—বর্শা হস্তে নবাব সরফরাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্ত বিজয়সিংহ আলিবর্দ্দীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং

অনেককে হত ও আহত করিয়া—আলিবর্দীকে লক্ষ্য করিয়া যেমন বর্শা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় একটি বন্দুকের গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র আলিম সিংহ মৃত পিতার দেহরক্ষার জন্য হাতের খোলা ক্ষুদ্র তরবারিখানি লইয়া আক্রমণকারী সৈন্যদের বাধা দিতে লাগিল। বালক বীরদর্পে কহিল, আমি বেঁচে থাকতে আমার পিতার পবিত্র শরীর কাউকেই স্পর্শ করতে দেব না!

আলিবর্দী খাঁ দূর হইতে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং নিজে সেখানে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদের, রাজপুত বালককে নিহত করিতে নিবৃত্ত করিলেন এবং সসম্মানে হিন্দু-মতে বিজয়সিংহের সৎকারের আদেশ দিলেন।

আলিবর্দীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। এখনও সেই স্থান 'আলিম সিংহের মাঠ' বলিয়া পরিচিত।

সরফরাজের মৃতদেহ যুদ্ধের দিন রাত্রিতেই মুর্শিদাবাদে নীত হইয়াছিল।

গৌয়াস খাঁর প্রভুভক্তি, বীরত্ব ও আত্মবিসর্জন-কাহিনী এখনও গ্রাম্য কবিতায় গীত হইয়া থাকে। এখনও পল্লীর গায়কগণ গৌরবের সহিত গান করে:

হায় গো আল্লা বারিতালা, খোদার দিল হেতে,
গৌয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দীর সাথে।
মার মার করে গৌয়াস খাঁ লড়াই করিল,
কলার বাগান যেন কুড়িতে লাগিল।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে ঝড়ে,
একেলা করিয়া লড়াই গৌয়াস খাঁ চাল মুণ্ড দিয়ে।

* * *

কালিয়া মেঘের আড়ে যেন মেঘ চিকচিকে,
গৌয়াস খাঁর তরবার যেন বিজলী চটকে।

গৌয়াস খাঁর সমাধি-মন্দির ছিল—গিরিয়ার নিকট মমীনটোলায়। ভাগীরথীর গতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহা নদী-গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই যুদ্ধে একটা প্রধান গৌরবের বিষয় এই যে, নবাব স্বয়ং যেমন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরাও প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়া আশ্চর্য্য প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরবোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

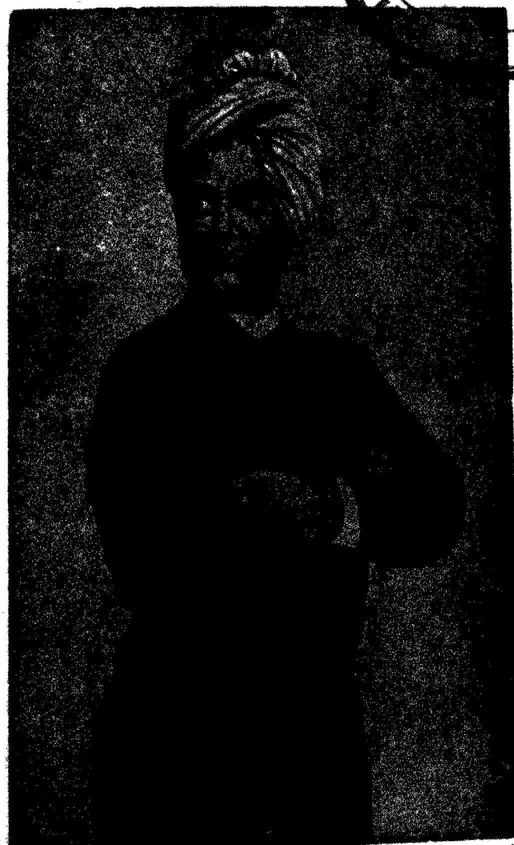
সুদূরের বাণী

ভারতের আদর্শ

হে ভারত! ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী···ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর······ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে···ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত··· ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর,—তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

● স্বামী বিবেকানন্দ

আলপনা—



হিন্দু-রত্ন বিবেকানন্দ,
সিংহ-বীর্য্যবান্,
তোমার পুণ্য-প্রভাবে আজিও
ফুটিছে নব প্রাণ।



—যাদুকর পি. সি. সরকার

আমার পাঠকবর্গের অনেকেই এক্ষণে ম্যাজিক সম্বন্ধে আগ্রহশীল জানিতে পারিয়া এবারের পূজা-বার্ষিকীতে কয়েকটি অদ্ভুত, মনোমুগ্ধকর, অথচ সহজ খেলার অবতারণা করিতেছি। প্রথমে যে খেলাটি শিখাইব, উহা একটি অত্যাশ্চর্য্য তাসের খেলা, যাহার ইংরাজী নাম Card through Handkerchief বা 'রুমালের মধ্য দিয়া তাস'।

রুমালের মধ্য দিয়া তাস

এবার যখন শিলংএ ম্যাজিক দেখাইতে যাই, তখন সেখানকার জনৈক বন্ধুর বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া এই খেলা প্রথম দেখান হয়। খেলাটি দেখিয়া বন্ধুবান্ধব সকলেই অবাক হইয়াছিলেন; কাজেই, এখানে উহার কৌশল প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

ব্রীজ খেলিবার উপযুক্ত এক প্যাকেট নূতন তাস আনা হইল; উহা সাধারণ তাস ছিল অর্থাৎ কোনরূপ কৌশলযুক্ত ছিল না। দর্শকদের মধ্য হইতে একজনকে একটি তাস টানিয়া লইতে বলা হইল এবং সকলকে ঐটি দেখাইয়া পুনরায় প্যাকেটে ফিরাইয়া দিতে বলা হইল এবং প্যাকেটটি উত্তমরূপে 'শাফল্' (Shuffle) করিয়া দেওয়া হইল। তারপর আমি দর্শকদের নিকট হইতে একটি সাধারণ রুমাল চাহিয়া লই। (এই ফাঁকে

বন্ধু-স্তুতির সুযোগ ছাড়ি কেন ? রুমালটি খুবই দামী, সুগন্ধযুক্ত ও ভাল সেলাইর কাজ করা ছিল ; সাধারণ মোটেই নয়—এক হিসাবে 'অসাধারণ'ই ছিল।) এইবার গৃহীত রুমালের মধ্যে তাসের প্যাকেটটি রাখিয়া চিত্রের স্থায় ঝুলাইয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আমি আস্তে আস্তে নীচের দিকে ঝাঁকানি দিলে তাসগুলির মধ্য হইতে বাঞ্ছিত তাসটি আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিবে—রুমাল ভেদ করিয়া আসিবে, কিন্তু রুমালের কোনই ক্ষতি হইবে না। (ক চিত্র)



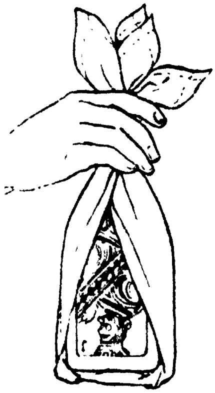
ক চিত্র

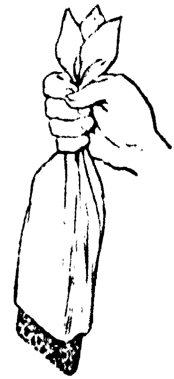
প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। আমি দর্শকদের নিকট হইতে প্যাকেটটি ফেরৎ লইয়া রুমালের মধ্যে প্যাকেটটি জড়াইবার পূর্ব্বে গৃহীত তাসটি সরাইয়া ফেলি এবং বাকী তাসগুলি রুমালে বাঁধিয়া রাখি—বাঁধিবারও বিশেষ কৌশল আছে। খ চিত্রে উহা ভালরূপে দেখান হইয়াছে উহাই এই খেলার পশ্চাতের দৃশ্য—এবং ঐটি দেখিলেই খেলার সমস্ত কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এইজন্যই আমরা ম্যাজিকের সময় আমাদের পশ্চাতে লোক যাইতে দিই না।

খেলাটি অত্যন্ত সহজ—পর-পর চিত্রগুলি দেখিলে উহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। দর্শকদের তাসটি হাতের তালুতে রাখিয়া উহার উপর রুমাল বিছাইতে হয় এবং

● ম্যাজিকের খেলা
যাদুকর পি, সি, সরকার

এই রুমালের উপর বাকী তাসগুলি রাখিয়া একধার হইতে রুমাল ভাঁজ করিতে করিতে বাণ্ডিল করিতে হয়। বাণ্ডিল বাঁধিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হয়, যাহাতে খ চিত্রের ন্যায় তাসটি পশ্চাতের দিকে রুমালের দুই দিক্‌কার ভাঁজ দ্বারা আটকাইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাসটির তলার দিক্ খোলা, কেবল দুই পার্শ্বস্থ রুমালের ভাঁজ কোণাকুণি উপরের দিকে উঠিয়া উহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে নীচের দিকে ঝাঁকানি দিলেই (গ চিত্রের ন্যায়) দর্শকদের তাসটি আস্তে আস্তে নামিতে থাকিবে। দর্শকগণ মনে করিবেন, তাসটি রুমাল ভেদ করিয়াই নীচে নামিতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পশ্চাৎ হইতে নামিতেছে। ইহাই ম্যাজিকের মজা!


খ চিত্র (পশ্চাদ্দেশ)
(উল্টাইয়া আঁকা হইয়াছে)


গ চিত্র (পার্শ্বদেশ)
(পশ্চাতের রুমালটি নামিয়াছে)

মনের কথা বলা

আমার পরবর্তী খেলার নাম 'মনের কথা বলা'; ইংরাজীতে এটিকে কখনও আমি Sympathetic Mind এবং কখনও কখনও Mind Waves নাম দেই। খেলাটি খুবই সহজ কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত জায়গায় দেখাইয়াছি, সকলেই অবাক হইয়াছেন। এক্ষণে এই বিশিষ্ট খেলাটির কৌশল প্রকাশ করিতেছি।

ম্যাজিকের সমস্ত খেলারই কৌশল অতিশয় সহজ—কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কৌশল না জানা থাকে, ততক্ষণমাত্র উহা কঠিন থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

● ম্যাজিকের খেলা
যাদুকর পি, সি, সরকার

খেলাগুলির মূল কৌশলও অনুরূপভাবে অতিশয় সহজ, কিন্তু দর্শকগণ উহা জানেন না বলিয়া অবাক হন। আমার 'মনের কথা বলা' খেলাটির কৌশল জানিলেই দর্শকগণ বুঝিবেন খেলাটি কত সহজ! খেলাটি একটি উচ্চশ্রেণীর স্টেজ ম্যাজিক।

রঙ্গমঞ্চের উপর একটি বোর্ড (easelএর উপর) দাঁড় করানো আছে। প্রকৃতপক্ষে উহা মাত্র পাঁচটি কার্ড রাখিবার 'স্ট্যাণ্ড'।



ঘ চিত্র
(দর্শকদের মনোনীত লেখা বলিয়া দিতেছেন)

কার্ডগুলিতে লেখা আছে—WONDERFUL, BEAUTIFUL, HOPEFUL, DELIGHTFUL, এবং PLEASANT.

যাদুকর রঙ্গমঞ্চে উক্ত কার্ডগুলি আনিয়া দর্শকদিগকে দেখাইলেন এবং তাঁহারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর সেগুলিকে বোর্ডের উপর সারিতে সারিতে রাখা হইল। তারপর যাদুকরের চক্ষু দুইটি তুলা, ময়দার আঁঠা, Plaster of Paris অথবা যে-কোন কিছু দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে তিনি কিছুতেই কোন ফাঁক দিয়া দেখিতে না পারেন।

যাদুকর চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং দর্শকগণ উক্ত কার্ডগুলি হইতে

● ম্যাজিকের খেলা
যাদুকর পি, সি, সরকার

যে কোন একটি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সহকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেইটি কোন কার্ড?"—যাদুকর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন যে আপনারা 'Delightful' মনে করিয়াছেন। (ঘ চিত্র)

এইবার খেলাটির আসল রহস্য প্রকাশ করিব। প্রকৃতপক্ষে খেলাটি যত কঠিনই মনে হউক না কেন, আসলে উহা খুবই সহজ। আমার এই খেলা দেখিয়া অধিকাংশ লোকেই ইহাকে আমার প্রসিদ্ধ X-Ray Eyes খেলা মনে করেন কিন্তু মোটেই তাহা নহে। পূর্ব্বোক্ত কার্ডগুলি লইয়া দেখাইতে হইলে ইংরেজ দর্শকদের মধ্যে বা ইংরেজী জানা শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে দেখাইতে হইবে। নতুবা যে দেশীয়দের মধ্যে দেখাইতে হইবে, সেই দেশীয় ভাষায় কার্ড লিখিয়া লইতে হইবে। এই খেলাতে সমস্ত বাহাদুরী ঐ শিক্ষিত সহকারীর প্রাপ্য।

দর্শকগণ লক্ষ্য করুন যে পাঁচটি বিভিন্ন কার্ড আছে, উহার প্রত্যেকটির আদ্যক্ষর বিভিন্ন। যথা,—W. B. H. D. P. যাদুকর ঐ অক্ষরগুলি জানিতে পারিলেই কার্ডটি জানিতে পারেন।

চিত্রে দেখানো হইয়াছে দর্শকগণ Delightful কার্ডটি মনোনীত করিয়াছেন, উহার আদ্যক্ষর D। কাজেই সহকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, Do you know what this card is? এখানে আরম্ভ হইল Do দ্বারা, অর্থাৎ D দ্বারা, কাজেই উত্তর হইবে Delightful. এই ভাবে প্রত্যেকটি বিভিন্ন কার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন হইবে। নিম্নে তাহার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল।

Wonderful = What is this? Will you please say? ইত্যাদি।

Beautiful = Be quick, what is this? Be ready now. Babu will you say now? But what is this? ইত্যাদি।

Hopeful = Hello, what is this? Hurry up. How can I say? ইত্যাদি।

Delightful = Don't be late. Do you know it? Dear friend. ইত্যাদি।

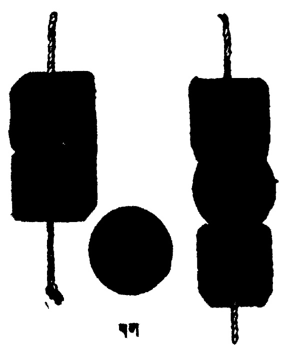
Pleasant = Professor, what is this? Possibly you do not know it? Please be quick. ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে সহকারীই সমস্ত বলিয়া দিতেছেন এবং যাদুকর প্রশ্নের প্রথম অক্ষর হইতে খেলার মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়া লইতেছেন। খেলাটি ভারী চমৎকার এবং এ পর্য্যন্ত আমি যতস্থানে দেখাইয়াছি, সর্ব্বত্রই অতিশয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছি। *Wonderful, Beautiful, Delightful* কার্ডগুলি শুধু নামেই নহে, খেলার কারুকারিতাতেও যেন উহারা প্রকৃতই Wonderful, Beautiful এবং Delightful. কাজেই এই খেলাটা আমার এখন এত প্রিয়।

অত্যাশ্চর্য্য বলের খেলা

সর্ব্বশেষে অত্যাশ্চর্য্য বলের খেলা বা Wonderful Ball Trick দ্বারা খেলাটি শেষ করিব।

যাদুকর দুইটি চতুষ্কোণ কাঠ (cubes) এবং একটি কাঠের বল সর্ব্বসমক্ষে আনিলেন। সবগুলিই অতিশয় সুন্দরভাবে রং করা এবং ভিতর দিয়া ফিতা বা দড়ি প্রবিষ্ট করিবার জন্য ছিদ্র করা আছে। যাদুকর 'কিউব' দুইটির মধ্য দিয়া ফিতা প্রবিষ্ট করিয়া উহা পাশাপাশি করিয়া প্রদত্ত ● চিত্রের ন্যায় দেখাইলেন।



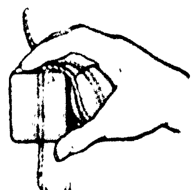
● চিত্র

একটি কিউবের রং লাল এবং অপরটির রং নীল। যাদুকর নীলটির মধ্য দিয়া একটি নীল রংয়ের ফিতা প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইলেন। ফিতাটিতে কোন কৌশলই নাই, উহাকে বাহারী বা সুন্দর দেখাইবার জন্য নীচে একদিকে একটি ঝালর বা Tassel দেওয়া আছে। যাদুকর এইবার নীল ফিতাটি দ্বারা লাল কিউবটিকেও গাঁথিয়া ফেলিলেন এবং ● চিত্রের প্রথমার্দ্ধের ন্যায় দেখাইলেন। তারপর একটি নীরেট

● ম্যাজিকের খেলা
যাদুকর পি, সি, সরকার

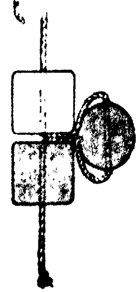
কাঠের বল আনা হইল এবং রুমাল-ঢাকা অবস্থায় উহাকে কিউব দুইটির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

দর্শকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ফিতার উভয় প্রান্ত ভালরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেখান দিয়া কোন কিছুই নূতন করিয়া গাঁথা হয় নাই বা খোলা হয় নাই। তবে কিভাবে বল প্রবিষ্ট হইল, ইহাই সমস্যা। পরবর্ত্তী চ এবং ছ চিত্রে উহার মূল কৌশল প্রকাশ করা হইয়াছে।



চ চিত্র

নীল কিউবটিতে যখন নীল ফিতা প্রবিষ্ট ছিল তখন নীল কিউবের পিছনে একটি অনুরূপ বল পূর্ব্ব হইতেই ফিতা-প্রবিষ্ট অবস্থায় লুকানো ছিল এবং যাদুকর কিউবটিকে এমন ভাবে ধরিয়াছিলেন যে দর্শকগণ শুধু কিউবটিকেই ফিতা প্রবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়াছেন। চ চিত্রে উহা ধরিবার কৌশল দেখান হইয়াছে। (দেখিবেন, নীল কিউবের পশ্চাতে বলটি গাঁথা।)



ছ চিত্র

বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ। লাল কিউবটিকে এইবার সর্ব্বসমক্ষে ফিতা প্রবিষ্ট করিয়া দর্শকদিগকে দেখাইতে হইবে যে কেবল কিউব দুইটিতে ফিতা পরানো হইল। প্রকৃতপক্ষে কিউব দুইটির পশ্চাতে ফিতা পরান অবস্থায় বলটি লুকায়িত রাখা হইয়াছে। (একটু নাড়া দিলেই উহা মধ্যস্থলে হাজির হয়। ছ চিত্র দেখুন।)

এইবার বলটি সর্ব্বসমক্ষে আনিয়া রুমালের নীচে ঢাকা দিয়া কিউবের কাছে নিলেই বলটি মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। বলা বাহুল্য, এই বলটি আস্তিনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে হয় এবং অনুরূপ অপর বলটিকেই দেখান হয়। দর্শকগণ এই 'দুইটি' বলের অস্তিত্ব জানেন না, তাঁহারা জানেন বরাবর 'একটি' বল দ্বারাই খেলা দেখান হইতেছে। ম্যাজিকের এখানেই মজা। বলা বাহুল্য, বলের আকৃতি 'কিউব' অপেক্ষা কিছু ছোট রাখিতে হইবে।

—



কানায়ের বৈরাগ্য

—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্নী গতে এলো প্রবল সংসারে ঔদাস্য,
পড়্তে লাগলো কানাই তখন শ্রীশঙ্কর-ভাষ্য !—
সবই মিথ্যা, সব অনিত্য, স্বপ্ন এটা মাত্র,
বিশ্বটা আর কিছুই নয়—বন্ধ্যা-পুত্রের গাত্র !
মানুষগুলো মানুষ নয়, না গাধাগুলো গাধা,
এক ছাড়া দুই নাই, দেখছ যা তা ধাঁধা ।
কে কার পিতা, কে কার মাতা, কে কার পুত্র-জায়া ?
পৃথিবীটে নেই একদম্,—দৃশ্যটা সব মায়া !

ক্রমে গম্ভীর এবং বিজ্ঞ হয়ে পড়্লো শীঘ্র,
জমাট্ হ'য়ে বস্লো যেন—পাথরের বিগ্র' !
বন্ধুরা সব এলে কানাই তত্ত্ব-কথাই কয়,
"অগ্নিও যা, জলও তাই—তফাৎ কিছু নয় !"

হীরু বল্লে—"বেশ মজা ত !—টিকেখানা নিয়ে
চট্ ক'রে ভাই ধরিয়ে আনো—পুকুরেতে গিয়ে ;
ততক্ষণ আমি তোমার কাপড়গুলো কাচি
আগুনে ফেলে ;—হ'ল ভাল—ঠাণ্ডা থেকে বাঁচি !"
বলত কানাই—"আর সব কথায় দিতে পারি সাড়া,
'উপার্জ্জন' আর 'বিবাহ'—এই দুইটি ছাড়া।"

ভিটে বেচে কানাই একদিন—বেরিয়ে পড়্লো তীর্থে,
মতল্‌বটা ছিল না আর দেশের দিকে ফির্‌তে।
সাধু-সঙ্গ করবে শুধু, এইটে হ'ল বাঞ্ছা,
জুতো ফেলে, গেরুয়া প'রে, ছেড়ে দিলে পান্-চা।
গেঁজেয় নিলে টাকা-পয়সা, কাঁধে নিলে কম্বল,
হাতে কর্‌লে কমণ্ডলু,—এই মাত্র সম্বল !
কাশী কাঞ্চী মায়াবতী, দ্বারকা অবন্তী,
বদরিকা রামেশ্বর, তীর্থ অক্রুরস্তি ;
কামরূপ চন্দ্রনাথ করিয়ে ভ্রমণ—
পুরী হ'য়ে উপনীত পুনঃ বৃন্দাবন।

দুচার দিন ঘুরেই তার হ'ল ব্রজে অরুচি,
ভালোর মধ্যে লাগলো কেবল রাবড়ী পেঁড়া আর লুচী !
সত্যি ত তার কৃষ্ণ-তরে লালায়িত নয় চিত্ত,
পত্নী-বিয়োগ সইতে নেরেই ছুটে ছুটে সে 'ফির্‌ত' !
বিরহ কি বৈরাগ্য তার বুঝতো নাকো প্রভেদ,
পারতো নাকো ধরতে কানাই কোথায় যে তার বোনেদ্ !

● কানায়ের বৈরাগ্য
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নানের সময় বানরেতে করলে বস্ত্রহরণ,
ভাবলে কানাই, "এরাই দেখছি ব্রজের কৃষ্ণ এখন!"
ব্যাজার হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌লো বৃন্দাবনটা ছেড়ে,
পাণ্ডার বাসায় প্রয়াগে কে গেঁজে নিলে কেড়ে!

অর্থহীন বস্ত্রহীন হয়ে একদম নিঃস্ব
কানাই তখন অন্ধকার দেখতে লাগলো বিশ্ব।
চিন্তা আর অনাহারে বেজায় পোড়ে ধুঁকে
অবশেষে নাগার দলে পড়্‌লো একদিন ঢুকে।
ভিক্ষা করে সিদ্ধি ঘোঁটে,—কাষ্ঠ ভেঙে আনে,
বাকি সময় গাঁজা সাজে—নিজেও দু'টান্ টানে।
চৌকা দেয়, উনুন ধরায়, মাখে আধ মণ আটা,—
দলপতির জটার পাট্ আর টিপতেও হয় পা'টা!
হাতী-ঘোড়া উকিল-মুন্সী—সবই আছে তার,
আর আছে জমিদারী—হুণ্ডির কারবার!

কানায়ের পিস্‌ছিলো হাড়্—খাটুনির যাঁতায়,
বৈরাগ্য কি বিরহ আর ছিল নাকো মাথায়!
তবু চক্ষু বুজে ছিল, ছিল না ব'লে সম্বল,
এমন সময় একদিন তার স'রে গেল কম্বল!
ভাবলে কানাই—ধর্ম্ম-কর্ম্মের নাম-গন্ধও নাই,
আছে মাত্র হট্টগোল—গাঁজা আর ছাই!
কানায়ের এই সবই ঠেক্‌তে লাগলো চোখে,
ভাবলে—"কই বিষয় ছাড়া দেখলুম নাতো লোকে!

সংসারেতে তবু একটা দান-ধর্ম্ম আছে,
কুড়েমী ছাড়া দেখ্‌লুম নাতো কিছুই এদের কাছে!"

"দুত্তোর!" ব'লে কানাই একদিন ব'সে গঙ্গাতীরে
ভাব্‌চে—"এখন সাধ মিটেছে—কি ক'রে যাই ফিরে?"



এমন সময় লাল্‌পাগড়ী এসে দুটো মিন্‌সে
বল্লে, "তুম্‌কো ঢুঁড়তা হায় হাম্‌লোক বহুৎ দিন্‌সে।"
চম্‌কে উঠে কানাই বল্লে—"আমার সঙ্গে কি কাজ?"
"ডাকু হোকে সাধু বনা—জান্‌তা নেই দাগাবাজ্!"
বল্লে তারা,—"চলো থানামে মালুম্ হোগা সব্
আচ্ছা আচ্ছা লাড্ডু পেঁড়া খানে মিলেগা সব্।

বহুৎ দিন্‌কা পাপী তুম্‌ ভঁহিশ্‌ চন্দর ঘোঁশ্‌!"
কানাই বল্লে—"সে কি কথা, আমিতো কানাই বোস্‌!"
"ঘোঁশ্‌ ভোঁশ্‌ একই বাৎ"—ব'লে তাকে ধ'রে
থানায় নে'গে রাখলে তারা হাজৎ-বাৎ ক'রে।

হাড়ির হালে প'ড়ে কানাই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো বোসে,—
"পত্নী-বিয়োগ হয়েই এসব ঘট্‌লো কপাল-দোষে!
লক্ষ্মী-ছাড়া হয়ে আমার রইলো আর কি বাকি,—
ভিটে, চাক্‌রী, অর্থ গিয়ে—বেড়াচ্ছি ছাই মাখি'!
নিশ্চিন্তে বাড়া-ভাত নিত্য মিল্‌তো তখন,
অন্নতরে চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুরে বেড়াই এখন।
ভিক্ষা করি, কোপ্‌নী কাচি, রাঁধি যেদিন পাই,
না জুটলেই অনাহার—অন্য উপায় নাই।
মতিচ্ছন্ন ঘট্‌লো আমার ছেড়েগে' 'শিবানী',
বাঘে যখন ছুঁলে আবার কি আছে না জানি!"

হপ্তাপরে থানা থেকে পড়লো যখন ডাক্‌,
গিয়ে ছাখে চেয়ারে এক ভিমরুলের চাক্‌!
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—
নাক চ্যাপ্‌টা, গোল চক্ষু, পরা খাকির কুর্ত্তি।
কার্ণিসেতে ঘাসের মত শোভা পাচ্ছে ভুরু,
ছাঁটা গোঁফের নীচে বেজায় ওষ্ঠাধর পুরু।

বুঝিয়ে দিলেন কি কি ধারা ঝুল্‌চে তাহার 'পরে
খট্টাসের মত চেয়ে—বজ্র-সম স্বরে—
চোর, ডাকাত, নরহন্তা একাধারেই কানাই ;
দ্রোহের মধ্যেও নামটা আছে, দিলেন প্রভু জানাই !



কানাই বল্লে—"বলেন কি হুজুর, আমিত কানাই বোস্ !"
"অর্জ্জুনকে পার্থ বল্‌তেও ব্যাসের হয়নি দোষ !—
সাক্ষী-সাবুদ, কাগজ-নজীর সবই আছে তয়ের্‌,
বৃহস্পতি এলেও তোমার আশা নাইক জয়ের।
তবে তুমি স্বঘর ব'লে ভেবেচি একটা পথ্‌—
সব উল্‌টে দিতে পারি কর যদি বাপু মত্‌।
একটি মাত্র কন্যা আমার,—চম্‌কো নাকো শুনি',
বিশ্বাস কেউ কর্‌বে না যে আমার মেয়ে 'চুণী' !

● কানায়ের বৈরাগ্য
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহ তায় কর্‌তে যদি হয়ে পড়ো বাপু রাজি,
বে-কসুর খালাস্ তোমায় ক'রে দিতে পারি আজি !"

ইতিপূর্ব্বেই সাধু দেখে গিয়েছিল প্রাণ বিগ্‌ড়ে,
যা ছিল তার পুঁজি-পাটা নিয়েছিল তারা নিংড়ে।
বুঝেছিল সে, "ধর্ম্মের সেরা সংসারীটে হওয়া,
সাধু মানে নিষ্কর্ম্মা, জড়—মাথায় জটা বওয়া।
লক্ষ্মী যার ছেড়ে যায়, শনি তাকে নিয়ে
সাত ঘাটের জল খাওয়ায় কেবল নাকে দড়ি দিয়ে।
ঠাউরে ছিল, কৃপা যদি করেন প্রজাপতি,
সংসারীটে হতেই হবে ঘরে এনে সতী।"
কাজেই তাঁর প্রস্তাবেতে ভাব্‌লে শাপে বর,
গৃহলক্ষ্মী এনে কানাই পাৎলে নূতন ঘর !
সত্বরই তার চাকরী হ'ল—ক্রমে পুত্র-কন্যা,—
শনির স্থানে ডাক্‌লো জোরে বৃহস্পতির বন্যা !

হীরু বল্লে—"কিহে কানাই,
কেমন লাগ্‌ছে এখন ?"
কানাই বল্লে—"দুই-ই সমান—
তফাৎ কেবল 'রকম্' !"●

● এই লেখাটি বিশ-বাইশ বছর পূর্ব্বে কাশী হইতে প্রকাশিত (অধুনালুপ্ত) "প্রবাসজ্যোতি" নামে মাসিক পত্রিকায় একবার ছাপা হইয়াছিল।



রুশ সম্রাট—প্রথম জারের মৃত্যুরহস্য

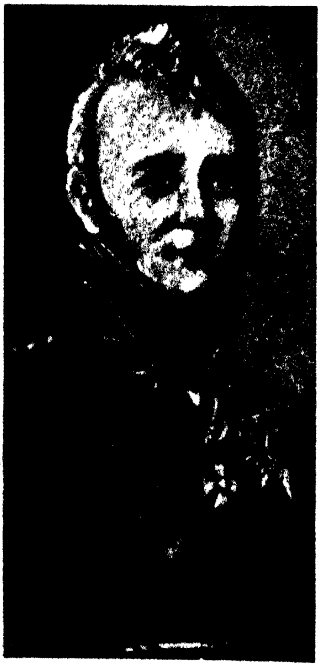
(ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে লেনিনগ্রাদের পিটার-পল দুর্গে প্রথম জার আলেকজান্ডারের কফিনের মধ্যে কাষ্ঠ-নির্মিত মূর্তির আবিষ্কার)

—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন পূর্বে বিধ্বস্ত জার্মান-রাজধানী বার্লিন নগরীর মধ্যে পরাজয়ের গ্লানির অসহ্যতায় হিটলার আত্মহত্যা করেছেন, অথবা স্বাভাবিক অসুস্থতায় মারা গিয়েছেন, এ সংবাদ বিজয়ী রুশ-সেনানীদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তারা অনুসন্ধান আরম্ভ করে। অনুসন্ধানের ফলে, কয়েকদিন পরে, কাগজের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, এ সংবাদ সত্য, অর্থাৎ হিটলার আর ইহজগতে নেই। কিন্তু এভাবে এই মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হলেও, আজও শুধু আমাদের দেশ কেন, দূর-দেশান্তরেও এখনও এমন অনেক লোক আছে, যারা হিটলারের এই মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করে না—করতে মন তাদের চায় না। তারা মনে করে, হিটলার হয়ত তাঁরই মত কোন একজনকে মৃত অবস্থায় সেখানে রেখে, নিজে আত্মগোপন করেছেন।

ব্যাপারটি হয়ত সত্য, হয়ত সত্য নয়; কালে তা আমরা সঠিক জানতে পারব। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক রহস্যজনক আত্মগোপনের কাহিনী আছে, যা থেকে মানুষের মনে এ ধরণের কথা জাগা একেবারে অসম্ভব নয়।

বহুকাল পূর্ব্বের এমনি একটি রহস্যজনক ঘটনার কথা আজ তোমাদের কাছে বলব, যা কিছুকাল আগে শুধু রুশদেশীয় কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের মধ্যে নয়, সারা রাশিয়াতেই সোরগোল ফেলে দিয়েছিল।



রাশিয়ার প্রথম জার আলেকজান্দার
(পুরাতন চিত্র হইতে)

রাশিয়ার প্রথম জার আলেকজান্দারের জীবনী ছিল অদ্ভুত ধরণের। শাসক হিসাবে তাঁর খামখেয়ালী ছিল অনন্যসাধারণ। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার দি গ্রেটের পর, সেই নামীয় এই রুশ সম্রাট, নেপোলিয়নকেও আশ্চর্য্যজনকভাবে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। এমনি বহু শৌর্য্যবীর্য্য ও ঘটনা-রহস্যে তাঁর জীবন ছিল ঐতিহাসিকের কাছে বিশেষ আগ্রহের বস্তু। জার-শাসনের শেষে, বলশেভিক বিদ্রোহের পর, দেশ যখন কমিউনিস্টদের শাসনাধীনে এলো, তখন তাঁদের ঐতিহাসিকরা রাশিয়ার প্রাচীন রাজা-রাজড়া ও জারদের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন, এবং একদিন প্রথম জার আলেকজান্দারের জীবনী সম্বন্ধেও তাঁদের ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল।

লেলিনগ্রাদের সেন্ট্ পিটার ও সেন্ট্ পল্ ধর্ম্মমন্দিরে এই রুশিয়ো সম্রাট আলেকজান্দারের মৃতদেহ রক্ষিত আছে বলেই বহুকাল ধরে সকলে জানতো। ঐতিহাসিকরা ঐ শবাধার খুলবেন বলে ঠিক করলেন।

আগেকার দিনে প্রত্যেক রাজা-রাজড়া ও সম্রাটদের সমাধিক্ষেত্রে শবাধারের মধ্যে বহু মূল্যবান ধনরত্ন ও তাঁদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ লিখে রাখা হত। মিশরের পীরামিডগুলির মধ্যে এমন অনেক তথ্য আবিষ্কার হয়েছে, ইতিহাসের দিক থেকে যা অত্যন্ত মূল্যবান। এখানেও জারের কফিনের মধ্যে সাধারণতঃ মহামূল্য রত্নাদি, সম্রাটের প্রাচীন শিরোভূষণ ও তাঁর দেহাবশেষের কঙ্কালই ঐতিহাসিকরা দেখবেন, এই ধারণা ছিল; কিন্তু ব্যাপার ঘটল সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অন্যরকম! অর্থাৎ কফিনের ডালা-খোলায় সঙ্গে-সঙ্গেই সকলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, অবাক বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন তাঁরা!

এ কি করে সম্ভব? কফিনের ভেতর থেকে কঙ্কাল উধাও হয় কি করে? তাছাড়া, এই কঙ্কালের পরিবর্তে শবাধারের মধ্যে জারের এই কোঁদাইকরা কাঠের মূর্তিই বা রাখলে কে?

মূর্তিটি সম্পূর্ণ দেহের নয়, কেবলমাত্র বুক পর্যন্ত আধখানা। এই আধখানা দেহই সম্পূর্ণ সম্রাটের জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত এবং মুকুটটি যথাস্থানে বুকের ওপর রাখা। কাঠের মুখটি হু-বহু সম্রাটের মত, এবং চোখ দুটি এমনভাবে তৈরী যে, আজও দেখলে মনে হয়, যেন জীবন্ত জ্বলজ্বল করছে!

দীর্ঘদিন পরে এই ধরণের ঘটনা কার না আশ্চর্য্য লাগে? ভূতুড়ে বলে ভাবলে ভয়ও হয় মনে-মনে। কিন্তু ধুরন্ধর ঐতিহাসিকরা সহজে ছাড়বার পাত্র নন! গোয়েন্দা-গুপ্তচরের মত তাঁরাও বহু খুঁটিনাটি থেকে বহু বড়-বড় রহস্যের যারোদ্ঘাটন করেন, বহু অদৃশ্যকে নিয়ে আসেন দৃশ্যপথে! এই ঘটনার পর ক্রমশঃ নানাভাবে তাঁরা তদন্ত ও খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করলেন, এবং প্রথম দিকে কেবল এইটুকুই জানতে পারলেন যে, প্রথম জার আলেকজান্দার কেবল কফিন থেকেই অন্তর্দ্ধান হননি, তাঁর রাজ্যশাসন-ভার ছেড়েও একদিন হঠাৎ দেশান্তরী হয়েছিলেন, এবং যাবার পূর্ব্বে লোকচক্ষে নিজেকে মৃত সাব্যস্ত করে নানা রাজকীয় জাঁকজমকের মধ্যে এই মূল্যবান কফিনটিকে কবরিত করে যান।

সাধারণতঃ, রাশিয়ায় এমন অনেক অবিশ্বাস্য কল্পিত কাহিনী আছে, গল্প হিসাবে যা

● রুশ সম্রাট প্রথম জারের মৃত্যুরহস্য
দিলীপ মুখোপাধ্যায়

আশ্চর্য্যজনক ; কিন্তু ঐতিহাসিকরা তার সবই বিশ্বাস করেন না। এ ক্ষেত্রেও বহু গালগল্প তাঁদের কানে আসতে লাগল, এবং তার বেশীর ভাগই অবিশ্বাস্য হলেও, ক্রমশঃ লোক-পরম্পরায় এই তথ্যই তাঁদের কাছে খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল যে, বহুকাল পূর্ব্বে ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্‌ নামক যে একজন ভবঘুরে তীর্থপর্য্যটক সন্ন্যাসী সাইবেরিয়ার টোমস্ক নামক স্থানে এসে বসবাস করেছিলেন এবং পল্‌ হরমভ্‌ নামক স্থানীয় একজন ধনী ব্যবসায়ী যাঁর জন্যে ছোট একটি ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (যে ধর্ম্মমন্দিরটি টোমস্কে এখনও বর্ত্তমান আছে), তিনিই অর্থাৎ সেই ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্‌ নামধারী সন্ন্যাসীই হয়ত প্রথম জার আলেকজান্দার হলেও হতে পারেন!

এই খবরের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সঠিক জানবার জন্যে ঐতিহাসিকরা টোমস্কে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই টোমস্কে ফিয়োডোর কুশ্‌মিচের উপাসনাগার ও কবর তাঁরা খুঁজে পেলেন, এবং সেখানে গিয়ে কুশ্‌মিচের আশ্রয়-দাতা হরমভের বংশধরদেরও আবিষ্কার করলেন তাঁরা।

হরমভ্‌ ছিলেন সাইবেরিয়ার বেশ একজন ধনী লোক। বর্ত্তমানে তাঁর বংশধরেরা একেবারে হাঘরে হয়ে গেছে, অবস্থা একেবারেই পড়ে গেছে তাদের। সাইবেরিয়ায় সকলের অবস্থাই, বিশেষ করে ধনীদের অবস্থা সর্ব্বত্রই হয়ে গেছে এমনি। রুশ-বিপ্লবের পর রাজনৈতিক কারণেই ধনীদের অবস্থা এমনি পড়ে গেছে বলেই সকলের বিশ্বাস।

হরমভের ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র ইতিমধ্যেই যদিও অন্তর্হিত হয়েছিল, তবুও সামান্য অবশিষ্ট যা ছিল, ঐতিহাসিকরা তার ভেতর থেকেই ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্‌ সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় কিনা, তাই চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং এটা-ওটা নাড়তে-নাড়তে ছাদের চিলেকোঠার এককোণে একটি ভাঙাচোরা বাক্স তাঁদের নজরে পড়ল। বাক্সটি নানা বাজে কাগজে ভর্ত্তি ছিল; ঐতিহাসিকরা তার মধ্যেই অমূল্য রতন পাবার আশায় তন্ন-তন্ন করে কাগজপত্রগুলি দেখতে লাগলেন, এবং হ'লও তাই। হঠাৎ ঐ ছেঁড়া-পচা কাগজগুলির ভেতর থেকে একটি শিলমোহর-ভাঙা প্যাকেট তাঁদের হাতে পড়ল—প্যাকেটটির মধ্যে একটি মোটা খাম আর সেই খামের গায়ে লেখা, 'ফিয়োডোর কুশ্‌মিচের কাগজপত্র'।

'এই ত', এই ত' পাওয়া গেছে!'—বলেই ঐতিহাসিকরা লাফিয়ে উঠলেন। হ্যাঁ, সত্যিই যেন ছাই উড়িয়ে দেখতে-দেখতেই অমূল্য রতন বেরিয়ে পড়ল! সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হবার বেশী দেরি হয় নাই যেন! খামের মধ্যে পাওয়া গেল সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা দীর্ঘ এক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি!

এ হস্তাক্ষর কার? নিঃসন্দেহে ফিয়োডোর কুশ্‌মিচের। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে জারের হস্তাক্ষরের প্রতিচ্ছবি ছিল, তাঁরা এর সঙ্গে সেই হস্তাক্ষরের হুবহু মিল দেখতে পেলেন। তাহ'লে এখন কি আর সন্দেহ থাকতে পারে যে, ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্ নামধারী ব্যক্তিই প্রথম জার আলেকজান্দার নয়? যদি এতেও সন্দেহ হয়, তাহ'লে এই পাণ্ডুলিপি পড়লেই তোমাদের সন্দেহ দূর হবে, এবং তোমরা সকলেই বলতে পারবে যে, আলেকজান্দারের সম্পূর্ণ নিজের জীবনীই এটি।

'ইউরোপের ত্রাণকর্ত্তা' নামক এই পাণ্ডুলিপির মধ্যেই তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে গেছেন, অবশ্য নায়কের ও লেখকের নাম ভিন্ন দিয়ে। এর মধ্যেই আছে তাঁর ভালবাসা, পিতৃহত্যার অনুশোচনা, রাজ্য-শাসন, ধর্ম্মবিশ্বাস, গৃহত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা। এই জীবন-ইতিহাসে এতটুকুও গোপন করেন নি তিনি!

১৮১৪ সালে প্রথম যখন তিনি বিজয়-গৌরবে ফরাসী দেশে প্রবেশ করেন এবং রাশিয়াকেই ফরাসী দেশবাসীরা যখন 'ইউরোপের ত্রাণকর্ত্তা' বলে জয়োৎসব করতে থাকে, সেই সময় থেকেই এই গল্পের সুরু; এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে চরমভের হাতে শিলমোহর করা এই পাণ্ডুলিপি দিয়ে শেষ অনুরোধ জানিয়ে যান যে, আগামীকালের উপযুক্ত বংশধররা জন্মগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই পাণ্ডুলিপি যেন কেউ না খোলে!

এখন এই পাণ্ডুলিপিতে তিনি যা লিখেছিলেন, সংক্ষেপে তার কিছুটা এখানে আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি:

× "জীবনে সুখ আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু জেনেছি সব সুখই দুঃখের কারণ। সুখের পর দুঃখ, জয়ের পর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। শাদা ঘোড়ায় চড়ে, পত্নী জারিনা এলিজাবেথ ফিয়োডোরভনাকে সঙ্গে করে ফ্রান্সের রাজধানীর মধ্যে যখন আমি প্রবেশ করছি,—আনন্দ-উৎসবে ফরাসী জনসাধারণ তখন আমায় যে অভিনন্দন জানিয়েছিল,

তার তুলনা হয় না! পতাকা ও ফুলের মালায় ভরে গিছল সারাপথ; বাজি-বাজনায় গমগম্ করছিল চতুর্দ্দিক; ইউরোপের ত্রাণকর্তা আসছে বলে চীৎকার করছিল তারা সবাই। জারিনা ও আমি হাত তুলে তাদের অভিনন্দনের উত্তর দিচ্ছিলাম। জারিনার মুখ গর্ব্বে ভরে উঠছিল। আমি তখন ভাবছিলাম কিন্তু অন্য কথা; ভাবছিলাম, এই যে বিজিত ফরাসী জাতি আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, এটা কি সত্যিই এদের প্রাণের অভিনন্দন? সত্যিই কি এরা নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে বিদেশীর কাছে অধীনতা স্বীকার করে সুখে হাসছে? এ তো আনন্দ উৎসব নয়, এ যে অশ্রু-বিসর্জ্জন! কত অসংখ্য জননীর বীর সন্তান, কত শত-সহস্র নারীর যোদ্ধা স্বামী, কত অগণিত বীরপুরুষ নিজেদের দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে,—কিন্তু তারা জয়ী হতে পারেনি বলেই কি আজ তাদের ও আমার অভিনন্দন জানান উচিত নয়?

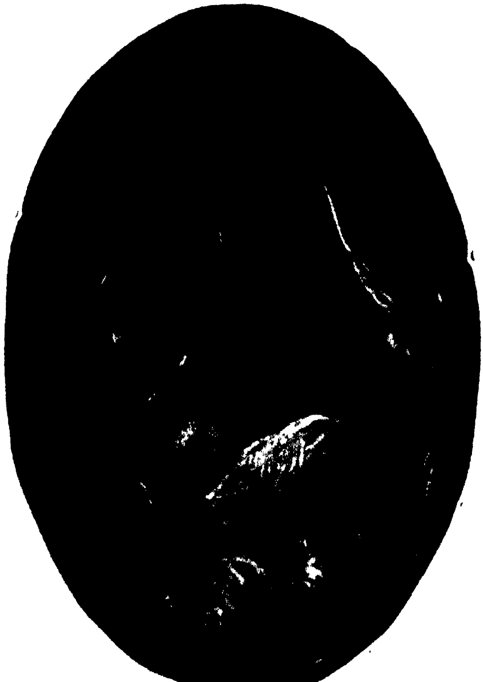

জারিনা এলিজাবেথ ফিয়োডোরভনা

এমনি সব নানান চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, আনন্দ-মুখরিত জনতার ভেতর দিয়ে যখন আমরা চলেছি, তখন পাশ থেকে এলিজাবেথ বল্লে, 'কি অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত, আলেক-জান্দার!' উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম, 'এতে গৌরব অনুভব করবার কিছুই নেই! এ সমস্তই মিথ্যা দৃশ্য, রঙ্গমঞ্চের অভিনয় মাত্র! আমি ইউরোপের ত্রাণকর্তা নই, একজন বিশিস্ট হত্যাকারী, পরধনলোলুপ অপরাধী মাত্র।' তার মুখটা কালি হয়ে গিছল!

সেখান থেকে ফিরে সেন্ট্ পিটার্সবার্গের 'উইন্টার প্যালেসে' এসে আমি ক্রমশঃই হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। জয়ের গৌরব আমাকে কাঁটার মত বিঁধছিল কেবলি—এ সিংহাসন অসহ্য হয়ে উঠছিল আমার কাছে। এতবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আমি,

একথা ভাবতেই যেন ভয় হ'ত আমার মনে-মনে, বিষ মনে হ'ত সব! ফাঁকা, ভুয়ো মনে হ'ত আমার কাছে এই মসনদ!

প্রিন্সেস্ ল্যারিশকিনার কাছে একদিন আমি মনের কথা সব বল্লাম, তাকে আমি • লো না স তাম ...ন্তু। সে আমায় অনেক সান্ত্বনা দিল, বলে, 'প্রজার মঙ্গলই আপনার কামা হোক, ওরা সুখী হলেই সম্রাটের সুখ।' কিন্তু আমি কি সত্যিই ওদের সুখী করতে পারি? সুখ-দুঃখ শুধু কি খাওয়া-পরায়? এই যে লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রাণ হারাল, তাদের যারা আত্মীয়-স্বজন রইল, তারা কি এই বেদনার কথা খেয়ে-পরেই ভুলতে পারে? আমার ক্ষমতা কতটুকু তা হ'লে?



কাউণ্ট পাহ্লিন ও আলেকজান্দার-কর্তৃক তার পিতাকে হত্যা

তাহ'লে কিসের জন্যে এই গদিতে আমি বসে আছি!

কিছুদিন ধরে এমনি মনের বিকার আমার এসেছিল। কে যেন জোর করে এসব কথা আমায় ভাবাত, আমার মাথায় এনে দিত এমনি ধরণের নানান দুশ্চিন্তা! কে

যেন বলত—কিসের জন্যে, কি ক্ষমতায় এখানে বসে আছিস তুই ? যেন কোন অশরীরী আত্মার প্রভাব পড়েছিল আমার উপর ! হয়ত তাই হবে। হয়ত যৌবনে কাউন্ট পানিনের সাহায্যে আমার পিতৃহত্যার মহাপাতকই আমায় এমনি করে তুলেছিল।

সিংহাসনের লোভে পানিনের সাহায্যে আমি পিতা জার পলকে হত্যা করেছিলাম তারই আত্মা হয়ত আমায় অভিশাপ দিচ্ছে অনুক্ষণ ! মাঝে মাঝে তাঁকে আমি অনুভব করতাম। তার সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ ভেসে উঠত আমার চোখের সামনে। স্বপ্নেও তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠেছি বহুবার। কে যেন সব সময় এই সংসারের বাইরে আমায় নিয়ে যেতে চাইত—ছেড়ে দিতে বলত এই সিংহাসন ; বলত, এখন থেকে … পালালে তোর নিস্তার নেই।

এলিজাবেথকে এ-সব কথা বল্লেই তার মুখ শুকিয়ে যেত, এসব সহ্য করতে পারত না সে ; কাজেই কিছু বলতাম না তাকে। ক্রমশঃ তার প্রতিও আমার ভালোবাসা কমে আসতে লাগল, দূরে দূরেই থাকতে চেষ্টা করতাম তার। ছেলেপুলে আমার কিছুই হয়নি, অপুত্রক ছিলাম আমি। তার জন্যে আমার দুঃখ ছিল বটে কিছুকাল আগেও, কিন্তু এখন আর তার এতটুকুও নেই ! এই রাজসিংহাসনের উপর আমার নিজের দরদ নেই বলে, আমার পর কে এর মালিক হবে, তা নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। পিতৃহত্যা করে সিংহসান লাভের পরিণামই বোধহয় এই বিতৃষ্ণা।" ×

রাশিয়ার জার-শাসকরা অত্যাচারীও যেমন ছিলেন সকলে, তেমনি ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মবিশ্বাসীও ছিলেন তাঁরা অনেকে। সেজন্য ধর্ম্মযাজক, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোক বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সর্ব্বদাই প্রশ্রয় দিতেন ও তাঁদের কথামত চলতেও চেষ্টা করতেন তাঁদের অনেকে। জার-শাসনের শেষের দিকে রাসপুটিন নামক এমনি একজন মারাত্মক ব্যক্তির নাম তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। আলেকজান্ডারের কাছেও একজন সন্ন্যাসী প্রায় আসতেন, তার জীবনীর মধ্যে তাও তিনি লিখে গেছেন।

× "আধ্যাত্মিক সংস্কার আমার ১৮১৯ সালের পর থেকেই ক্রমশঃ বাড়ছিল। কিছু

● রুশ সম্রাট প্রথম জারের মৃত্যুরহস্য
অজিত মুখোপাধ্যায়

'কছু কুসংস্কারও ছিল তার সঙ্গে। মনের এমনি অবস্থায় আমি রোজই প্রায় ধর্ম্মাশ্রয়ীদের ডেকে পাঠাতাম ও এইসব দুশ্চিন্তা ও ভীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতাম। সুযোগ পেয়ে অনেকে আমার ভীতি বাড়িয়ে দিতেন, কবচ পরতে বা ভূত-প্রেতের শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে বলতেন, আবার কেউ কেউ 'বৈরাগ্য আসছে ভালোর জন্যেই' বলে সান্ত্বনা দিতেন।

একদিন অনেক রাত পর্যান্ত নানান দুশ্চিন্তার মধ্যে জেগে বসে আছি, কিছুতেই ঘুম আসছে না। রাত তখন প্রায় দুপুর হবে, এমন সময় আমার দেহরক্ষী এসে বল্লে, 'সম্রাট, ফাদার ফটি আসছেন।'

কিছুদিন ধরে ফাদাররা, বিশেষ করে ফাদার ফটি যে কোন সময়ে আমার ঘরে আসতে পারতেন। তাঁদের জন্যে সর্ব্বদাই আমার প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং আমার পূর্ব্বপুরুষদেরও। এটা আমাদের বংশের ধারা।

ফটি ঘরের ভেতর ঢুকেই আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি বিধিমত তাঁর হাত চুম্বন করে বল্লাম, 'ফাদার ফটি, আপনি আসন গ্রহণ করুন।'

ফটি ঈশ্বরের নামে আমায় আশীর্ব্বাদ করে আসন গ্রহণ করলেন।

তখন আমি তাকে আমার ব্যক্তিগত ও বর্ত্তমান রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম।

ফটি একটুকরো কোষ্ঠির মত কাগজ বার করে, তার দিকে দেখতে-দেখতে গম্ভীরভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, 'সমস্তই স্পষ্ট আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।' (বলতে আরম্ভ করার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ দুটোও তাঁর জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল।) রাশিয়ার পতন হ'তে আর দেরি নেই, বিরাট বিপ্লবে তার সব শেষ হয়ে যাবে—জনসাধারণ প্রজা-মণ্ডলের ভেতর থেকেই জাগবে এই বিপ্লব! ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই থাকবে না, ধর্ম্ম-মন্দিরের ধ্বংস হবে এবং জারের ভাগ্যে দেখা দেবে দুঃখের চূড়ান্ত পর্য্যায়। সবই আমি দেখতে পাচ্ছি, (হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চোখ দুটোকে অদ্ভুত করে তিনি বলতে লাগলেন) কে কোথায় পালাবে পালাও—আর দেরি নয়, এক মুহূর্ত্ত নয়!' বলতে-বলতে, টলতে-টলতে ক্রুশটাকে হাতে নিয়ে ফটি পড়ে গেলেন!

● রুশ সম্রাট এবং তাঁদের মৃত্যুরহস্য
ত্রিদিব মুখোপাধ্যায়

অভিভূত হয়ে ফটির পায়ের তলায় আমিও লুটিয়ে পড়লাম এবং পিতৃহত্যার গোপন কাহিনীও বলে ফেল্লাম তাঁর কাছে। অত্যন্ত গম্ভীর তখন ফটির মুখ ; হয়ত ইতিপূর্বেই এ খবর তিনি জেনেছিলেন দৈববলে। কিন্তু তবুও তাঁর কাছে ঘটনাটি বলতে গিয়ে অনুশোচনায় মাথা নীচু হয়ে এসেছিল আমার ! গল্প যখন খানিকদূর এগিয়েছে, হঠাৎ তখন ফটি যেমন নাটকীয় ভাবে ঘরে ঢুকেছিলেন, তেমনি নাটকীয় ভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমাকে সমস্ত ঘটনা বলার অবসর না দিয়েই।

ক্রমশঃ পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রের কাহিনী রাজপরিবারের সকলের কাছেই আমি বলে ফেলতে লাগলাম এবং এ-সংবাদ আর কিছুতেই চেপে রাখা গেল না।" ×

এ না-বলা ব্যাপারটি ক্রমশঃই এমন অসহ্য হয়ে উঠেছিল আলেকজান্দারের কাছে যে, সে সময় যদি রেডিয়োর ব্যবস্থা থাকত, তাহ'লে তিনি নিজেই বোধ হয় চীৎকার করে এ-সংবাদ জনসাধারণকে জানিয়ে খানিকটা তৃপ্তিলাভ করতেন !

কিন্তু তিনি জনসাধারণকে না জানালেও, লোক-পরম্পরায় রাশিয়ার সর্বত্রই তাঁর জীবনের এই কলুষ মলিন কাহিনী ইতিপূর্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল ; এবং এর আগে যুদ্ধের ফলে, যদিও সে যুদ্ধে তাঁর জয় হয়েছিল, তবু যুদ্ধমাত্রেই অশান্তি, লোকক্ষয় প্রভৃতি ব্যাপারে দেশের জনসাধারণ বিশেষ কেউই খুশি ছিল না তাঁর উপর এবং ক্রমশঃ এই অখুশি ভাব ঘৃণা, বিরক্তি ও রাজবিদ্বেষে পরিণত হ'ল।

তিনি লিখেছেন,—

×"এর পর একটার পর একটা বড় অশান্তিকর ঘটনা ঘটতে লাগল আমার জীবনে। কেবলি আমার মনে হ'তে লাগল, এখন সব যেন ছেড়ে-ছুড়ে পালাতে পারলেই আমি বেঁচে যাই ! তা না হ'লে আমার মরণ অনিবার্য্য। কে যেন সব সময় বলতও একথা আমায়, 'কই পালালি না ? এখনও আছিস !' ছায়ার মত কখনও-কখনও দেখতুমও আমি কারুকে—ফিস্-ফিস্ করে কি ব'লে হাওয়ার সঙ্গে চলে যেত আমার পাশ দিয়ে। একটা ভৌতিক পরিবেশে ঘিরে ফেলেছিল যেন আমায় !

ক্রিমিয়ার টাগানরোগ প্রাসাদে আমি তখন থাকি। একদিন রাত্রের দিকে ফিন্‌কোটা জ্যোৎস্নালোকে প্রাসাদ-সংলগ্ন ফুলের বাগানে বেড়াচ্ছি আর ভাবছি

... কিছুই,—এমন সময় হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজে চমকে উঠলাম। ভাবলুম, ...কেই বোধহয় কেউ হত্যা করতে গিয়ে ফসকে ফেলেছে। ... না ...ও সামান্য হয়েছিল, আর মনের এ অবস্থায় ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। ... কি ... না ভাবছি, এমন সময় বাগানের একজন প্রহরী ... হয়ে এসে, আমাকে উদ্বেগে ফেলার জন্য ক্ষমা ... চেয়ে বললে যে, একজন হাঘরে ভবঘুরে লোক সন্দেহজনকভাবে বাগানের মধ্যে ঘুরছিল বলে সে ...কে গুলি করেছে!

প্রথমটা এটাও আমার ভৌতিক বলে মনে হয়েছিল, ... লোকটাকে দেখবার জন্যে আমি তার সঙ্গে গেলাম ... মৃত অবস্থায় তাকে দেখলাম। লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটু বুদ্ধি খেলে গেল এবং তারপর কে যেন আমায় দিয়ে যন্ত্রচালিতের মত একটার পর একটা করিয়ে নিতে লাগল ঘটনাগুলো! কোন জিনিসেরই অভাব বা বাধা পেলুম না আমি। তক্ষুণি সেই মৃতদেহটিকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে এলুম এবং তার পকেটের একটি চিঠি থেকে জানতে পারলুম, লোকটির নাম ফিয়োডোর কুশমিচ্।



ফিয়োডোর কুশমিচ্

(... আলেকজান্ডার)

নামটা বেশ আমার ভালোই লাগল। তারপর আমার নিজস্ব ডাক্তার ও বিশ্বস্ত চাকরকে ডেকে তাদের সাহায্যে এই ভবঘুরের দেহকে নিজের বহুমূল্য রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত করে, অপূর্ব একটি শবাধারের মধ্যে রেখে, সেটিকে সেন্ট্ পিটার্সবার্গে পাঠাবার জন্য যা কিছু হাতের কাছে ধনরত্ন ছিল, সব ডাক্তার ও চাকরের হাতে দিয়ে নিজে ফিয়োডোর কুশমিচের পোষাক পরে, সব ছেড়ে, অজানার পথে বেরিয়ে পড়লাম! স্ত্রী এলিজাবেথ, প্রিন্সেস্ ভারিশকিনা বা কারুর জন্যেই কোন আকর্ষণ বোধ করলাম

● রুশ সম্রাট প্রথম ... মৃত্যুরহস্য
... মুখোপাধ্যায়

না আমি! জারিনা ফিয়োডোরভনা এলিজাবেথ তখন অবশ্য অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় টাসার্সকিমেলো প্রাসাদে তার ভাই নিকোলাসের সঙ্গে ছিল; এবং নিকোলাসের সিংহাসনের উপর দারুণ লোভ ছিল বলে, এই মৃত্যু-সংবাদের সত্যমিথ্যা নিয়ে গোলমাল করার প্রয়োজন সে তখন মোটেই বোধ করেনি—ব্যাপারটা আন্দাজ করলেও।

সর্বস্ব ত্যাগ করে, প্রাসাদের বাইরে এসে যেন মুক্তির আনন্দ পেলুম আমি। কেমন যেন হালকা মনে হতে লাগল নিজেকে। মাথা থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নামিয়ে নেওয়া হয়েছে আমার! লজ্জা, ভয়, অপমান বা দুঃখবোধ কোন কিছুই ছিল না তখন আমার। আমি আর রাশিয়ার জার আলেকজান্দার নই, একথা ভাবতেই আমার আনন্দ হ'ল। আর আনন্দ হ'ল আশাহীন, পরিচয়-হীন, সাধারণ ভবঘুরে ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্‌ আমি, ভাবতে।

তারপর যাত্রা সুরু হ'ল—নিরুদ্দেশ যাত্রা। হাঁটতে সুরু কল্লাম সেই গভীর রাতে নিঃসাড়ে চুপি-চুপি। পায়ে-হাঁটার অভ্যাস না থাকলেও, যেন কোন্ অলৌকিক প্রভাবে হেঁটে চলতে লাগলাম! নিশীথ যেন ডেকে নিয়ে চলেছে আমায়! চলতে চলতে নগরের বুক থেকে গ্রামে এসে পড়লাম আমি। নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি, মাঝে মাঝে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ আর বাদুড়ের ঝটপট ওড়ার শব্দ আমায় বিদায়-অভিবাদন জানাচ্ছিল কেবল।

ভবঘুরের মত সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ঘুরলাম! সাধারণতঃ খুব কম ভ্রমণকারীর জীবনেই এমনি ঘোরার নেশায় চাপে। কিন্তু মাথার ঝুঁটি ধরে যেন কে ঘোরাল আমায়! রাশিয়ার মধ্যেই এদেশ-ওদেশ, বহুদেশ ঘুরলাম আমি। কত বিপর্যায়, যন্ত্রণা, দুঃখকষ্ট, মারধোর, ভিক্ষা, কারাবাস—সবেরই স্বাদ পেতে হয়েছে আমাকে। পুলিশ ধরে আমার ঘরদোর ও পরিচয়-পত্র না পেয়ে মেরেছে—নাম জিজ্ঞাসা করায় বলেছি ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্‌। একবার এমনি একটা ব্যাপারে সাইবেরিয়ায় দেশান্তরী হলুম আমি এবং সেখান থেকে নড়বার আর আমার হুকুম রইল না! সাইবেরিয়ায় অনেকে আমাকে ধার্ম্মিক ফকির বলত, পাগলও বলত কেউ-কেউ। আমি ধর্ম্ম-মন্দিরে গির্জ্জায় গিয়ে মাঝে-মাঝে আশ্রয় নিতাম ও বসে থাকতাম; চেয়ে-চিন্তে

...েও মঠাধ্যক্ষদের কাছে। এইভাবে টোমস্কের ধর্ম্মাশ্রয়ীদের আশ্রমের প্রধান ...দের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল, তিনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করলেন এবং আমি একদিন তাঁর কাছে আমার জীবনবৃত্তান্ত সব বলে ফেলতে বাধ্য হলাম।

সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে শোনার পর তিনি আমায় দীক্ষা দিলেন ... তাঁর হরমোভ নামক ধনী শিষ্যকে আমার জন্য একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম মন্দির করে দিতে আদেশ করলেন: এবং তিনি ক্রমশঃ প্রচার করতে লাগলেন যে, এ-যুগে একজন মানুষ ...দিলেন। আমার পূর্ব্বজীবনের কোন কথাই তিনি কারুর কাছে বললেন নি কোন ...। যারা আমায় ভবঘুরে ভিক্ষুক জানত, তারা ক্রমশঃ আমায় ধার্ম্মিক ভগবৎ-...সী জানল। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বিখ্যাত সন্ন্যাসী হয়ে উঠলাম। দিনের পর দিন আমার কাছে লোকও আসতে আরম্ভ করল অগুণতি।

এমনি সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। একদিন বিরাট এক গাড়ী এসে আমার মন্দিরের সামনে থামল এবং একজন বৃদ্ধা তার ভেতর থেকে নেমে এলেন। ঘরের মধ্যে আমার কাছ বরাবর এসেই সাশ্চর্য্যে আমার দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ্যা, তুমি? তুমিই সেই আলেকজান্দার জার?'

'কার কথা আপনি বলছেন? আমি ফিয়োডোর কুশমিচ', উত্তরে বললাম আমি। ...কে চিনতে আমার দেরি হয়নি।

তিনি বল্লেন, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি প্রিন্সেস ...রিশকিনা, আপনাকে সেন্ট্ পিটার্স্‌বার্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি। এখন সমগ্র রাশিয়ার ধর্ম্মশাসক হিসাবে থাকবেন আপনি।'

'আমি এখন কেবলমাত্র এই ছোট ধর্ম্ম-মন্দিরটিরই রক্ষক। এর পরিচর্য্যা করেই এখন আমি খুশি। কোন ভাবনা-চিন্তাই আজ নেই আমার, পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী লোক খুব কমই আছে,' উত্তরে বল্লাম আমি।

'ধনরত্ন, বাবুগিরি ও বড়মানুষিপণা সবগুলিই সুখের অন্তরায়। আমি এখানেই জীবনের সুখশান্তি পেয়েছি—এখান থেকে কোথাও, কোন কিছুতেই আর আমার আকর্ষণ নেই—জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত এই আমার পরম শান্তির স্থান।'

● রুশ সম্রাট প্রথম জারের মৃত্যুরহস্য
দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধা আমার পায়ের উপর মুখ রেখে চুম্বন করলেন এবং তাঁর গায়ের সমস্ত হীরে জহরত যা ছিল, পায়ের কাছে খুলে রেখে বিদায় নিলেন।"

'ইউরোপের ত্রাণকর্ত্তা' নামক পাণ্ডুলিপি এইখানেই প্রায় শেষ হয়েছে। কুশ্‌মিচের কাছে বহু দূর-দেশান্তর থেকে বহু ধনী, গণ্যমান্য লোক আসত দেখা করতে—ধনরত্ন গয়নাগাটিও দিয়ে যেত অনেকে; কিন্তু তিনি সেগুলি গরীব-দুঃখী ধনহীনদের দান করে দিতেন তাদের প্রয়োজনমত। শোনা যায়, ছদ্মবেশে তাঁর কাছে তৃতীয় জার আলেকজান্দার, দ্বিতীয় নিকোলাস প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও দেখা করতে গিছলেন।

টোমস্কের সেই ধর্ম্ম-মন্দিরেই ধার্ম্মিক ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্ অথবা প্রথম জার আলেকজান্দার দেহত্যাগ করেন। আজও তাঁর কবর সেখানে আছে এবং কবরের উপর লেখা আছে: '১৮৬৪ সালের আগস্ট মাসে এইখানে ফিয়োডোর কুশ্‌মিচ্ নামক জনৈক গরীব সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন চিরবিশ্রাম লাভ করেছে।'

এই সমস্ত ঘটনার পরও সহজেই মনে এই সন্দেহ জাগে যে, তাহ'লে আসল ফিয়োডোর কুশ্‌মিচের দেহ কফিনের ভেতর থেকে সরিয়ে, আলেকজান্দারের কাঠের মূর্ত্তি সেখানে রাখল কে? এ সম্বন্ধে কেউ-কেউ বলেন, হয়ত রোগশয্যা থেকে উঠে জারের পত্নী এলিজাবেথ কফিন খুলে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, অথবা সেই গৃহ-চিকিৎসক ও তার ভৃত্য, সাধারণ একজন ভবঘুরের দেহ রাজবংশের উপাসনাগারে রাখা অত্যন্ত অশোভন বিবেচনা করে, গুপ্তভাবে এই কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিটিকে কফিনের মধ্যে রেখে, আসল দেহটিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছিলেন। কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা এরপর এই রহস্য উদ্ঘাটনের ভার পুলিশের হাতে দিয়েছিলেন কিনা জানতে পারা যায়নি।

আঁধারে আলো

● সারাজীবন ভগবানের নাম করে মানুষ যে সুফল পায় না, একটি মুহূর্তের জারের কাছে তুমি হয়তো তাই পাবে।

—প্রাচীন পারস্য-উপদেশ



মহেশের কীর্ত্তি

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা ও প্রায় বস্ত্রহীন যে ছেলেটি এসে সেদিন দরজায় দাঁড়াল এক মুঠো ভাত পাওয়ার আশায়, তার বয়স বোধহয় বারো-তেরো বৎসরের বেশী নয়।

তার চেহারার পানে তাকিয়ে হঠাৎ নবনী নবনীর মতই দয়ায় গলে গেল!

তাকে দাঁড়াতে বলে নবনী ছুটলো দিদির কাছে।

ভগ্নীপতি শ্রীশবাবু তখন অফিসে যাওয়ার তাড়ায় খেতে বসেছেন। এই নয়টা বেলার মধ্যে দিদির রান্না-বান্না সব শেষ হয়ে গেছে এবং সে রান্নাও দুই-একটি পদে শেষ হয়নি, আট-দশটি পদের সমষ্টি!

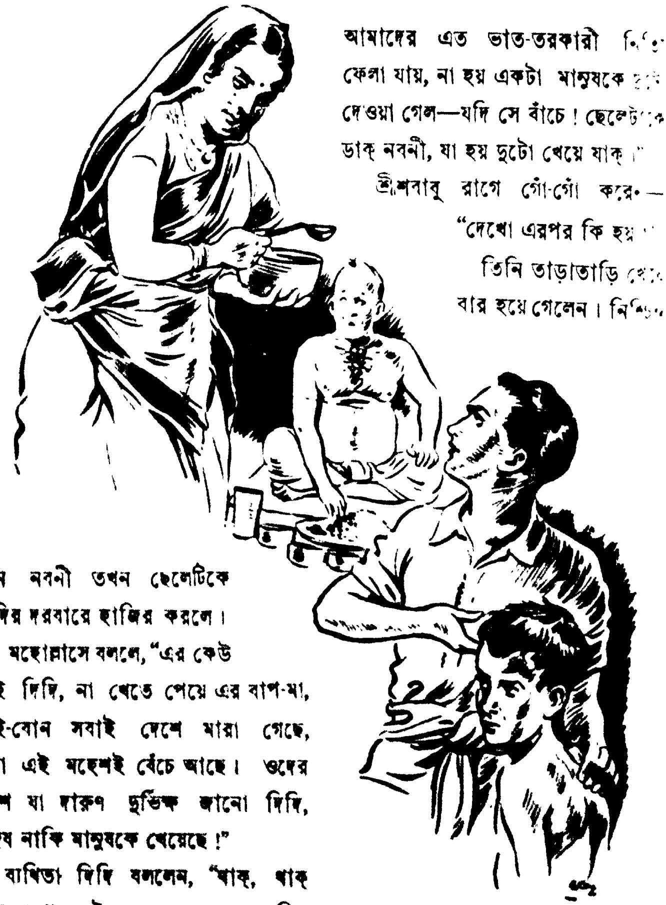
নবনী আবেদন জানালে ছেলেটির পক্ষে, শ্রীশবাবু সবেগে মাথা নাড়লেন—"না, না, ওসব ভেজাল বিদেয় কর—এখনি বিদেয় কর। আজকালকার দিনে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। আজ যাকে খেতে দেবে, কাল সে বুকে ছুরি বসাবেই দেখে নিয়ো!"

মর্ম্মাহত নবনী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কিন্তু সে বড় রোগা আর খুব ছোট ছেলে, ছুরি বসানোর ক্ষমতা তার নেই দাদামণি!"

ভাইটির মুখ দেখে দিদির মনে এতটুকু দয়া জেগেছিল। বললেন, "যাক্ গিয়ে!

আমাদের এত ভাত-তরকারী
ফেলা যায়, না হয় একটা মানুষকে
দেওয়া গেল—যদি সে বাঁচে! ছেলেটা
ডাক্ নবনী, যা হয় দুটো খেয়ে যাক্।"

শ্রীশবাবু রাগে গোঁ-গোঁ করে—
"দেখো এরপর কি হয়
তিনি তাড়াতাড়ি
বার হয়ে গেলেন। নি



মর্মাহত নবনী বললে, "বড় রোগা আর খুব ছোট......" [পৃঃ ২৫৯

মনে নবনী তখন ছেলেটিকে দিদির দরবারে হাজির করলে।

মহোল্লাসে বললে, "এর কেউ নেই দিদি, না খেতে পেয়ে এর বাপ-মা, ভাই-বোন সবাই দেশে মারা গেছে, একা এই মহেশই বেঁচে আছে। ওদের দেশে যা দারুণ দুর্ভিক্ষ জানো দিদি, মানুষ নাকি মানুষকে খেয়েছে!"

বাথিতা দিদি বললেন, "থাক্, থাক্ ওসব কথা—তুই বড় যা-তা কথা বলিস্

নবনী! এসেছে যখন থাক্! তুই তো শীগ্‌গিরই কাজে যাবি, একটা চাকরের দরকার হবে। তখন মহেশকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি, ও তবু তোকে দেখতে-শুনতে পাবে!"

নবনী ভারী খুসি হয়ে উঠলো।

—"ঠিক বলেছো দিদি! কুড়ি দিনের ছুটি তো শেষ হয়ে এলো—আর দিন তিনেক পরেই আমাকে যেতে হবে। এর মধ্যে মহেশ নিশ্চয়ই অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে—কি বলিস মহেশ?"

মহেশ শুধু হাসলে।

নবনীর মিলিটারী কাজ। আফ্রিকার যেখানে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে, সেইখানে সে কাজ করে—দীর্ঘদিন আহত অবস্থায় হস্পিটালে থেকে ভালো হয়ে কুড়ি দিনের ছুটিতে সে বাড়ী এসেছে।

ছুটির পর নবনী আবার রওনা হলো আফ্রিকা-অঞ্চলে—সঙ্গে তার রয়েছে বারো বৎসরের ভৃত্য মহেশ। অবশ্য তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে কর্তৃপক্ষের কাছ হতে অনুমতি নিতে হয়েছে।

শ্রীশবাবু বক্রমুখে বললেন, "আবার ওটাকে নিয়ে চললে কেন নবনী? যুদ্ধের জায়গা—একে নিজেকে নিয়েই সেখানে সকলে বিব্রত, তার মধ্যে আবার এই এক ভেজাল চললো সঙ্গে-সঙ্গে—"

মহেশ কেঁদে ফেললে।

হঠাৎ সে নবনীকে ভালোবেসে ফেলেছে, সে ঠাকুর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে নবনীর কাছ হতে সে কোথাও যাবে না। এই তিন-চারদিন সে তার প্রাণঢালা সেবায় নবনীকে ভারি খুসি করে দিয়েছে।

নবনী চোখ টিপে তাকে আশ্বাস দিলে।

শ্রীশবাবুর কোন যুক্তি টিকলো না—মহেশ একদিন নবনীর সঙ্গে আফ্রিকা রওনা হলো।

● মহেশের কীর্তি
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

নবনী একটা গ্রুপের ইনচার্জ্জ—সাহস ও শক্তির জন্য এর মধ্যেই সে বেশ নাম করে ফেলেছে! তোব্রুক দখলে তার অনেকখানি কৃতকার্য্যতা ছিল এবং সেই দখলের সময়ই সে নিদারুণ আহত হয়। প্রায় মাস-তিনেক তাকে হস্পিটালে থাকতে হয়—সুস্থ হয়ে সে কলকাতায় দিদির কাছে এসেছিল।

মহেশ বড় খুসি—আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে সে যাচ্ছে। মনের আনন্দে সে বললে, "আমায় একটু যুদ্ধ করতে দেবেন দাদাবাবু? আমি খুব ভালো যুদ্ধ করতে পারব। আমাদের মেদিনীপুরে কত যুদ্ধই যে দেখেছি।"

মেদিনীপুরে যুদ্ধ?—নবনী অবাক হয়ে যায়।

উৎসাহিত মহেশ বললে, "হাঁ দাদাবাবু! যাত্রা-থিয়েটারে রাজারা তরোয়াল নিয়ে কত যুদ্ধই যে করে, তা আর কি বলব! তোমরাও তো তেমনি করে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করবে দাদাবাবু? ও-যুদ্ধ আমি অনেক দেখেছি—"

জার্ম্মান যুদ্ধের ভয়াবহতা এইটুকু ছেলে কিইবা বুঝবে—কিইবা জানবে? কিছুদিন আগে কলকাতায় যে বম্বিং হয়ে গেছে, তারই সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। মেদিনীপুর জেলার কোন্ গণ্ডগ্রামে তাদের বাড়ী—সহর সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

কলকাতায় এসে দু'একদিনে সে যা দেখেছে, তা শুধু দেখেছে মাত্র; তার মনে কিছুই দাগ কাটতে পারেনি, কারণ ক্ষুধার জ্বালা ছিল তার কাছে তখন অত্যন্ত বড়।

আফ্রিকার পথে সে দেখতে পেলে অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ, অসংখ্য সোল্জার, অসংখ্য প্লেন,—সে দেখতে পেলে অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্র—বোমা, কামান! তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ এ-যুগে যে চলে না, তা সে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও বুঝতে পারলে।

নবনী জিজ্ঞাসা করে—"ভয় হচ্ছে মহেশ?"

মহেশ মাথা নাড়ে—"না দাদাবাবু—"

নবনী বুঝতে পারে সে ভয় পেয়েছে,—সেই জন্যই সে বলে, "ছাখ্, এখনও যদি ফিরতে চাস, আমি তোকে পাঠিয়ে দিতে পারি মহেশ!"

মহেশ সজলনেত্রে বলে, "আমি নেমকহারাম নই দাদাবাবু! সেদিন আপনি আমায় ভাত খেতে না দিলে আমি মরে যেতুম, সেকথা আমি কোনদিন ভুলব না।

আমি যতদিন বাঁচব, আপনাকে ছেড়ে যাব না; সব সময় আপনার কাছে থাকব।" সে যেন নিবিড়ভাবে পোষা কুকুরের মতই নবনীকে জড়িয়ে ধরে।

তোব্রুক বিজয় হয়েছে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা যায় না—জেনারেল রোমেল আবার কোন দিক হতে কোন সময় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করবেন, কে জানে?

এতটুকু ছোট ছেলেকে এখানে আনার পক্ষপাতী কেউই হলো না। নবনীর উপর ওয়ালা মিঃ ডিকেন্স স্পষ্টই বললেন, "এইটুকু ছেলেকে এনে তুমি বিব্রত হয়ে পড়বে ক্যাপ্টেন রায়,—ওকে আবার আনলে কেন বল দেখি?"

এদের কথা না বুঝলেও মহেশ বেশ বোঝে, তাকে নিয়ে আসার জন্য নবনীর কাছে এরা কৈফিয়ৎ চায়। সে নবনীকে আরও আঁকড়ে ধরে, তার আহত হাতখানায় ওষুধ দিতে-দিতে সজল চোখে বলে, "আমার জন্যে এতটুকু বিব্রত হতে হবে না দাদাবাবু! এখানে আবার যুদ্ধ বাধলেও আমি সাবধানে থাকতে পারব।"

নবনী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

জেনারেল রোমেলের সৈন্যদল এদিকে ফিরেছে, কথাটা তোব্রুকে ছড়িয়ে পড়লো।

কর্ণেল বুথ আদেশ করলেন, "পাঁচ নম্বর সৈন্যদলকে আজ শেষরাতে রওনা হতে হবে, রোমেলকে মাঝপথে বাধা দিতে হবে।"

পাঁচ নম্বর রেজিমেন্টের অন্তর্গত নবনী।

আর সকলের সঙ্গে সেও তৈরী হয়ে নিলে। মহেশ শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কোথায় থাকব দাদাবাবু?"

নবনী বললে, "তুই এখানেই থাকবি মহেশ! আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসব আশা আছে। এর মধ্যে যদি জার্ম্মানীরা আক্রমণ করে—এরা যেসব শেলটারে জায়গা নেবে, তুইও সেখানে থাকবি।"

শেষ রাত্রির অন্ধকারে পাঁচ নম্বর সৈন্যবাহিনী একজন কর্ণেলের নেতৃত্বাধীনে

জেনারেল রোমেলকে পথিমধ্যে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলো। কয়েক ঝাঁক প্লেন ইতিপূর্বে প্রেরিত হয়েছে—তারা উপর হতে বোমা ফেলে যতদূর পারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

এদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

ভারতীয় সৈন্য বেশীরভাগ চলে গেছে, এখানে যারা আছে তারা সংখ্যায় কম। সকলেই যুদ্ধায়োজনে ব্যস্ত, এর মধ্য হতে ক্ষুদ্র মহেশ যে কোন্ দিক্ দিয়ে সরে পড়েছে, তা কেউই দেখেনি।

"সোঁ—ও—ও—ও—"

জার্ম্মানীর প্লেন এসে পড়লো!

একখানি দু'খানি নয়—অসংখ্য—ঝাঁকে-ঝাঁকে অনেক উপরের আকাশে ঘুরছিল,—সাঙ্কেতিক শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকেরা আশ্রয়স্থলে লুকিয়েছে,—জার্ম্মানীর প্লেনসমূহ অজস্র বোমা ফেলে সমস্ত ধ্বংস করে ফিরে যাওয়ার পথে বাধা পেলে। ইংরাজের প্লেনগুলি আকাশে উঠে তাদের চলার পথে বাধা দিলে—বহু জার্ম্মান-বিমান ধ্বংস করে তারা ফিরলো।

আশ্রয়স্থল হতে সকলেই বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে বহু মৃতদেহ পড়ে ছিল,—যারা যুদ্ধ দিচ্ছিল, তারা বীরের মত মৃত্যুকে বরণ করেছে—বিপক্ষের প্লেন ধ্বংস করেছে।

মহেশ গেল কোথায়? সকলের নামের তালিকা করতে গিয়ে দেখা গেল, মহেশ নাই! তার মৃতদেহও পাওয়া গেল না।

অতটুকু একটা ছেলের জন্য কে আর ভাবে? তোব্রুকে বৃটিশ সৈন্যেরা আবার দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

পাঁচ নম্বর রেজিমেন্ট চলেছে…

নিঃশব্দে তারা চলেছে। এরা গেরিলা ফাইটার—এদিক-ওদিক লুকিয়ে থেকে জার্ম্মান ও ইটালীয়ান সৈন্যদের বাধা দেবে—হত্যা করবে।



বেলা শেষ হয়ে এসেছে—

অদূরে মরুভূমির ধু-ধু বালুকারাশি দেখা যায়। এই পথ দিয়ে মরুভূমি পার হয়ে আসছে রোমেলের নেতৃত্বাধীনে ট্যাঙ্ক, মোটর ও পদাতিক বাহিনী।

অধ্যক্ষের আদেশে পাঁচ নম্বর রেজিমেণ্ট বিচ্ছিন্নভাবে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

নবনী ও আর্ণল্ড একই স্থানে লুকিয়েছিল—ওদিককার মরুভূমির পথে মোটরের শব্দ শোনা যায়—একখানি নয়—অন্ততঃপক্ষে আট-দশখানি মোটর বহুদূরে বিন্দুর আকারে দেখা দিয়েছে।

আর্ণল্ড সোৎসাহে বলে উঠলো, "আমাদের মোটর! মেজর আলা যুদ্ধের উপকরণ নিয়ে আসছেন তোব্রুকে। জার্মানীরা এপথে আসবার আগেই ওঁরা তোব্রুকে যাবেন নিশ্চয়ই—"

কিন্তু তার আশা মিথ্যা—

"সোঁ—ও—ও—ও—"

কয়েকখানি এরোপ্লেন বাতাসের মত কোন্ দিক দিয়ে ভেসে এলো, কে জানে? দেখা গেল, মোটরের ড্রাইভারেরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বালুকারাশির উপর দিয়ে দ্রুত মোটর চালিয়ে নিয়ে চলেছে,—তবু তারা পারলে না—তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

শ্যেনপক্ষীর মত তিনখানি প্লেন সোঁ করে নিচের দিকে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হলো—দুম্ দুম্ দুম্!

মুহূর্তমধ্যে গভীর ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল—মোটর কয়খানিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, দু-তিনখানি মোটর ধু-ধু করে জ্বলছে। ড্রাইভারেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কে মৃত, কে জীবিত, তা এতদূর থেকে বোঝা যায় না।

"হায় ভগবান্!"

নবনীর মুখে একটি অস্ফুট শব্দ বার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর্ণল্ড জিভ দিয়ে মুখে

একটা অস্পষ্ট শব্দ করলে—যেটা শুধু নীরব থাকার সঙ্কেতটাই বুঝায়। সবই একেবারে নীরব, নিঃশব্দ হয়ে গেল।

প্লেনগুলি যেমন এসেছিল—তেমনই সোঁ-সোঁ করে চলে গেল। তাদের বিকট ঘর্ঘর শব্দ—মুহূর্ত্ত পরে আর শোনা গেল না।

যে কাজের জন্য তারা এসেছিল, সে কাজ তাদের সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; যুদ্ধের সরঞ্জাম সহ যে কয়খানি মোটর তোব্রুকে চলেছিল, সব কয়খানি পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। যে কয়জন লোক তাতে ছিল, তারা সবাই মারা গেল,—তোব্রুকে পৌঁছে খবর দেওয়ারও কেউ রইলো না।

মোটর-বাইকের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

জার্ম্মান সৈন্যদল আসছে—আসছে—

মুহূর্ত্তে যে যেখানে ছিল, প্রস্তুত হয়ে নিলে। সব নিস্তব্ধ—জোরে যেন নিঃশ্বাসটিও পড়ে না!

নবনী একবার চোখ মুদে তার দেশকে মনে করে, তার মাতৃসমা দিদিকে মনে করে—যিনি মাতৃহারা এই ভাইটিকে এক বৎসর বয়স হতে লালনপালন করে এত বড়টি করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে, যে ছোট ছেলেটিকে সে সঙ্গে করে তোব্রুকে নিয়ে এসেছে।

হায় অভাগা মহেশ!

এতটুকু ছেলে—তাকে না আনলেই ভালো ছিল—সে স্বচ্ছন্দে দিদির কাছে থাকতে পারতো। কেন মহেশ তাকে এতখানি ভালোবাসে? মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে কেন সে তার সঙ্গে এতদূরে তোব্রুকে এলো?

সামনে দিয়ে একসঙ্গে বারোখানা মোটর-বাইক চলেছে—তারপরে খানিক দূরে পথের বাঁকে আবার সেই বারোখানা আসছে। এমনই কত বারোখানা আসছে, তাই বা কে জানে?

জার্ম্মান সৈন্য—অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, প্রত্যেকেরই মোটর-বাইকের সামনে ছোট-ছোট মেশিন-গান,—সামনে বাধা পেলে তারা ফায়ার করবে।

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!

গুলি ছুটলো—সঙ্গে-সঙ্গে বারোটি মোটর-বাইক থেমে গেল—বারোজন সেনানীর মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

নবনী ও আর্নল্ড দুখানা বাইক দখল করে বসলো, আর আটজন বাকি আটখানি নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে পিছনের বারোখানা বাইক এসে পড়লো—মেশিন-গান ছুঁড়বার আগেই তারাও ধরাশয্যা নিলে।

এর পরই চললো হাতাহাতি যুদ্ধ—

মাত্র কয়েক শত গেরিলা সৈন্য—কিন্তু তারা প্রত্যেকে একশত সৈন্যের সমান। মরিয়া হয়ে তারা যুদ্ধ করছিল। তারা মরবে, কিন্তু মেরে মরবে, তারা বাঁচতে চায় না।

শত্রুসৈন্য একজন নবনীকে লক্ষ্য করে একটা হাতবোমা ছুঁড়বার উপক্রম করতেই আর্নল্ড চেঁচিয়ে উঠলো—"সাবধান ক্যাপ্টেন!"

সঙ্গে-সঙ্গে সে রিভলভার ছুঁড়লো—অব্যর্থ লক্ষ্যে সৈনিকের বক্ষ বিদীর্ণ করলে।

কিন্তু বেশীক্ষণ তারা পারলে না—অসংখ্য শত্রুসৈন্যের মাঝখানে তারা যুদ্ধ করতে-করতে ধরাশয্যা গ্রহণ করছিল।

মাথায় নিদারুণ আঘাত পেয়ে নবনী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার চেয়ে তার মৃত্যুই ভালো ছিল। জ্ঞান হয়ে সে দেখতে পেলে, সে শত্রু-দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে; সোজা কথায়—সে বন্দী হয়েছে।

নবনী অধর দংশন করলে,—তার চারিপাশে জার্ম্মান সৈন্যেরা তাকে বিদ্রূপ করছিল, নীরবে সে শুনে গেল।

একজন জার্ম্মান তার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বিদ্রূপ করলে, "কি হে ভারতবাসী, ইংরেজ তোমায় রাজ্য দেবে, না রাজকন্যা দেবে বলে যুদ্ধে এনেছে?"

নবনী উত্তর দিলে না।

তাকে নিয়ে তারা চললো। কেবল সেই নয়, আরও কয়েকজন সৈনিককে সে তার চারিদিকে দেখলে,—এরা সবাই বন্দী হয়েছে।

অন্ধকার অচেনা পথ বেয়ে তারা পৌঁছাল জেনারেলের শিবিরে।

জার্ম্মান জেনারেল ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসলেন—সৈনিকদের পানে চেয়ে বললেন, "যেখানে অন্য বন্দীদের রাখা হয়েছে, সেইখানে এঁদের রাখ নিয়ে, পরে এঁদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে।"

সৈনিকেরা বন্দীদের নিয়ে চললো—কোথায় কতদূরে বন্দী-নিবাস, কে জানে?

দিনের পর দিন যায়—নবনী হতাশ হয়ে পড়ে।

এদের মুখেই সে শুনতে পায়—তোব্রুকের পতন হয়েছে, বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে—অনেককে তারা বন্দী করে ইটালীতে পাঠিয়েছে।

মহেশের কথা নবনীর মনে হয়—বেচারা মহেশ! কেনই বা সে এলো?

সেদিন বন্দীদের খাবার দিতে যে কয়টি লোক এসেছিল তাদের একজনের মুখে সে শুনতে পেলে, একটি ভারতীয় ছেলেকে তারা পেয়েছে—ভারী চটপটে—ভারি চালাক! ভাষা সে না বুঝলেও ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝে নিয়ে ঠিক সেইমত কাজ করে। জার্ম্মান সৈন্যেরা তার কথা বুঝতে পারে নি; শেষে একজন বাংলা-জানা লোক এসে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছে, তার কাছে ছেলেটির পরিচয় তারা পেয়েছে।

—নাম? তার নামটা কি?

জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে নবনী চেপে যায়,—দরকার নেই এদের সঙ্গে কোন কথা বলে।

একদিন দূর হতে সে যে ছেলেটিকে একজন জার্ম্মান সৈন্যের সঙ্গে যেতে দেখলে—সে যে মহেশ ছাড়া আর কেউ নয়, তা বুঝতে নবনীর দেরী হলো না।

এদেরই মুখে সে বিদ্রূপ শুনতে পায়—

ভারতীয় ছেলেটি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ইংরেজ রাজত্বে তারা

সুখে বাস করে না, খেতে-পরতে পায় না, শুকিয়ে-শুকিয়ে রাস্তার ধারে মরে, এ সব কথা সেই ছেলেটিই এদের বলেছে।

মহেশ! বিশ্বাসঘাতক মহেশ!

নবনী নিজের আঙুল নিজেই কামড়ায়। এই বিশ্বাসঘাতক ছেলেটিকে সে যদি নিজ হাতের কাছে পায়, তার গলা টিপে সে তাকে হত্যা করবে—কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। দেশের কলঙ্ক—জাতির কলঙ্ক মহেশ!

নবনী দাঁতের উপর দাঁত রাখে—

জার্ম্মান সৈন্যরা তাকে বিদ্রূপ করে—সে যে বাঙ্গালীর গৌরব করে—ওই ছেলেটিও না সেই বাঙ্গালী-শ্রেণীভুক্ত? তাকে এরা বড়লোক করে দেবে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে গড়বে, তারপর চাই বাংলার শাসনকর্ত্তা-রূপে তাকেই পাঠাবে। তারা দেখাবে জার্ম্মান জাতি কত বড়, কত মহানুভব—কত উন্নত!

নবনী মাঝে-মাঝে মহেশকে দেখতে পায়। সে এদের সঙ্গে ঘোরে, ফাই-ফরমাস খাটে,—নবনীর পানে ফিরেও চায় না।

নবনীর মুখ বিকৃত হয়ে উঠে—নেমকহারাম! মহেশ নেমকহারাম—

মনের মধ্যে সে এতটুকু বেদনাও অনুভব করে।

ছেলেমানুষ মহেশ, ভালো খাবার, ভালো পোষাক, ভালো ব্যবহার পেয়েছে; সে ভুলে গেছে। সে জানে না তার দেশের, তার জাতির, তার রাজার কি সর্ব্বনাশ সে করছে! একটিবার নবনী তাকে নিজের কাছে পেলে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারতো, এ তার সৌভাগ্য নয়—তার সর্ব্বনাশ!

দুম্ দুম্—শব্দ শোনা যায়। ইংরেজের আক্রমণ—ইংরেজ ও আমেরিকা, এই যুক্তপক্ষ আক্রমণ চালিয়েছে।

মুহূর্ত্তে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা জাগলো—কেউ যুদ্ধের দিকে ছুটছে, কেউ বা শেলটারে আশ্রয় নিচ্ছে—

"বাবু—দাদাবাবু!"

● মহেশের কীর্ত্তি
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পিছনে কে ডাকে ?

নবনী ফিরে চেয়ে দেখলে, মহেশ। নবনীর দুটি চোখ ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো—বিশ্বাসঘাতক মহেশ, জাতির কলঙ্ক মহেশ বন্দী-নিবাসে অসহায় বন্দী নবনীর কাছে এসেছে সে পরিহাস করবার জন্যেই কি ?

ক্রুদ্ধ নবনী গর্জ্জে উঠলো—"পালা বলছি, বেশী কাছে আসিস্ নে বলছি, এখনই তোকে খুন করে ফেলব—রাগ সামলাতে পারব না।"

মহেশ থমকে দাঁড়াল কিন্তু ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, "এর পর কিন্তু আর পালানোর সময় পাবেন না দাদাবাবু! জার্ম্মানীরা সব পালাচ্ছে, যুদ্ধ করছে। এই বেলা আপনি এই পোষাকটা পরে মাথায় এই টুপিটা দিয়ে পালিয়ে আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দেব।"

"মহেশ!"

বিস্ময়ে নবনী মহেশের পানে তাকায়, আশ্চর্য্য হয়ে যায় সে!

সাহস পেয়ে মহেশ এগিয়ে এলো, তার জামার নিচে একটা পোষাক, হাতে একটা টুপি—

সে বললে, "আমি কয়েকজন ইংরেজ বন্দীকে এদের পোষাক পরিয়ে পথ দেখিয়ে বার করে দিয়ে এসেছি। লিবিয়া ইংরেজ দখল করেছে—এখান হতে বেশী দূর নয়। তারা এগিয়ে গেছে,—আপনিও শীগ্‌গির আসুন দাদাবাবু! এখনি ওরা এসে পড়লে, আপনি তো ধরা পড়বেনই—আমাকেও গুলি করে মারবে। ওরা জানবে, এই সব বন্দীদের মুক্ত করবার জন্যেই আমি ওদের চাকর হয়ে দিনরাত খাটছি।"

নবনী দুই হাতে ক্ষুদ্র মহেশকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

মহেশের চোখে জল আসছিল, সামলাতে-সামলাতে সে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "শীগ্‌গির করুন দাদাবাবু! দেরী করবেন না। আমি আপনার জন্যেই এদের হাতে ধরা দিয়েছি দাদাবাবু! এরা আমায় কত মারে, কত গাল দেয়, সব সহ্য করে রয়েছি—একদিন সুযোগ পেয়ে আমি আপনাকে নিয়ে পালাব, এই আশায়। ওদের সঙ্গে কতদিন কতবার আপনার সুমুখ দিয়ে গিয়েছি, আপনার পানে চাই নি—পাছে

ওরা জানতে পারে, আপনার সঙ্গে আমার চেনা-জানা আছে ! তা হলে এদিকে আমায় রাখবে না, একা চলাফেরা আমি করতে পাব না। নিন্—এবার তাড়াতাড়ি করুন—"

তার কথা-বলার অবকাশে নবনী পোষাকটি পরেছিল ; মাথায় হেল্‌মেট্ বসিয়ে সামনের দিকে সে টেনে দিলে, যাতে হঠাৎ কেউ তার মুখ না দেখতে পায় !



বোমা ফেলে—মেশিন-গানে যুদ্ধ চালিয়ে······

বোমা ফেলে—মেশিন-গানে যুদ্ধ চালিয়ে অনেক লোককে হতাহত করে বৃটিশ বিমান তখন ফিরে যাচ্ছে।

পলায়িত-প্রায় সৈন্যের মত নবনী ছুটলো—তার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছিল ক্ষুদ্র মহেশ—

কত মৃতদেহ পদদলিত করে—কত মাইল ছুটে একটা পাহাড়ের সানুদেশে এসে তারা পৌঁছাল,—নবনী রীতিমত হাঁকাচ্ছে, মহেশ অত ক্লান্ত হয় নি।

সোৎসাহে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে মহেশ চেঁচিয়ে উঠলো—"ঠিক জায়গায় এসেছি দাদাবাবু! ওই দেখুন, মিত্রপক্ষের লোকজন দেখা যাচ্ছে—ওদের ছাউনি দেখুন—"

খানিকক্ষণ বসে দম ফেলে নবনী উঠে দাঁড়াল—জার্ম্মানীর পোষাক টান দিয়ে ফেলে সে মহেশকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "তোকে ভুল বুঝেছিলুম মহেশ,—তার জন্যে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

"আমি আপনাকে ফেলে কোথাও যাব না দাদাবাবু, মহেশ আপনার কেনা গোলাম হয়েই থাকবে। আমার কেউ নেই দাদাবাবু, ভগবান তাই আপনাকে আমায় দিয়েছেন—"

মহেশ দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুলে-ফুলে কেঁদে উঠলো।

আঁধারে আলো

● আমার স্থির বিশ্বাস যে, ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্ম-বোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। আর বাংলাদেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা।

—শ্রীঅরবিন্দ



"ছুটে পালাও দাদা"

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

মাঠের পথে কাঠের গাড়ী ছুট্‌ছে তাড়াতাড়ি,
সাঁঝের আগেই আজের মত ফির্‌তে হবে বাড়ী।
কাঠের গাড়ী মজার ভারি, কল-কব্জা ভরা,
চোঙা দিয়ে উড়ছে ধোঁয়া চল্‌ছি ছুটে ত্বরা।
সাম্‌নে কেহ পড়লে পরে তেড়ে বাজাই বাঁশি,
জঙ্গল আর দূরের পাহাড়, পার হয়ে সব আসি।
নীল্‌চে গাড়ী লাল চাকাতে বন্‌বনিয়ে চলে,
হাওয়া খেয়ে ফির্‌ছি মোরা লাল-মানুষের দলে।
পথের বিপদ নাইকো কিছু, নাইকো কোনো বাধা,
খালি মাঠের ঢালু পথে চালাও জোরে দাদা!
জোর্‌সে চলো, হর্ষে মোদের মনটি মেতে ওঠে,
এমন মজার আজব গাড়ী কেউ দেখেনি মোটে।

নিজের হাতের তৈরি গাড়ী, দেখ্‌তে নেহাৎ সোজা,
কর্‌লে পরখ্‌, কেরামতি তবেই যাবে বোঝা।
অনেক মাথা খাটিয়ে মোরা তৈরি করি গাড়ী,
তোমরা কেহ চড়্‌লে এতে আরাম পাবে ভারি।
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই মজার গাড়ী চড়ে,
নিজের চোখে না দেখ্‌লে তা বুঝ্‌বে কেমন করে?
আমি, দাদা, ভাইটি খাঁদা চলি সোয়ার হয়ে,
দাদা চালায় মোদের গাড়ী একান্ত নির্ভয়ে।
মাঠ ছাড়িয়ে যেই এসেছি, হঠাৎ হোলো একি!—
আচম্‌কা যে থাম্‌লো গাড়ী, বিগ্‌ড়ে গেল দেখি!
এই সেরেছে, সব যে মাটি, বিকল হোলো গাড়ী,
বিকেলবেলা কেমন করে ফির্‌ব তবে বাড়ী?
তড়াক্‌ করে লাফিয়ে দাদা নাম্‌লো গাড়ী থেকে,
মেরামতের যন্ত্র-পাতি নামায় একে একে—
এক নিমেষে সারিয়ে দেবে, চিন্তা নাহি কিছু,
গলদ কোথায়, দেখ্‌ছে দাদা মুখটি করে নীচু।
এমন সময় হঠাৎ ও কে? বিরাট বিকট দেহ,—
রাক্ষসেরই মাস্‌তুতো ভাই, নাই কোনো সন্দেহ!
পিছন হতে বাড়িয়ে গলা মুখখানা তার মেলে
কপাৎ করে খাঁদা-ভায়ের মুণ্ডুখানা গেলে!
হাতের ছাতি ছট্‌কে পড়ে রক্ষা নাহি বুঝি,
রাক্ষসেরই পাল্লাতে আজ পড়্‌ছি সোজাসুজি।
পেটের ভিতর সুরুৎ করে সেঁধিয়ে গেল খাঁদা,
বাঁচ্‌তে যদি ইচ্ছা থাকে, ছুটে পালাও দাদা!

পাম্পসু জুতোর মাপ আগে থাকতে মামাকে পাঠানো হোতো। পুরনো খবরের কাগজে আমরা সারি-সারি পা রেখে দাঁড়াতুম, আর মা একগলা ঘোমটা দিয়ে দিদিমার হিসেব লেখার কলমের হ্যাণ্ডেলটা দোয়াতে ডুবিয়ে আমাদের পায়ের চারিদিকে ঘোরাতেন। দিদিমার কড়া আদেশ ছিলো, পায়ের মাপ যেন একটু বড় করে নেওয়া হয়; ফলে, জুতো যখন আসতো, মাপের সঙ্গে দাগে-দাগে মিলে যেতো বটে, কিন্তু আমাদের পায়ের সঙ্গে মিলতো না!



মা হ্যাণ্ডেলটা দোয়াতে ডুবিয়ে পায়ের চারিদিকে ঘোরাতেন।

মেলাবার কাজটা দিদিমা করে দিতেন। তক্তপোষের উপর এক বাণ্ডিল ছেঁড়া কাপড় নিয়ে তিনি বসে থাকতেন এবং হিসেব করে যার জুতো যতটা বড় হোতো, ঠিক ততটা ছেঁড়া ন্যাকড়া জুতোর ভেতর বুড়ো আঙুল রাখবার জায়গায় দিতেন ঢুকিয়ে। সেই জুতো পরে তাঁর সামনে খানিকক্ষণ আমাদের হাঁটতে হোতো। নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আমাদের পায়ের দিকে তিনি চেয়ে থাকতেন। নতুন জুতো পায়ে দিয়ে প্রাণটি হাতে করে আমরা ঘোরাফেরা করতুম এবং দিদিমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাইরের ঘরে এসেই জুতো জোড়া খুলে ফেলে বাঁচতুম!

আমাদের আটপৌরে বুট জোড়া ছিলো আরো ভয়ানক! কিসের চামড়া দিয়ে যে সেগুলো বানানো হোতো, তা কেবল ভগবান এবং দিদিমাই জানতেন। অমন রাক্ষুসে চামড়া জীবনে দেখিনি! একবার পরলে পায়ের চামড়া শুদ্ধু তুলে আনে।

● চিত্র লেখক
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সে-জুতোগুলো দিয়ে আমরা দেয়ালে পেরেক পুঁততুম, ক্রিকেটের স্ট্যাম্প ঠুকতুম, মাঞ্জা দেবার জন্যে শিশি-বোতল গুঁড়োও করতুম।

আমাদের ছেলেবেলায় জুতোর অভাব না থাকলেও, জুতো বড় একটা পরতেই পেতুম না আমরা। দিদিমার চোখের বাইরে গিয়েই মাটিতে থেবড়ে



তাঁর সামনে বাবকতক হাঁটতে হোতো। [পৃঃ ২৭৮

বসে যে-যার জুতো-গুলো পা থেকে উপড়ে ফেলে বাঁচতুম! ব্যাপারটা সম্ভবত দিদিমার অজানা ছিলো না, কারণ, সমস্ত খুঁটিনাটি খবরই তিনি জানতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে বিশেষ তিনি খিটখিট করতেন না, মাঝে-মাঝে শুধু কটমট করে চাইতেন। সেই চাউনিটাই যথেষ্ট ছিলো।

● শিশু মহল
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বাড়িতে আমাদের সমবয়েসী ছেলেরা তখন বেড়াতে এলে, সবচেয়ে আগে তাদের জুতোর দিকেই আমার নজর পড়তো। হালকা, সুন্দর জুতো তাদের পায়ে। পায়ের ঠিক মাপেই—হাঁটতে-বেড়াতে তাদের মুখচোখ বিকৃত হোতো না দেখে মনে-মনে কী হিংসেটাই না হোতো! মনে-মনে ভাবতুম, বড় হলে নিজে যখন জুতো কিনবো, তখন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবার আগেই দিদিমার চোখে চোখ পড়তো। তিনি যেন কী রকম কট্‌মট্‌ করে চাইতেন। বুকটা দুরদুর করে উঠতো। মনে হোতো, আমার মনের কথা তিনি যেন পড়ে ফেলেছেন। ভয় পেতুম বটে, কিন্তু দিদিমা কোনো কথা বলতেন না। কেন বলতেন না তখন বুঝতুম না, এখন খানিক বুঝি।—দিদিমা নিশ্চয়ই মনে-মনে আমাকে তখন অভিশাপ দিতেন। নিশ্চয়ই যে দিতেন, বড় হয়ে সেটা প্রমাণ হয়ে গেলো।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে, কলকাতায় এসে হোস্টেলে উঠলুম। হাতে কিছু টাকা ছিলো। সেই টাকা নিয়ে প্রথমেই গেলুম এক ভালো জুতোর দোকানে। এক-রাশ জুতো নামালুম। অনেক বেছে, পাকা দেড় ঘণ্টা ধরে পছন্দ করে এক জোড়া ফিতেবাঁধা খয়েরি রঙের অক্সফোর্ড-শু নিলুম। পরে দেখলুম, চমৎকার ফিট করেছে! দোকানের চটের কারপেটের উপর বার-কয়েক এদিক-ওদিক করলুম। পায়ে যে জুতো আছে, মনেই হোলো না। কিন্তু পরের দিন কলেজ যাবার সময় পরতে গিয়ে দেখি—হরি-হরি, সে জুতো পায়েই ঢোকে না। অনেক ধস্তাধস্তি করলুম, কিন্তু কোনো ফল হোলো না। বিকেলবেলায় ক্যাশমেমো আর জুতো জোড়া নিয়ে দোকানে ছুটলুম। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, আমার অভিযোগ শুনে দোকানী নিজে হাতে সে জুতোটা পরিয়ে দিলো—কোনো কষ্টই হোলো না। পায়ের সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে গেলো! খানিক অবাক হয়ে বসে রইলুম। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারলুম না!

কিন্তু পরের দিন সকালে কলেজ যাবার সময় সেই একই কাণ্ড! কিছুতেই পায়ে ঢুকলো না সেই জুতো! ফলে, বিকেলবেলায় সে জুতো জোড়া ফেরৎ দিয়ে তার চেয়ে দু'-সাইজ বড় এক জোড়া জুতো কিনলুম। পরের দিন কলেজ যাবার সময় দেখি, জুতোর

মধ্যে পা ঢুকেছে এবং পা-টা গোটা ঢুকে গিয়েও আঙুল-চারেক জায়গা ফাঁকা রয়েছে। উপায় জানা ছিলো। বাক্স থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বার করে জুতোর মধ্যে ঢোকালুম, তারপর সেই জুতো পায়ে গেলুম কলেজে।

সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখলুম। দেখলুম, সেই উঁচু তক্তপোষে দিদিমা বসে রয়েছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কট্‌মটে, কিন্তু ঠোঁটের পাশে সামান্য একটু হাসি!

ঐ ঘটনার পর অনেক দিন কেটে গেছে। নানা পরিবর্তন ঘটতে দেখেছি। দিদিমা আর ইহজগতে নেই। আমিও এখন ছাত্র নই। নিজে রোজগার করি। খুশিমতো জিনিস কিনতেও পারি। কিন্তু নিজের পায়ের মাপের জুতো কখনো কিনতে পারলুম না। অনেকবার চেষ্টা করে, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমার পায়ে এখন যে জুতো জোড়া দেখবে, সেটা অন্তত পায়ের চেয়ে দু' ইঞ্চি বড়। ভিতরে ছেঁড়া কাপড়। বড় একটা হাঁটি না। বাস-ট্রাম থেকে নেমে কোনো রকমে জুতো সমেত পা দু'টো নিয়ে রিক্সায় উঠি এবং সমস্ত পথ মানুষের পায়ের দিকে দেখতে দেখতে যাই।

কত অসংখ্য পা, কত অসংখ্য জুতো—ঠিক মাপে-মাপে মিলে গেছে! কিন্তু তাদের কারুর উপরে দিদিমার প্রভাব বা অভিশাপ নেই!

আঁধারে আলো

● ইংরাজ শ্রমিকরা কি নিজেদের মাখন ও রুটির কথা ব্যতীত আর কোন কিছুর কথা ভাবিতে পারিবে? তাহাদের নিজেদের রুটিতে মাখন মাখাইবার পর ভারতের বুভুক্ষু নরনারীর জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কি?

—পার্ল-বাক



যারা একদিনে পৃথিবীতে এল

—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

আমার দুই ভাইপো লব-কুশকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ বিভ্রাটে পড়তে হয়। দু'জনে বেচারারা একই দিনে প্রথম পৃথিবীতে হাজির হয়েছিল, তাই ব'লে চেহারার মধ্যে অতটা মিল থাকবে কেন? ভারী অন্যায় বলতে হবে! ছেলেবেলায় ঐ চেহারার মিলটা ছিল যেন আরও বেশী। ফলে, একজন দোষ করলে আর একজনের ভাগ্যে তর্জন হজম করা বা একজনের গুণপনায় অন্যের বাহবা পাওয়া—দু'টোই চলত সমানে। এখন একটু বড়সড় হওয়ায়, চেহারার মিল কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু যেদিন দু'ভাই চুল ছাঁটে, সেদিন তাদের সনাক্ত করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

যমজ ভাইবোন নিয়ে এরকম গোলমালের কথা প্রায়ই শোনা যায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি যমজ ভাই বা বোনের একজন হও, তবে আমার কথার সত্যতা অবশ্যই বুঝবে। তোমরা "হাসিরাশির" সেই বিখ্যাত যমজ রামু-শ্যামুর কবিতা নিশ্চয়ই পড়েছ। সারা জীবন এক অপরের কর্মফল ভোগ ক'রে, শেষটায় একজন সাপের কামড়ে মারা পড়ল; আত্মীয়স্বজন চিনতে না পেরে আর একজনকে নিয়ে শ্মশানে পুড়িয়ে এল! ঠিক এতটা ভুল না হ'লেও, যমজদের নিয়ে বিভ্রাট অনেক সময়েই হয়—বিশেষ ক'রে যদি তাদের চেহারা এক রকম হয়।

এই তো সেদিন আমিই এক কাণ্ড ক'রে বসেছিলাম! পথে যেতে যেতে কলেজের এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। অনেক দিন পরে দেখা, একসময়ে বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল। ভাবলাম,

খুব চমকে দেব। সামনা-সামনি না গিয়ে পেছন থেকে কাঁধে এক চড় মারতেই, লোকটি ফিরে দাঁড়াল। গম্ভীরভাবে বললে, "আপনাকে চিনতে পারছি না তো!"

আমার অবস্থাটা ভাব একবার! বোকা ব'নে গিয়ে আমতা-আমতা ক'রে বললাম, "সুরেন না?" লোকটি এবারে হেসে ফেলল। বলল, "না, আমি তার ভাই।"

যমজ নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প শোনা যায়। একটা শোন: ঘটনাটি অবশ্য এদেশের নয়—আমেরিকার।

দু'টি যমজ ভাই। দু'টিই বেশ চালাক, কিন্তু স্বভাব কারোই সুবিধের নয়। জাল-জোচ্চুরিতে দু'জনেই ওস্তাদ্। পুলিশের চোখ এড়িয়ে কিছুদিন ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এক মাস পর-পর দু'জনেই ধরা পড়ে হাজতে গেল। যখন বিচার হ'ল, দেখা গেল—একজন ইতিপূর্ব্বেই দু'মাস হাজতে কাটিয়েছে, অন্য ভাইও একমাস হাজতে আছে। জজ হুকুম দিলেন, হাজত-বাসের দিন থেকে দু'জনকেই তিন মাস ক'রে জেল খাটতে হবে; অর্থাৎ একজন খাটবে দু'মাস, অন্য জন খাটবে আর এক মাস।

রায় তো বেরল, জেলারও ভাই দু'টিকে নিয়ে জেলে পুরল। কিন্তু বেচারার দুর্বুদ্ধি, দু'জনকেই পুরল একঘরে! দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল, তার পরেই বাধল মুশকিল! একজনকে এইবার ছেড়ে দিতে হবে; কিন্তু কেউ আর ঠিক করতে পারে না, কোন্‌টিকে। যে ভাইএর এবার ছাড়া পাবার কথা—দু'জনেই নিজেকে সেই ভাই ব'লে পরিচয় দিতে লাগল। শেষটায়, নিরুপায় হয়ে দু'জনকেই ছেড়ে দেবার হুকুম দেওয়া হ'ল; কারণ, একজনের অপরাধে অপরকে অধিকতর বড় শাস্তি দিতে আইনে নিষেধ আছে।

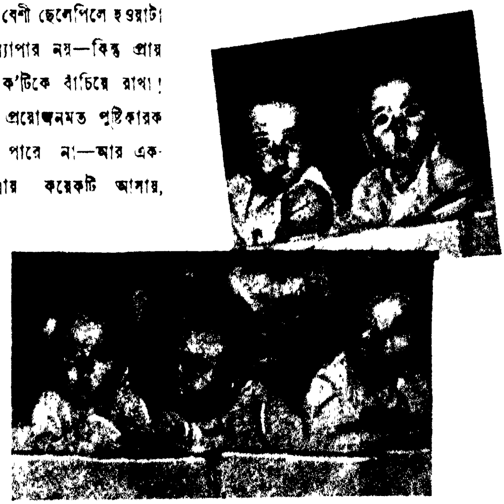
আর একটা গল্প শোন। এটিও ওদেশের গল্প, তবে এই যমজ দু'টি ভাই নয়, বোন। একজনের বিয়ে হবার পরে কি কারণে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায়, সে স্বামীকে ছেড়ে চ'লে যায়। স্বামী অনেক দিন স্ত্রীর কোন খোঁজ পায়নি, হঠাৎ একদিন এক ছোট্ট শহরে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা; কিন্তু স্ত্রী তাকে কোনদিন দেখেছে ব'লেই স্বীকার করল না। স্বামীও নাছোড়বান্দা! স্ত্রীকে যখন এতদিন পরে ফিরে পেয়েছে, আর ছেড়ে দেবে না। প্রথমে মিষ্টি কথায় কাকুতি-মিনতি ক'রে মাপ চেয়েও যখন কিছু হ'ল না, তখন সে আদালতের শরণ নিল। আদালতে গিয়ে জানা গেল, যাকে সে স্ত্রী ব'লে দাবী করেছে, সে সত্যি তার স্ত্রী নয়—স্ত্রীর যমজ বোন!

দু'টি যমজ ভাই কি বোন নিয়েই য'দি এত গণ্ডগোল হয়, তবে এক সঙ্গে তিনটি-চারটি বা তারও বেশী ভাই বা বোন জন্মালে কি ব্যাপার হয়, ভাবতে পার? তোমরা কেউ কেউ হয়তো হেসে

● যারা একদিনে পৃথিবীতে এল
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বলবে—"হ'লে, খুবই ভাবনার কথা ছিল, কিন্তু তা কি আর সত্যি হয় ?" কিন্তু সত্যিই হয়। এ পর্যন্ত একসঙ্গে তিনটি—চারটি—পাঁচটি—ছ'টি—এমন কি সাতটি পর্যন্ত ছেলেমেয়ে হবার কথা শোনা গেছে। এই সেদিনও—এই প্রবন্ধ লেখবার সপ্তাহখানেক আগে, কাগজে দেখছিলাম, বিহারের কোন্ গ্রামে একটি স্ত্রীলোকের একসঙ্গে চারটি মেয়ে হয়েছে। অবশ্য তার কোনটিই খুব বেশীক্ষণ বাঁচে নি।

একসঙ্গে দু'টির বেশী ছেলেপিলে হওয়াটা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়—কিন্তু প্রায় অসম্ভব তাদের সব ক'টিকে বাঁচিয়ে রাখা! মায়ের শরীর থেকে প্রয়োজনমত পুষ্টিকারক খাবার তারা পেতে পারে না—আর একসঙ্গে একের জায়গায় কয়েকটি আসায়, স্বভাবতঃই হয় তারা খুব দুর্বল। বিশেষ রকম যত্ন না নিতে পারলে তাদের টিকিয়ে রাখাটাই কষ্টকর। কিন্তু চেষ্টা করলে যে, একেবারে বাঁচিয়ে রাখা যায় না, তা মনে ক'র না। উদাহরণ স্বরূপ, এইস্থলে 'ডিওনে কুইনের' নাম করা যেতে পারে।



'ডিওন কুইন' বা ডিওনের পঞ্চ-যমজ

ডিওন কুইন্ট্‌প্লেট্—সংক্ষেপে বলা হয় ডিওন কুইন। বাংলা করলে দাঁড়ায় ডিওনের পঞ্চ-যমজ। এই বিখ্যাত পাঁচ বোনের নাম শুনেছ কি? আজ থেকে প্রায় এগার বছর আগে, ১৯৩৪ সনে ক্যানাডার অন্টারিও প্রদেশের ক্যালাণ্ডার নামে এক ছোট্ট সহরে এক দিনে এই পাঁচ বোনের আবির্ভাব হয়। যমজ ছেলেমেয়ে সে দেশের লোকে অনেক দেখেছে, কিন্তু এক সঙ্গে পাঁচ-পাঁচটি বোনের জন্ম একেবারেই নতুন। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপার যখন ঘটলই, তখন যাতে তাদের বাঁচিয়ে

রাখা যায়, তারই ব্যবস্থা দরকার সকলের আগে। যে ডাক্তার জন্মের সময়ে হাজির ছিলেন, তাঁর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। ভদ্রলোক প্রথমটা খুবই 'নার্ভাস' হয়ে পড়েছিলেন। তুলোর বাক্সে শু'য়ে, ফোঁটা ফোঁটা 'রাম' চুষিয়ে খানিকক্ষণ তো মেয়ে ক'টিকে তাজা রাখা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিশেষজ্ঞদের কাছে খবর গেল—অতঃপর কি কর্তব্য!

আমেরিকা হুজুগের দেশ। তা ছাড়া খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে খবরটা কম লোভনীয় নয়। তারাই বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে খবর দিল, তাপ সমান রাখবার জন্যে যে 'ইন্‌কিউবেটর' যন্ত্র পাওয়া যায়, তারই মধ্যে ক'টিকে রাখা হোক্।

কাছাকাছি কোথাও সে যন্ত্র পাওয়া গেল না। এক খবর-কাগজ অফিস থেকে তারও ব্যবস্থা হ'ল। তাদেরই একজন প্রতিনিধি এরোপ্লেনে ক'রে একশ' মাইল উড়ে এসে, যথাস্থানে একটি যন্ত্র পৌঁছে দিয়ে গেল। মেয়ে ক'টিও বেঁচে গেল।

তারপর হ'ল আর এক কাণ্ড। শিকাগো সহরে ঐ সময়ে একটা বড় প্রদর্শনী হচ্ছিল। এক ব্যবসাদার খবর পেয়ে তখনই ছুটল ক্যালাণ্ডারে। মেয়েদের বাপ মিঃ ডিওনকে মোটা টাকা দিয়ে মেয়ে ক'টিকে প্রদর্শনীতে দেখাবার আয়োজন ক'রে ফেলল সে। কিন্তু সে দেশের গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত তা'তে বাদ সাধলেন। বল্লেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার—একে এভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে না,—স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট মেয়ে ক'টির লালনপালনের ভার নেবেন।

সেই থেকে অণ্টারিও গভর্ণমেণ্ট থেকেই পাঁচ বোনের খরচ চালান হ'তে লাগল। সে খরচ কি সোজা! সুরুতেই সপ্তাহে দেড়শ' ডলার অর্থাৎ আমাদের হিসাবে প্রায় চার পাঁচশ' টাকা! ডাক্তার, নার্স, চাকর, দাসী—কোন রকম তোয়াজের ত্রুটী রাখা হ'ল না। তারপর হ'ল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা।

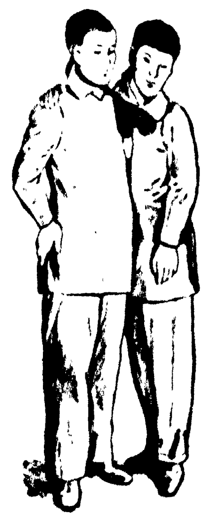
ডিওন কুইনের দৌলতে তাদের বাপ মাই কেবল বড়লোক হয়ে উঠলেন না—তাদের ছোট্ট সহরটি শুদ্ধ সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তাদেরই কল্যাণে সেখানে মস্ত হাসপাতাল বসল, বড় বড় রাস্তা হ'ল, দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, সিনেমা—কিছুই হ'তে বাকি রইল না। কারণ, প্রতি বছর পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে হাজার হাজার লোক প্রকৃতির এই অদ্ভুত বৈচিত্র্য দেখবার জন্য সেখানে ভিড় করতে লাগল।

যমজ ভাইবোনদের মধ্যে শুধু যে চেহারার সাদৃশ্য দেখা যায়, তা নয়—সময় সময় নানা বিষয়ে এত অদ্ভুত মিল দেখা যায় যে, শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে না। একজন ডাক্তার এই রকম একযোড়া যমজ ভাইএর চালচলনের বর্ণনা দিয়েছেন।

● যারা একদিনে পৃথিবীতে এল
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

এই দু'টি ভাই নাকি একসঙ্গে পড়ত—ঠিক এক রকম নম্বর পেত, অর্থাৎ তাদের মস্তিষ্ক ঠিক একভাবে চলত। একবার দু'জনকে দু'ঘরে বসিয়ে একই মাপ্ টুকতে দেওয়া হয়। পরে দেখা গেল, দু'জনেই ঠিক এক জায়গায় একই রকম ভুল করেছে! এদের একজনের জ্বর হ'লে অপর একজনেরও জ্বর হ'ত, একজনের মাথা ধরলে অন্য জনও তার হাত থেকে রেহাই পেত না।

কিন্তু সব যমজ ভাইবোনই যে, সব সময়ে দেখতে এক রকম হয়, তা নয়। দু'টি যমজের একটি ভাই, একটি বোন—এ রকম তো হামেশাই দেখা যায়, চেহারায়ও অনেক সময় বিশেষ মিল দেখা যায় না; যেমন সহোদর ভাইবোনে মিল থাকে—তার বেশী কিছু নয়।



শ্যামদেশের যমজ

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য যমজ বোধ হয় তারা, যাদের শরীর এক সঙ্গে যোড়া থাকে। এদের বলা হয় শ্যামদেশের যমজ। এরা দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, কিন্তু শরীর (বুকের কাছে, পিঠের কাছে বা অন্য কোন জায়গায়) একত্র যোড়া। চলতে ফিরতে, শুতে-খেতে কক্ষণো তাদের আলাদা থাকবার উপায় নেই। শুনলে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এমন বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই—যদিও ব্যাপারটা কচিত কখনো ঘটে। আমি এরকম এক যোড়া মারাঠি মেয়েকে দেখেছিলাম। কলকাতায় ১৯২৯ সনে যে কংগ্রেস হয়, তারসঙ্গে একটা প্রদর্শনী হয়েছিল; তাতে এদের দেখান হয়েছিল। তখন তারা বেশ বড়সড় হয়েছে। নাম ছিল তাদের গঙ্গাবাঈ আর গৌরীবাঈ। তারপরে আর তাদের কথা শুনি নি।

তোমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে, এরকম যোড়া মানুষের নাম শ্যামদেশের যমজ হ'ল কেন? কারণ আর কিছুই না—এই ধরণের এক যোড়া মানুষ প্রথম দেখা গিয়েছিল শ্যামদেশে, যদিও তারা আসলে ছিল চীনা। ১৮০১ সনে এদের জন্ম হয়। বাপ মা আদর ক'রে নাম রেখেছিল, চ্যাং আর এং। এই অদ্ভুত মানুষ দু'টি আবিষ্কৃত হবার পর, তাদের নিয়ে খুব হৈ-চৈ প'ড়ে যায় এবং নানা জায়গায় তাদের দেখিয়ে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা হয়। তাই দু'টি একত্র যুক্ত থাকলেও লাফ-ঝাঁপে ছিল বেশ ওস্তাদ; খেলাধুলায় তারা সমানে যোগ দিত; আর সাঁতারেও ছিল খুব পটু। কিছুদিন সার্কাসের দলে কাজ ক'রে, শেষে তারা আমেরিকায়

নিউইয়র্ক সহরে স্বাধীনভাবে বাস করতে থাকে এবং চাল-চলনে আমেরিকানদের মতই হয়ে যা। সবচেয়ে মজার কথা, এই ভ্রাতৃযুগল আমেরিকান দু'টি মেয়েকে (দু'টি বোন) বিয়ে করতেও কসুর করে না এবং এং-এর বারোটি ও চ্যাং-এর দশটি ছেলেমেয়েও হয়। ছেলেমেয়েদের কেউই অবশ্য বাপ-খুড়োর মত যোড়া ছিল না।

এং-চ্যাং ৬৩ বছর বেঁচেছিল। কিন্তু তাদের শেষ জীবনের কাহিনী বড় করুণ। চ্যাংই আগে মারা যায়। হঠাৎ একদিন জলে ভিজে সর্দ্দি নিয়ে বাড়ী ফেরে এবং সেই রাতেই তার মৃত্যু হয়। এং কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল; কিন্তু যখন জানল, তার চিরসাথী ভাই আর জীবিত নেই, তখন তার বুঝতে বাকি রইল না যে, সেও আর বেশীক্ষণ নেই। ডাক্তারেরা বলেন, সেই আতঙ্কেই ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে তারও মৃত্যু হয়।

এং-চ্যাংএর পর ওরকম যোড়া মানুষ আরও কিছু কিছু দেখা গেছে। গঙ্গাবাঈ আর গৌরীবাঈ-এর কথা তো আগেই বলেছি। অস্ত্রোপচার ক'রে এদের আলাদা ক'রে দেওয়া যায় কিনা, তারও চেষ্টা হয়েছে—কিন্তু ডাক্তারেরা প্রায় সকলেই বলেন, অস্ত্রোপচার করলে আর তাদের বাঁচবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই, সে চেষ্টা বড় একটা করা হয় না। তোমরা বড় হয়ে বিখ্যাত ফরাসি লেখক আলেক্‌জান্দার ডুমার "দি কোর্সিকান্ ব্রাদার্স্" নামে বইটা প'ড়ে দেখো। তাতে এই রকম একযোড়া যমজ ভাইএর কথা আছে। তাদের অবশ্য লেখক অস্ত্রোপচার ক'রে আলাদা ক'রে দিয়েছিলেন।

এতক্ষণ নানা ধরণের যমজের গল্প বললাম, কিন্তু যমজদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা কিছু বলি নি। বাস্তবিক প্রকৃতির রাজ্যে এ এক অদ্ভুত আইন-অমান্যের ব্যাপার বলা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা তাই যমজ নিয়ে কম গবেষণা করেন নি,—এবং এখনও করছেন। তাঁরা বলেন, আমাদের এই যে শরীর, এ আর কিছুই নয়, অসংখ্য জীবকোষ—ইংরেজীতে যাকে বলে 'সেল্'—তাই দিয়ে তৈরী। কিন্তু জন্মের আগে প্রথম যখন মাতৃগর্ভে সন্তানের সৃষ্টি সুরু হয়, তখন এত অসংখ্য কোষ থাকে না, একটিমাত্র ডিম্বাকৃতি কোষ থেকে ঐ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। শিশুর স্বভাব, বুদ্ধি, হাবভাব—যা কিছু গুণ, সবই আসে এই বিশেষ কোষটি থেকে। কোষটি বড় হয়ে পুষ্ট হ'লে, ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায় এবং দু'টি স্বতন্ত্র কোষ তৈরী করে। আবার সে দু'টিও ঠিক আগের মত ভেঙে প্রত্যেকে দু'টি নতুন কোষের সৃষ্টি করে। এমনিভাবে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে তা দিয়ে একটি সম্পূর্ণ মানুষের শরীর গড়ে ওঠে। কিন্তু যমজদের বেলায় ব্যাপারটা হয় একটু অন্য রকম। সে ক্ষেত্রে গোড়াতেই ঐ প্রথমকার কোষটি কোন কারণে চিরে

দু'ভাগ হয়ে যায়, তারপর তা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ক্রমে দু'টি শিশুর শরীর গ'ড়ে তোলে। এইভাবে যে যমজের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে মিল খুব বেশী থাকে—কারণ, তাদের উৎপত্তি একই বিশেষ কোষ থেকে। এরা হয় দু'জনেই ভাই, নয়তো দু'জনেই বোন হয়ে জন্মায়। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন, "আইডেন্টিকাল" বা সদৃশ যমজ।

কোষটি যদি চিরবার সময় কোনভাবে দু'ভাগ না হয়ে তিন, চার বা ততোধিক ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তা হলেই একসঙ্গে তিন, চার বা ততোধিক যমজের জন্ম হবে। আমাদের "ডিয়ন কুইনস" -এর জন্ম হয়েছে এইভাবে। আবার যদি ঐ রকম চিরে দু'ভাগ হবার সময় কোন কারণে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ না হয়ে আংশিক হয়ে থাকে, তা হলেই সৃষ্টি হয় জোড়া মানুষের—অর্থাৎ যাদের বলা হয় শ্যামদেশের যমজ।

কিন্তু সময় সময় এও দেখা গেছে (ডাক্তারেরা ব্যবচ্ছেদ ক'রে হাতে নাতে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন) যে, একেবারে গোড়ায় একটি ডিম্বাকৃতি কোষের বদলে দু'টি কোষ নিয়েও সৃষ্টি সুরু হয়। ঐ দু'টি কোষ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ক্রমে দু'টি শিশুর শরীর গ'ড়ে তোলে। এইভাবে যে যমজের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে অতটা মিল নাও থাকতে পারে—এবং একটি ভাই, একটি বোন হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়! এদের বিজ্ঞানীরা বলেন "নন্‌-আইডেন্টিকাল" বা বিসদৃশ যমজ।

যমজদের নিয়ে আরও নানা ধরণের পরীক্ষা হয়েছে। স্যর গ্যাল্টন নামে এক বৈজ্ঞানিক দেখিয়েছেন যে, বংশের ধারা বা বংশানুক্রম নিয়ে গবেষণা করতে হ'লে, যমজদের নিয়ে পরীক্ষা করলে আশ্চর্য ফল পাওয়া যেতে পারে। দু'টি সদৃশ যমজের শরীরের রক্ত, মাংস, হাড় ধরতে গেলে সবই এক। এখন, পরীক্ষা ক'রে যদি দেখা যায় যে, তাদের দু'জনের শরীরেই একটা বিশেষ রকম ব্যারামের বীজ পাওয়া যাচ্ছে বা শরীরে অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, ওটা তাদের বংশগত—অর্থাৎ ও-রোগ বা ও লক্ষণ বংশানুক্রমিক। ঐ রকম দু'টি যমজ যদি একত্র না থেকে, দু' জায়গায় দুই বিশিষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়, অথচ তাদের দু'জনেরই শরীরে ঐসব লক্ষণ সমানভাবে থাকে, তবে তো কথাই নেই! এইভাবে পরোক্ষভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও যমজের সাহায্যে নানারকম গবেষণা হচ্ছে। এ বিষয়ে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যমজতত্ত্ব গবেষণাগারের নাম করা যেতে পারে। সেখানকার অধ্যাপক জোন্স-এর অধীনে একদল গবেষক ছাত্র প্রায় পাঁচশ' জোড়া যমজ নিয়ে তাদের জীবনের সুরু থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার পরীক্ষা করছেন, আর তার ফলাফল লিপিবদ্ধ ক'রে যাচ্ছেন। এঁদের পরীক্ষা যখন শেষ হবে, তখন হয়তো যমজদের সম্বন্ধে অনেক রহস্যই জানা যাবে।

সুদূরের বাণী

সঙ্কল্প

স্বদেশের সেবায় যাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছেন এবং বিনিময়ে দারিদ্র্য ও দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই লাভ করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? দেশকে ভাল-বাসিবার অপরাধে যাঁহারা দুঃখ-দৈন্য সহ্য করিয়াছেন, এসো, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি নিবেদন করি এবং তাঁহাদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে আমাদের যথাশক্তি সাহায্য করি।

● সুভাষচন্দ্র বসু



রামায়ণ মহাভারতের যুগেও এসব ছিল

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

তোমরা এমন অনেক জিনিসই আজও তোমাদের আশেপাশে দেখতে পাও এবং হয়ত নিয়ে খেলাও করো বা চড়ে বেড়াও, যা সেই কোন্ ত্রেতাযুগে রামায়ণের কালেও ছিল, দ্বাপর যুগে মহাভারতের আমলেও ছিল; অর্থাৎ সেই বেদের সময় থেকে বা তারও আগে থেকে এমন কতকগুলি জিনিস মানুষ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছিল, যা আজকের দিনের মানুষরাও ব্যবহার না করে পারে না। যেমন, দাড়িপাল্লা, ছুঁচ, ছুরি, কাঁচি, জাঁতি, যাঁতা, কাস্তে, কুড়ুল, কাটারি, নরুণ, আয়না, ছাতা, বেড়ি, খুন্তি, হাঁড়িকুড়ি, গরুর গাড়ী, লাঙ্গল, বঁটি, শিল-নোড়া, ঢেঁকি, চাবি-কুলুপ, চিরুণী ইত্যাদি। আজ তোমাদের শুধু কতকগুলি প্রাচীন খেলনার জিনিসের কথা বলবো।

তোমরা কি সে জিনিসগুলিকে চেন? বলতে পারো সেগুলি কি, যা নিয়ে একদিন রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন খেলা করেছিলো, যা নিয়ে একদিন যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জ্জুন-নকুল-সহদেব এবং দুর্য্যোধনেরা একশ' ভাই খেলা করতো? এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যা নিয়ে পুরাকালে খেলা করতেন একদিন, আজ এই কলিযুগে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতা-গর্ব্বিত বিজ্ঞান-বলে অগ্রসর ছেলে-মেয়েরাও তাই নিয়ে খেলে?

বলতে যদি না পারো, তাহলে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। প্রথমত, মনে করে দেখ, এই 'দোলনা'! ছোট্ট কচি শিশু প্রথম জীবন আরম্ভ করে, সে 'দোলনা'য় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে, বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই শিশুরাই বালক বালিকা-বেশে গাছের ডালে দড়ির দোলনা ঝুলিয়ে দোল খায়! যৌবনকাল পর্য্যন্ত অনেকেই এই দোলনায়

দোলবার অভ্যাস ছাড়তে পারে না। পিচকিরি নিয়ে রংখেলাও প্রাচীনকালের খেলা।

পুরাকালের আর একটা খেলনাও আজ পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেটার সংস্কৃত নাম 'পদ্মকর্ণিকা'—বাংলায় তোমরা যাকে লাটিম বা 'লাট্টু' খেলা বলো। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও এ খেলা প্রচলিত ছিল।

'নাগরদোলা'য় চড়তে তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালবাসো। এই 'নাগরদোলা' ভারতের বহু প্রাচীনকালের খেলা। এ খেলা প্রথম শুরু হয় 'See Saw' আকারে অর্থাৎ একখানা তক্তা বা একটা কাঠের গুঁড়িকে একখানা উঁচু পাথরের উপর চড়িয়ে, তার দুই প্রান্তে দু'জন চেপে বসে দেহের ভার দিয়ে পর্য্যায়-ক্রমে উপর-নীচেয় ওঠা-নামা করা। তোমরা যারা পুরীর সমুদ্রে স্নান করেছো, তারা স্নানের সময় সমুদ্রের সঙ্গে নেচে নেচে ওঠা-নামা করেছো নিশ্চয়! See-Saw অনেকটা সেই ঢেউয়ের তালে ওঠা-নামার মতো খেলা। সুতরাং এর নাম 'সাগর-দোলা' রাখতে পারো। আর 'নাগরদোলা' তো তোমরা পূজা-পার্ব্বণে, মেলায়, উৎসবে হামেশাই চড়ে থাকো। 'মেরী-গো-রাউণ্ড' অবশ্য নূতন খেলা। ওটা আমাদের দেশে আগে ছিলো না।



পিচকিরি নিয়ে খেলা

'হা-ডু-ডু' বা কপাটি-খেলা আজকাল প্রায় উঠেই গেছে বলা যায়। খুবই অল্প ছেলেরা এখনও এ খেলা খেলে। 'ডাণ্ডাগুলি' খেলাটাও তাই। কিন্তু, এ দুটো খেলাই এদেশের অতি প্রাচীনকালের খেলা। অন্য কোনও দেশে এই খেলা দুটো নেই।

'পাশা-খেলা' এবং 'সতরঞ্চ-খেলা' হ'লো 'ইন্‌ডোর গেমের' মধ্যে, অর্থাৎ যে-খেলা



পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের মিলন—'[illegible]'। [পৃঃ—[illegible]

ঘরের মধ্যে বসেই খেলা যায়। আগে যে-সব খেলার নাম করেছি, সেগুলি 'আউট-ডোর গেমের' মধ্যে, অর্থাৎ ঘরের বাইরে খোলা মাঠে ঐ খেলা খেলতে হয়। 'কিন্তু 'পাশা' বা 'দাবাবড়ে' পুরাকালে রাজসভায় বসেও খেলা হ'তো। বাজী রেখে এই খেলা খেলতে গিয়ে যুধিষ্ঠির কৌরব রাজসভায় শকুনির কাছে হেরে যান; যার ফলে, শেষ পর্যান্ত কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধ বেধেছিল। নলরাজাও এই খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত বনবাসে চলে গেছলেন। 'সতরঞ' বা দাবাবড়ে খেলা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে, 'তাশ' খেলাও তাই। কিন্তু 'পাশা' খেলাটা এখনও ভারতবর্ষেরই বিশেষত্ব হ'য়ে আছে। 'লুডো' অনেকটা এই রকমেরই খেলা বটে, কিন্তু ঠিক পাশা খেলা নয়। 'ক্যারম', 'টেবিল-টেনিস্', 'বিলিয়ার্ড', 'ব্যাগাটেল্', এগুলো বিলিতি 'ইনডোর গেম্' আমরা বিদেশীদের কাছ থেকে খেলতে শিখেছি, যেমন 'আউট-ডোরে' আমরা ওদের কাছে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, লন-টেনিস, রাগবী, গল্ফ্, বেসবল, বাস্কেট-বল প্রভৃতি খেলতে শিখেছি।



তীর ধনুকের খেলা

'মৃগয়া' বা শিকার করতে যাওয়া এদেশের আর একটা প্রাচীনকালের খেলা, যা এখনও এখানে প্রচলিত আছে। এখন ক্রমে ক্রমে অন্য দেশের মানুষেরাও এই খেলায় খুব মেতে উঠেছে। বন্দুক নিয়ে বনে বাঘ-ভাল্লুক শিকার করতে যাওয়া, বড়লোকদের মধ্যে এখন একটা মস্ত সখের খেলা। তাঁরা সব যান তাঁবু নিয়ে, অনেক লোকজন সঙ্গে করে মোটরে চড়ে, টর্চ্চলাইট জ্বেলে! বনের মধ্যে 'মাচা' বেঁধে, মহা সমারোহ করে এখন শিকার করা হয়। কিন্তু সেকালের লোকেরা দুর্দ্দান্ত সাহসী ছিলো। একা বা দু'-চারজন বন্ধু নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বা হাতীর পিঠে বনের মধ্যে ঢুকে তলোয়ার বা তীর-ধনুক দিয়ে বাঘ-সিংহ-গণ্ডার মারতেন—এখনকার বাবু শিকারীদের মতো নিরীহ পাখী মেরে হস্ত কলুষিত করতেন না।

● রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও এসব ছিল ক্ষত্রিয়ের খেলা

'ঘুড়ি' ওড়ানোটাও এদেশের অনেককালের প্রাচীন খেলা। তবে, আজকাল যেমন ছোট ছোট কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো হয়, আগে ত হ'তো না। সেকালে বড় বড় সব কাপড়ের বা তাল-পাতার তৈরী ঘুড়ি মোটা দড়ি বেঁধে ওড়ানো হ'তো। তাকে বলা হ'তো 'ঢাউস' ঘুড়ি। এখনও কোন কোন পল্লী-অঞ্চলে এই 'ঢাউস' ঘুড়ি ওড়ানো প্রচলিত আছে।



মৃগয়া বা শিকার

সাঁতার কাটা, হাইজ্যাম্প্, লংজ্যাম্প্, ভারোত্তোলন, বর্শা-নিক্ষেপ, চাকতি-ছোঁড়া (Disc throw), বাচ্ খেলা (Boat race), দৌড়ের প্রতিযোগিতা, এসবও প্রাচীন কালের খেলা। ভারতবর্ষে বহুকাল থেকে এসব খেলার প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও এ খেলা চলতো, এখন পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় এসব খেলা ছড়িয়ে পড়েছে।

এ ছাড়া আরও কতকগুলো পশুপক্ষী নিয়ে খেলা প্রচলিত ছিল। যেমন, মেড়ার লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই (Bull Fight), মোরগের লড়াই, তিতিরের লড়াই, পায়রা ওড়ানো। আজও এসব খেলা বন্ধ হয়নি। সেই প্রাচীনকাল থেকে এগুলো চলে আসছে পৃথিবীতে। ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই স্পেন দেশের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন খেলা। মানুষের শক্তি, সাহস ও বীর্য্যের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়, এই দুঃসাহসপূর্ণ খেলায়।



বর্শা-নিক্ষেপ

আমাদের দেশের মল্ল-ক্রীড়া বা কুস্তিলড়াও অতি প্রাচীন খেলা। এই কুস্তিলড়া আজকাল অনেক কমে এসেছে বটে, কিন্তু একেবারে উঠে যায়নি! এখনও মাঝে মাঝে

ভারতের নানা প্রদেশে মহাসমারোহে এই কুস্তির প্রতিযোগিতা হ'তে দেখা যায়। দেশের রাজা-রাজড়া, জমিদার ও বড়লোকেরা কুস্তিগির পালোয়ানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মল্লবীরদের সম্মান ও মর্য্যাদা এদেশে আজও যথেষ্ট।

এদেশে পুরুষের খেলাধূলার সুযোগ যতটা আছে, মেয়েদের খেলাধূলার সুযোগ সেদিক দিয়ে অত্যন্ত কম। মেয়েরা ছেলেবেলায় 'চোর-চোর' খেলা, 'কাণামাছি' খেলা, 'ডন ডাণ্ডা' খেলা প্রভৃতিতে যোগ দেয় বটে, কিন্তু মেয়েদের নিজস্ব খেলা হ'ল 'ঘুঁটি-খেলা', 'লাউ-কাটাকাটি', 'বাঘবন্দী', 'টোকা-কোকা', 'একা দোকা', 'পুতুল খেলা', 'বউবাটী', 'রান্না-বান্না', 'চড়ুইভাতি' প্রভৃতি হরেক রকমের ঘরে বসে বসে শান্ত খেলা —যার মধ্যে ছুটোছুটি নেই, চঞ্চলতা বা চাপল্যের অবসর নেই।

কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল, এসব সেই পুরাকালে রামায়ণ-মহাভারতের যুগের মেয়েরাও নিয়ে খেলেছিল, আজকের এই কলিযুগের মেয়েরাও সেইসব পুতুল নিয়েই এখনও খেলছে। উপরন্তু, তারা পেয়েছে সেলুলয়েডের পুতুল, পেপার-পুতুল, মোমের পুতুল—আরও কত কি!

বাঁশী, ভেঁপু, ঢোল, খঞ্জনি, করতাল, মন্দিরা প্রভৃতি যেসব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একালের ছেলেমেয়েরা কান ঝালাপালা করে তোলে, রামায়ণ মহাভারতের যুগের ছেলে-মেয়েরাও এইসব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাড়ীর মধ্যে উৎপাত সৃষ্টি করতো। 'রথ' টানা ব্যাপারটাও সেই পুরাকাল থেকে চলে আসছে। রথের সামনে যে একজোড়া কাঠের ঘোড়া থাকে দেখেছো। সেই কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলাও সেকালে ছিল, এবং একালেও আছে। শুধু তীর-ধনুক ও তলোয়ার নিয়ে খেলার বদলে আজকালকার ছেলেরা কাঠের বন্দুক বা 'এয়ারগান্' এবং 'টয়-পিস্তল' নিয়ে খেলে, দেখি। তাহ'লেও পুরাকালের বাঁশের তীর-ধনুক আর টিনের তলোয়ার এখনও একেবারে অদৃশ্য হয়নি।

বল নিয়ে খেলাও সেকালের ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ খেলার প্রাচীন নাম ছিল 'গেণ্ডুয়া'। বলটা অবশ্য পাম্প-করা চামড়ার বল নয়, কাঠের বা ন্যাকড়ার বল নিয়ে খেলা হ'ত। প্রাচীন পারস্যের পোলো-খেলা আজ য়ুরোপীয়রা গ্রহণ করেছেন। পোলো-খেলা হ'ল ঘোড়ার পিঠে চড়ে লম্বা লাঠি নিয়ে বল খেলা। এ খেলাটি প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো।



জোড় বাংলা

(উত্তর-বঙ্গে প্রচলিত একটি কাহিনী)

—বন্দে আলী মিয়া

জোড়-বাংলার কথা শুনিতেছি বহুকাল—
রূপ তো তাহার নাই কিছু আর—আছে আজ কঙ্কাল !
সে কালে কে এক রাজা নাকি ছিলো—বসতি করিত হেথা,
কি নাম আছিলো জানে নাহি কেহ সে তা !
ছিলো তার কত হাতী আর ঘোড়া—সুবিশাল রাজপুরী,
কোনো দেশে কভু ছিলো না তাহার জুড়ি ।
দেউড়ীতে ছিলো নহবৎ আর ঘরেতে ঘিয়ের বাতি—
লোকজনে পুরী গম্ গম্ দিবারাতি !

মহাসুখে ছিলো রাজা—
তাঁর কাছে সৎ হইত পালিত—দুষ্ট পাইত সাজা।

বছরের শেষে দেশের নবাব নাকি
খবর পাঠালো রাজার কাছেতে—খাজনা আছিলো বাকি।

রাজা বলে দিলো নবাবের দূতে,
"স্বাধীন হয়েছি আমি ;
কারে দেবো কর ?
নিজে আমি ভূস্বামী।"
নবাবের কাছে পৌঁছালো কথা—
শুনে তিনি অস্থির,
হাঁকিয়া কহেন সকলেরে ডাকি'
"কে আছো এমন বীর,
যাও ত্বরা করি
আনিতে তাহার শির।"



সাজ্ সাজ্ রব জাগে চৌদিকে—সাজে যত সেনাদল—
পায়ের তলায় মাটি কাঁপে টলমল।
ঢাল-তরোয়াল হাতে নিয়ে সবে বাহিরায় পুরী হতে,
হাতী আর ঘোড়া চলে আগু-পাছু লড়াই করিতে মতে !
বাজে দ্রিমি-দ্রিম্ নাকাড়া দামামা ঢোলক ঢাক—
মিলিত গলায় হাঁকে বজ্রের হাঁক।

রাজার সেনায় নবাব-সৈন্যে লাগিল ভীষণ রণ,
মেঘে ঠোকাঠুকি জাগে ঘন গর্জ্জন।

● জোড় বাংলো
ছবি আলী মিয়া

রাজার সিপাহী চীৎকার করে "জয় শিব শঙ্কর !"
নবাবের সেনা বলে হুঙ্কারি' "আল্লা হো আকবর !"
সাত রাত ছয় দিন—
দাপটে তাদের কাঁপে আস্‌মান—কাঁপে রে জমিন !
কেহ নাহি হারে, কেহ নাহি জেতে—লড়াই চলেছে ঠিক,
তরোয়াল তীর চলিছে চতুরদিক !

নবাবের সেনা দুটি যদি মারা যায়,
আরো পাঁচজন আসে তার জায়গায়।
রাজার সৈন্য লড়ে আর মরে,
পূরণ হয় না আর,
স্বল্প সৈন্য নিমেষেতে ছারখার !
এমনি করিয়া আরো দিন পাঁচ পরে
রাজার সৈন্য নিঃশেষ-প্রায়—
যত ছিলো বীর দিলো প্রাণ অকাতরে।
রাজা ভাবে মনে—
নিজে সে যাইবে রণে
রাজ্য লাগিয়া যুঝিবে সে প্রাণপণে।
তাতে যদি প্রাণ যায়—
যাউক অসির ঘায়।



এত ভাবি' মনে—
রাজা কহিলেন পুরজনে—
"আমিই চলিনু রণে সাথে নিয়ে নীল কবুতর,
নাহি যদি বাঁচি তবে এ-ই এসে জানাবে খবর।

● জোড় বাংলা
রূপে আলী মিঞা

দীঘির মাঝারে পান্সীতে উঠে যত আছ পরিজন
প্রস্তুত থেকো তোমরা সর্ব্বক্ষণ।
যদি আসি—জেনো মনে, জয় করে ফিরেছি হেথায়।
কবুতর আসে যদি—ভেবো তবে আমি আর নাহিক ধরায়;
ডুবিয়া মরিও সবে ওই সে দীঘির জলে।"
এত বলি' গেল চলে।

প্রচারিল রাজা লড়ায়ের ময়দানে
আপোষেতে সন্ধি হোক—মিছামিছি কিবা ফল হেন রক্তদানে!
নবাবের সেনাপতি হইলেন রাজী—
যুদ্ধের বিরাম হলো—বন্ধ হলো প্রাণবধ এতদিনে আজি।
রাজার শিবিরে এতকাল পরে
নির্ভয়ে সবে ঘুম যায় অকাতরে।
আপন তাঁবুতে দুই পহর রাতে
মাথা রাখি' ডান হাতে
নবাবের সেনাপতি মনে মনে গড়িছে মতলব,
কী করিলে খ্যাতি মান রক্ষা হয় সব!
এতে যদি শঠতারে ঠাঁই দিতে হয়
ধর্ম্মেরে সে করিবে না ভয়।

রাজার শিবিরে
বিনা মেঘে বাজ পড়ে কিরে!

● জোড় বাংলা
মধ্যে আরবী লিপি

রাতের আঁধার মাঝে গর্জ্জিল কামান,
মশাল-আলোয় জ্বলে দানবের ক্ষুধিত নয়ান।
নিশীথ-শয়নে রাজার সেনানী ঘুম যায় অকাতরে—
আগুনের গোলা পড়িলো তাদের 'পরে।
রাজার সৈন্য, হায়—
হাতিয়ার নিতে অবসর নাহি পায়!
যেমন আছিলো যেবা পুড়ে হলো ছাই
সেনাপতি দূরে বসি' চেয়ে দেখে তাই!

পূবের আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে—জেগে ওঠে ধরাতল,
সহসা খুলিয়া গেল পায়রার পায়ের শিকল।
উড়ে উঠি' আসমানে
বায়ুবেগে চলিলো ঘরের পানে।
রাজা চমকিয়া চাহিল আচম্বিতে,
ভয় জাগে তার চিতে।
কবুতর যদি উড়ে সেথা চলে যায়
নিমেষে তা'হলে কী যে ঘটে যাবে হায়!
রাজা আর ভাবিবারে নাহি পারে,
তাড়াতাড়ি উঠি' ঘোড়ার পিঠেতে ছুটে চলে একেবারে।

জনহীন পুরী কেহ নাহি কোথা আর
উদাস-নয়নে চাহে রাজা চারিধার।

● ছোড় বাংলা
মনে আলী মিঞা

তবে কি গো তাই গিয়াছিল যাহা বলে
সব একসাথে ডুবেছে দীঘির জলে ?

সবাকার নাম ধরি' ফুকারিয়া
বারে বারে ডাকি'
সবখানে ঘোরেন একাকী !
নাহি দেয় কেহ সাড়া,
ছিলো যারা আপনার
নাহিক তাহারা !
দীঘির উতল ঢেউ
অবিরাম ঘুরপাক খায়,
বুদ্বুদ ওঠে জলে—
আছাড়িয়া পড়ে কিনারায় ।
পরীর চূড়ার 'পরে
নীল সেই কবুতর
বসে যেন দেখিতেছে
ধরণীর মিছে খেলাঘর !
থমকি' দাঁড়ায় রাজা
স্থির চোখে চাহি' ঊর্দ্ধপানে
কহিল চীৎকার করি',
"হে ঈশ্বর,
তোমার রহস্য হায় কেহ নাহি জানে !
সব তুমি কেড়ে নিলে—অপরূপ বিচার তোমার !!"
এত বলি' ঝাঁপ দিলো দীঘির মাঝার ।



● জোড় বাংলা
বলে আজী মিয়া

প্রাণহীন পুরী কাঁদে—ধনরত্ন ডাকে পিছু হতে
রাজ্যপাট পড়ে রহে অতীতের পথে।

সেই পুরী—জোড়-বাংলা আজি আর নাই
বাতাস নিয়ত ঘুরে কাঁদিছে বৃথাই।
পাঁজা পাঁজা ইঁট শুধু পড়ে আছে হেথা—
লোকে বলে, 'সাপ নাকি থাকে আজ সেথা!'
কেটে গেছে কত যুগ, কত বর্ষ, মাস—
দীঘির কাজল জলে গুমরায় মানবের শেষের নিঃশ্বাস।

আঁধারে আলো

● বিধাতা এ জগতে আসলে-নকলে, আলোকে-অন্ধকারে, সাধুতা ও অসাধুতাতে কেন মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। রামের সঙ্গে একটা রাবণ কেন আছে, তাহা সম্পূর্ণ জানি না। বোধ হয় এই জন্য যে, রাবণকে না দেখিলে রামের মূল্য ভাল করিয়া বোঝা যায় না। পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিলে পুণ্যের বল বাড়ে না।

—শিবনাথ শাস্ত্রী



তুষারের দেশে মৃত্যু

—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

অনেকদিনের কথা। তোমরা নেপোলিয়নের নাম শুনেছ ত? তাঁরই আমলের গল্প এটি।

নেপোলিয়ন যখন সবচেয়ে শক্তিশালী, অর্থাৎ যখন সারা পৃথিবীর লোক তাঁর প্রতাপে কাঁপছে, যখন মনে হ'ত যে তিনি অজেয়, তাঁকে হারাতে পারে এমন কেউই নেই, সারা পৃথিবীই একদিন তাঁর কাছে হার মানবে—সেই সময় তিনি চূড়ান্ত গৌরবের জন্য প্রস্তুত হলেন; একদিন—ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাশিয়া জয় করবার জন্য যাত্রা করলেন।

এর আগে তিনি অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন, অনেক কম সৈন্য নিয়ে অনেক বড় বড় যুদ্ধ জিতেছেন। তাই এবারে যখন বিপুল সৈন্য নিয়ে বেরোলেন, সবাই মনে করলে রাশিয়ার আর রক্ষা নেই। তখন এখনকার মত এত সৈন্য একটা যুদ্ধে লাগত না—নেপোলিয়নের রাশিয়া-অভিযানের আগে একসঙ্গে এতবড় বাহিনী আর কোন যুদ্ধে কখনও যায়নি। সেইজন্য এই বিপুল সেনাদলকে সেদিন নাম দেওয়া হয়েছিল 'গ্র্যাণ্ড আর্মি'—'বিরাট সেনাবাহিনী'। গ্র্যাণ্ড আর্মি যেদিন পূর্ব্বমুখে যাত্রা করল—ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন!

কিন্তু রাশিয়া দেশটিও বড় অদ্ভুত; প্রকৃতি নিজে যেন একে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। উত্তরমেরুর খুব কাছে ব'লে এখানে

অসম্ভব ঠাণ্ডা, গরমের দিনেও এর বহুস্থান বরফে ঢাকা থাকে—শীতকালে ত কথাই নেই! এত বরফ পড়তে থাকে, এত বরফের ঝড় বইতে থাকে যে, ওদেশে যারা বারোমাস থাকে, তারাও একটু অসতর্ক হ'লেই মারা যায়। সবচেয়ে বিপদ এই যে, ঠাণ্ডায় তোমার হাত-পা কিংবা নাক-কাণ যে জমে যাচ্ছে, তা তুমিই টের পাবে না। হঠাৎ এক সময়ে দেখবে যে, সেই বিশেষ অঙ্গটির আর কোন সাড়া নেই, দুদিন পরে সেখানে পচ ধরবে।

নেপোলিয়নের দল যখন রাশিয়ার কাছে এসে পড়ল, তখন রাশিয়ার জার (সম্রাট) দেখলেন যে, এই অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ বীর আর এই বিপুল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই ক'রে জিতবেন, তাঁর এমন কোন ক্ষমতা নেই। তখন তিনি তাঁর দেশের প্রাকৃতিক অবস্থারই সুযোগ নিলেন। রাশিয়ার সৈন্য আর প্রজারা করতে লাগল কি, সামান্য সামান্য যুদ্ধ করে আর পিছিয়ে যায়। ঐভাবে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সময়-নেওয়া। এই সময়-নেওয়ার ফলে নেপোলিয়নের সঙ্গে যে রসদ ছিল, তা ফুরিয়ে যেতে লাগল; অথচ ওখান থেকে যে কিছু যোগাড় করবেন, তার উপায় নেই। কারণ, রাশিয়ানরা পিছিয়ে যাবার সময় সমস্ত শস্য নষ্ট ক'রে গরু-ভেড়া নিয়ে স'রে পড়েছে। না খাবার, না কাঠ, আর না পোষাক! আর ঐ দুর্দ্দান্ত ঠাণ্ডা! যত পুরু গরম পোষাকই তোমরা কল্পনা করো না কেন, সেখানে গেলে মনে হবে যে গায়ে কিছুই নেই।

এধারে এঁরা একটু একটু ক'রে এতটা ভেতরে চ'লে গেছেন যে, চট্‌ ক'রে ফ্রান্স বা জার্ম্মানী থেকে যে কিছু আনাবেন, সে উপায় নেই। তখন ত আর এখনকার মত রেলগাড়ী, উড়ো-জাহাজ ছিল না! তখন ছিল কেবল ঘোড়ার ডাক—খবর পৌছে খাবার আনাতে আনাতে এরা সাবাড় হয়ে যাবে!

আর হ'লও তাই! ভাল ক'রে লড়াই করার আগেই, যুদ্ধ যখন প্রায় জিতে এসেছেন, ঠিক সেই সময়ে নেপোলিয়নকে পিছন ফিরতে হ'ল। ব্যাস্‌, আর যায় কোথা! এইবার রাশিয়ানরা বিপুল বিক্রমে পেছন থেকে আক্রমণ করলে।

অস্ত্র নেই, খাবার নেই, কাপড়-জামা নেই, তার ওপর সাক্ষাৎ যমদূতের মত কসাক সৈন্যদের আক্রমণ! কসাকরা যেমন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, তেমনি নিষ্ঠুর। ওরা মারতেও

ইতস্ততঃ করে না, মরতেও না। হঠাৎ কোথা থেকে যে এসে পড়ে, তার কোন হদিস্ পায় না ফরাসী সৈন্যরা।

শুধু কি কসাক্? এর ওপর আবার আছে নেকড়ে বাঘ! তারা দল বেঁধে ঐ তুষার-মরুতে ঘুরে বেড়ায়, সামনে মানুষ পেলে আর রক্ষা নেই। বয়ে আনবার মত ঘোড়ার অভাবে অস্ত্র বা গোলা-বারুদও এদের বিস্তর ফেলে আসতে হয়েছিল—এক কথায়, ফরাসী সৈন্যরা দলে-দলে বেঘোরে মরতে লাগল! ছ'লক্ষ সৈন্যের মধ্যে কয়েক হাজার মাত্র শেষ পর্যন্ত দেশে পৌঁচেছিল।

আর নেপোলিয়ন্? এতবড় বীর, অজেয় সেনাপতি, কোথায় তাঁর ফেরার সময়ে সারাপথ বিজয়-উৎসবে মুখরিত ও আলোকিত থাকবে, তা নয়—চোরের মত গোপনে শ'খানেক মাত্র অনুচর নিয়ে প্যারীতে ফিরে এলেন!

এ-ত গেল নেপোলিয়নের কথা! আমরা যাঁর গল্প বলতে বসেছি, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করলেও তিনি নিজে ছিলেন জার্মান। তার আগেই জার্মানী নেপোলিয়নের বশ্যতা স্বীকার করেছিল ব'লে অনেক জার্মান রাজা (ওখানে তখন আমাদের দেশের মত বিস্তর রাজা আর মহারাজা ছিলেন) কেউবা বাধ্য হয়ে, কেউবা স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে নিজেদের কিছু-কিছু সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। হেসির গ্র্যাণ্ড ডিউক বা মহারাজার ছেলে প্রিন্স এমিলিয়াস্ ছিলেন এঁদের দলে—তিনি নিজেই এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের সেনাপতিরূপে নেপোলিয়নের সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন।

তিনি যে বেরিয়েছিলেন ঠিক বাধ্য হয়ে, তা নয়,—বাইশ বছরের সেই বীর তরুণের মনে ছিল উচ্চ আশা, চোখে ছিল পৃথিবী-জয়ের স্বপ্ন! এতবড় বীরের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ-পরিচালনা ভাল ক'রে শিখবেন, ভবিষ্যতে সেই পদ্ধতিতে নিজের সৈন্যদের চালিত ক'রে হেসিকে জার্ম্মানী তথা সারা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করবেন—বোধ হয় এই ছিল তাঁর কল্পনা।

যুদ্ধ ভাল ক'রে করবার বড় কৌশলটা তাঁর আয়ত্ত ছিল। সৈন্যরা তাঁকে এত ভালবাসত যে, তাঁর ইচ্ছা তাদের কাছে ছিল দৈবাদেশ। নেপোলিয়নকেও তাঁর

সৈন্যরা ভালবাসত ব'লেই তিনি এতবড় বীর হ'তে পেরেছিলেন ; শুধু মাইনে নেবার সম্পর্ক হ'লে অত সহজে মানুষ প্রাণ দিতে পারে না। এমিলিয়াস্ অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন, প্রজাদের সকলের মনেই আশা ছিল যে, গ্র্যাণ্ড ডিউক্ ম'রে গেলে এমিলিয়াসের হাতে যখন রাজ্যের ভার পড়বে, তখন তারা ঢের বেশী সুখে থাকবে প্রজা আর সৈন্যদের অত ভালবাসা পেয়েছিলেন ব'লেই এমিলিয়াসের দল খুব ছোট হ'লেও সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েছিল। তাঁর রণকৌশল এবং শৌর্যের জন্য নেপোলিয়ন্ বার-বার তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন—বুড়ো-বুড়ো সেনাপতিরাও তাঁকে সমীহ ক'রে চলতেন।

কিন্তু ফেরবার পথে তাঁর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠ্‌ল ! হাজার লোকের মধ্যে কয়েকটিকে মাত্র তিনি সঙ্গী পেয়েছিলেন, কিন্তু তাও একে-একে যেতে লাগল। কেউবা মারা গেল নেকড়ের হাতে, কেউবা ম'ল কসাকের গুলিতে—তবে শীতে আর অনাহারেই বেশী। শেষ পর্যান্ত দেশের কাছাকাছি এসে যখন পৌঁছলেন, তখন মাত্র দশটিতে ঠেকেছে !

আর দুটো দিন !

কোনমতে দুটো দিন কাটাতে পারলেই তাঁরা নিজেদের দেশে না-হোক, এমন জায়গায় পৌঁছবেন, যেখানে খাবার আর আগুন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এই দুটো দিন গেলে আর মৃত্যুর ভয় নেই—এই পথটুকু যেন ভয়াবহ একটা নদী ! পার হয়ে যেতে পারলেই তাঁরা আশা-আনন্দময় জীবনের তীরে গিয়ে পৌঁছবেন।

কিন্তু দুটো দিনই যেন আর কাটে না ! ওঁদের পোষাকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে এসেছে, সঙ্গে আগুন জ্বালবার কোন সরঞ্জাম নেই—খাবার ত নেই-ই ! যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও এমন কোন লোকালয় নেই, যেখানে তাঁরা একটুখানি আরামে বিশ্রাম করতে পারেন ! এক টুক্‌রো রুটি, এমন কি একদানা গম পর্যান্ত কোথাও নেই !

আর ঠাণ্ডাও বোধ হয় সেদিন চরমে পৌঁচেছে ! অবিশ্রান্ত বরফ প'ড়ে চলেছে মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবীটাই বুঝি বরফে ঢেকে যাবে—সৃষ্টির বুঝি এই শেষ ! ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, ওপরে—সমস্ত আকাশটা জুড়ে শুধু বরফ, আর বরফ !

● পরের ঘরে পড়ুন
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার মিত্র

তবু এমিলিয়াস্ চলেছেন। পা চলে না, দেহ অনাহারে কাঁপছে, ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর যেন অসাড়, তবু অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি চলেছেন। দেশে তাঁকে পৌঁছতেই হবে ; বৃদ্ধ মা-বাপ, অসংখ্য প্রজা তার পথ চেয়ে আছে।

কিন্তু ইচ্ছাশক্তির ওপরেও একটা কিছু আছে। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল, তখন একেবারেই তাঁরা অচল হয়ে পড়েছেন, একটুখানি বিশ্রাম না করলে কোনমতেই আর পা চলবে না! এমিলিয়াস্‌কেও হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে হ'ল। তিনি পথের ধারে একটা ভাঙ্গা কুটীর দেখে বললেন, 'এসো, এইখানেই আজকের রাতটা কাটানো যাক ;—অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।'

ভাঙ্গা ঘর—চালটা পর্যান্ত পালাবার সময় ঘরের অধিকারী পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। দোর-জানলাও কিছু নেই—শুধু চারটে দেওয়াল আছে দাঁড়িয়ে। তাকে আশ্রয় বলা চলে না ঠিক, তবু উত্তরে ঝড়ের হাত থেকে ত খানিকটা রেহাই পাওয়া যাবে।

এমিলিয়াসের আদেশ পাওয়ামাত্র সবাই সেই ঘরে ঢুকে মেজেতে এলিয়ে পড়ল। কিন্তু এ আর এক সমস্যা! যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ চলার পরিশ্রমে একটু গা গরম ছিল, এখন এই দুর্দ্দান্ত শীত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত।

এই এদেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ! শ্রান্তিতে, ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসছে : কিন্তু এটা সবাই জানে যে, কাল সকালে এদের অধিকাংশকেই আর চোখ খুলতে হবে না—কেউ খুলতে পারবে কি না সন্দেহ! ঘুমের মধ্যে টেরও পাবে না, চিরদিনের মতই ঘুমিয়ে পড়বে, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাবে!

তবু, কী আর করা যায়!

এমিলিয়াস্ জোর ক'রে হাসি টেনে এনে বললেন, 'যাক্—মরি তাতে আর এমন কি ক্ষতি? আমরা সবাই প্রাণপণে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করবার চেষ্টা করেছি—আমাদের দেশের লোক আমাদের জন্য লজ্জিত বোধ করে, এমন কোন কাজ করিনি—এইটুকুই যথেষ্ট। ভাই সব, ঘুমোবার আগে এসো আমরা পরস্পরের দোষ-ত্রুটি, যদি কিছু ঘটে থাকে, মাপ করি,—আর ঈশ্বরকে হয়ত বা শেষবারের মতই নমস্কার জানাই।...জয় ভগবান্!'

● [illegible]
[illegible] মিত্র

এমিলিয়াসের চোখই আগে বুজে এল! রাজার ছেলে, তায় ছেলেমানুষ; পথের কষ্ট এবং ঠাণ্ডা তাঁকেই বেশী কাবু করেছিল।

যে দশজন সৈন্য তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা একবার তাঁর দিকে চেয়েই নিজেদের মধ্যে



বাইরে এসে দাঁড়াতেই, সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। [পৃঃ ৩০১

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে—কুমারের মুখ তখনই নীল হয়ে এসেছে, হাত-পাও তাই! এর ওপর সারারাত এই বরফ! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সকলকারই বুক চিরে! দুঃখ নিজেদের জন্ত নয়, দুঃখ এমিলিয়াসের জন্ত, সারা দেশের আশা-ভরসা!

● [illegible]
[illegible]

এমিলিয়াস্ ঘুমিয়েই পড়েছেন। বড় মধুর ঘুম! স্বপ্ন দেখছেন যে, তিনি বাড়ী ফিরে গেছেন—আগুনের ধারে পালকের লেপ গায়ে দিয়ে নরম বিছানায় শুয়ে আছেন। আঃ—কী সুন্দর গরম, কী আরাম! এত উষ্ণতা যে পৃথিবীতে ছিল, তাই যেন ভুলে গিয়েছিলেন!···

ঘুম যখন ভাঙল, তখনও ঐ কথাটাই তাঁর প্রথম মনে হ'ল—কী সুন্দর গরম, কী আরাম!

কিন্তু—

তিনি যে বরফের মধ্যে শুয়েছিলেন! ঠাণ্ডায় তাঁর হাড় পর্যন্ত যে জমে যাবার কথা!

চম্‌কে উঠে বসলেন। আরে, গায়ের ওপর এগুলো কী তার? এযে কতকগুলো পোষাক! অনেকগুলো! এতগুলো পোষাক এল কোথা থেকে? কে তাঁকে এগুলো দিয়ে এমন পরিপাটি ক'রে ঢেকে রেখে গেছে?

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন—সঙ্গীরা কেউ ঘরে নেই! এরি মধ্যে কোথায় গেল তারা? তাঁকে ডাকেনি কেন?···

একটা অজ্ঞাত ভয়ে যেন তাঁর বুক কেঁপে উঠল।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াতেই, সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দশটি সঙ্গীর নগ্নদেহ বরফের ওপর প'ড়ে রয়েছে—কাঠের মতই শক্ত হয়ে উঠেছে সেসব দেহ! প্রাণ যে কারুর নেই, তা একবার তাকালেই বোঝা যায়!

তাদের রাজকুমার, তাদের প্রিয় সেনাপতি, তাদের দেশের আশা-ভরসা—যুবরাজ এমিলিয়াস্‌কে তারা নিজেদের পোষাকে ঢেকে নগ্নদেহে বাইরে চ'লে এসেছে, নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে। তাঁকে বাঁচাবার জন্য তারা নিঃশব্দে নিজেদের প্রাণ দিয়েছে!

আঁধারে আলো

● স্বাধীনতাই আমাদের প্রাণবায়ু! আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি। আমাদের পন্থা—স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা।

—ম্যাৎসিনি



সোনার কমল

—অশোকনাথ শাস্ত্রী

যে প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী এখানে বলা যাচ্ছে, তার ঘটনাস্থল ছিল শ্রীকণ্ঠ-জনপদের বিলাসপুর নগর। এ-যুগের বিলাসপুরের সঙ্গে অবশ্য নামের মিল থাকলেও দুই-ই এক নয়—এটা ঠিক। ঘটনার নায়ক শ্রীকণ্ঠ-দেশেরই রাজা বিলাসশীল।

রাজা বিলাসশীলের একমাত্র রাণী—নাম তাঁর কমলপ্রভা। রাণীকে রাজা বিবাহ করেছিলেন একটু বেশী বয়সে—তবু তাঁদের মনের মিল ছিল খুব বেশী। তবে দুজনের মনে একই দুঃখ—ছেলে বা মেয়ে একটিও তাঁদের হয়নি। ক্রমশঃ রাজা বুড়িয়ে পড়তে লাগলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনের দুঃখের ভার বেড়ে চলতে লাগল। তিনি চোখ বুজলে না-জানি এতবড় রাজ্য কার ভোগে লাগবে—রাণীরই বা কি গতি হবে!—এই সব ভেবে-ভেবে তিনি দিন-দিন শুকিয়ে উঠতে লাগলেন।

রাজার শরীরের অবস্থা দেখে রাণীর মনে হ'ল ভয়—বোধ হয় রাজার ভিতরে-ভিতরে কোন অসুখ ধরেছে যা বাইরে ঠিক ধরা যাচ্ছে না, অথচ দিনের পর দিন দেহটাকে তাঁর ক্ষীণ করে দিচ্ছে। এই সব ভেবে রাণী রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠালেন।

রাজবৈদ্য তরুণচন্দ্র কেবল নামে নয়, বয়সেও তরুণ; কিন্তু বুদ্ধি তাঁর নরুণের চেয়েও ধারাল—বিদ্যা অবশ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। তিনি রাজার নাড়ী টিপেই বললেন—রাজার রোগ কিছুই নয়। অন্ততঃ শরীরে এক জরা ছাড়া অন্য কোন অসুখ নেই। তাই তিনি সকলকে রাজার ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহারাজ! আপনি বুড়ো হ'য়ে পড়ছেন—এছাড়া অন্য কোন বিশেষ রোগ ত আপনার শরীরে নেই! তবে, মনে যদি কোন দুর্ভাবনা থাকে—সে কথা আলাদা। তা আমি বৈদ্য, আমাকে সব কথা খুলে বলুন।'



"মহারাজ! আপনার সাধ আমি পুরাতে পারি।"

রাজা বললেন—'রোগ আমার জরাই বটে; কিন্তু আমি বুড়ো হ'তে চাই না। তুমি যদি এমন কোন ওষুধ দিতে পার, যাতে আমি আবার যৌবন ফিরে পেতে পারি, তবে তোমায় অনেক পুরস্কার দোব।'

বৈদ্য রাজার মনের কথা টের পেয়ে মনে-মনে হেসে ভাবলেন—'এঁর আবার যুবা হবার সাধ একেবারেই মিটিয়ে দিচ্ছি!' এই না ভেবে বললেন মুখ ফুটে—'মহারাজ! আপনার সাধ আমি

● সোনার কলস
অশোকনাথ শাস্ত্রী

পুরাতে পারি। কিন্তু ছ'মাস আপনাকে মাটির নীচে একখানা ঘরে থাক্‌তে হবে। আমার চিকিৎসার সময় কোন মানুষ—এমন কি রাণীমা পর্য্যন্ত সেখানে যেতে পারেন না—মায় চন্দ্র-সূর্য্যেরও মুখ দেখা চলবে না আপনার!'

রাজা তখনই রাজি। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে রাজপ্রাসাদ থেকে কিছু দূরে নদীর ধারে মাটির নীচে এক ঘর তৈরী হ'ল। বৈদ্য সেখানে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। রাজ্যে রটে গেল—বুড়ো রাজা আবার যুবা হবার জন্যে হন্যে হ'য়ে কায়কল্প চিকিৎসা করাচ্ছেন—এখন ছ'মাস তিনি পাতালপুরীতে থাকবেন।

রাজবৈদ্য তরুণচন্দ্রের মনে ছিল এক দুষ্ট ফন্দী। তিনি রাজার মত অনেকটা দেখতে অজয় নামে একটি সুন্দর যুবককে জোগাড় করেছিলেন। আগে থাকতেই তার সঙ্গে সড় করে তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন পাতালপুরীর ভিতর। তারপর, রাজা সেখানে যাবার পর দু-চার দিন ধরে রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়ার ছলে রাজবাড়ীর সব সুলুক-সন্ধান—মায় রাজার অতীত জীবনের সব কাহিনীই জেনে নিয়েছিলেন। বৈদ্যের চেলা হিসাবে সেই ছোকরাটিও সব কথা শুনে-শুনে মনে গেঁথে নিয়েছিল। তারপর এক ঝড়-বাদলের রাতে বৈদ্য রাজাকে দিলেন এমন এক ওষুধ, যা খেয়ে রাজা পড়লেন ঘুমিয়ে—সে কালঘুম তাঁর আর ভাঙলো না! তখন বৈদ্য আর সেই ছোকরাটি ঘুমন্ত রাজাকে এক পাথরের সিন্দুকে পূরে নদীতে দিলেন ডুবিয়ে। জনপ্রাণী কেউ তার সন্ধান পেলে না!

এর পর কিছুদিন ধরে চলল বৈদ্যের চিকিৎসার অভিনয়। রোজই তিনি একবার করে রাজবাড়ীতে যেতেন—আর রাণী থেকে মন্ত্রী পর্য্যন্ত সবাইকে শুনিয়ে আসতেন যে, তাঁর চিকিৎসায় রাজার শরীরে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে!

এইভাবে ছ'মাস কাটবার পর একদিন বৈদ্য রাজবাড়ী এসে বললেন—'এইবার আমার কাজ হয়েছে। আপনারা গিয়ে মহারাজকে নিয়ে আসুন।'

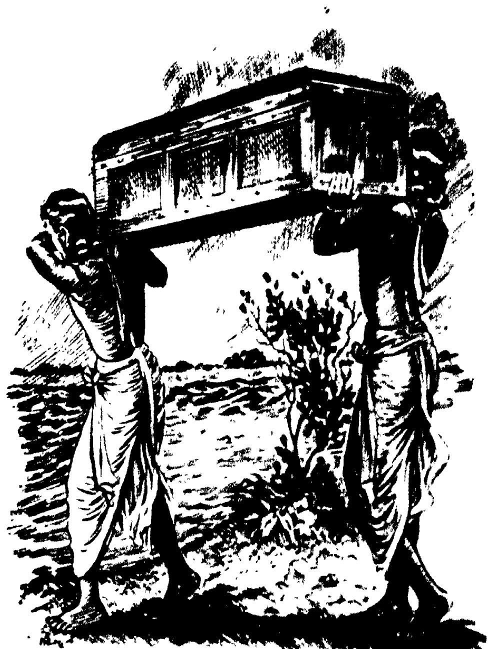
রাণী, মন্ত্রী, সেনাপতি ও জনকয়েক মাতব্বর রাজ-পারিষদ পাতালপুরীতে গিয়ে দেখেন—অবাক্ কাণ্ড! কোথায় পঞ্চাশ বছরের আধবুড়ো রাজা!—এ যে পঁচিশ বছরের এক সুন্দর জোয়ান ছোকরা! তার পাশে বত্রিশ বছরের রাণীকেই বরং

● সোনার কমল
অশোকনাথ শাস্ত্রী

বুড়ো দেখাচ্ছিল। কিন্তু রাজা যখন সকলকে নাম ধরে ডেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা-আলাদা গোপন কথা সব বলতে লাগলেন—তখন সকলেই বিশ্বাস করলেন—সেই পুরাণো বুড়ো রাজাই বটে!

প্রবীণ মন্ত্রীমশায় ও মুখ ফুটেই বললেন—'এ আমাদের মহারাজই বটেন! যে বয়সে তিনি যুবরাজ ছিলেন—সেই বয়সেই যেন আবার ফিরে এসেছেন!'

বাস্! আর পায় কে! বৈদ্য তরুণচন্দ্রের জয়-জয়কার! রাজার বিলাসশীল নাম পর্য্যন্ত বদলে নতুন নাম রাখা হ'ল—মহারাজ অজরচন্দ্র!



দুজন রাজাকে এক পাথরের সিন্দুকে পুরে… … পৃ. ৩২৯

কিন্তু অতি বুদ্ধিমানেরও একদিন না একদিন দারুণ ঠকা ঠকাতে থাকে। তরুণচন্দ্রেরও অদৃষ্টে তাই ঘটল। তিনি ভেবেছিলেন যে, অজর ছোকরাকে রাজতক্তে বসিয়ে তাকে হাত করে নিজেই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে উঠবেন। কিন্তু কাজের বেলা তা হ'ল না। অজর রাজা পেয়েই বৈদ্যকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলেন।

● সোনার কমল

একদিন সকালে রাজা আর বৈদ্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছিলেন নদীর ধারে বৈদ্য তরুণচন্দ্র রাজাকে একলা পেয়ে হঠাৎ বলে বসলেন—'দেখ অজয়! তোমার মতিগতি ত' বড় ভাল নয়! যদি আমার কথামত না চল, তা হ'লে জেনে রেখো—যে তোমায় সিংহাসনে বসিয়েছে—সেই তোমায় আবার সিংহাসন থেকে নামাতে পারে—একটা মুখের কথার ওয়াস্তা মাত্র!'

অজয় রাজাও হেসে উত্তর দিলেন—'ঠিক কথা! তবে আপনিও জেনে রাখবেন যে, সেই সঙ্গে আপনার মাথাটাও কাঁধ থেকে নেমে যাবে। ধরা পড়লে যে দুজনেরই সমান শাস্তি—তা ভুলে যাচ্ছেন কেন? তা ছাড়া, আমি এখন রাজকর্মচারীর সব হাত করে ফেলেছি। রাণী এখন আমার কেনা দাসী হ'য়ে পড়েছেন—মন্ত্রী, সেনাপতি সকলকেই মিষ্টি কথায় ভুলিয়েছি। আপনার হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই—যাতে আপনি আমায় ঠক বলে লোকের সামনে অপদস্থ করতে পারেন। বরং তাতে আপনারই জীবন যাবার বেশী সম্ভাবনা! আচ্ছা যাক্ ওসব অপ্রিয় আলোচনা। ঐ যে একটা পদ্ম ভেসে আসছে—মনে হচ্ছে যেন ওটা সোনার পদ্ম!—ওই আর একটা ওই—ওই—সার-সার সোনার পদ্ম ভেসে আসছে! দেখুন, দেখুন, কী সুন্দর! নীল জলের বুকে সোনার কমল—ঠিক যেন নীল পাথরে বাঁধানো মেঝেতে সোনার আল্পনা! দেখে আসুন ত' একটু এগিয়ে কোথায় ও পদ্মগুলি জন্মাচ্ছে?'

বৈদ্য চাবুকের ডগা দিয়ে একটা পদ্ম উঠিয়ে নিয়ে দেখলেন—সত্যিই সেটা সোনার! লোভে তাঁর চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল। আর কথাটি না কয়েই তিনি ঘোড়ার পিঠে হাঁকড়ালেন চাবুক—ছুটল তেজী ঘোড়া তীরের বেগে। কিন্তু চলেছেন ত' চলেইছেন! নদীরও শেষ নেই—পদ্মের সারেরও কমতি নেই—অজস্র—অনন্ত!

ক্রমে মাথার উপর সূর্য্যের তাপ অসহ্য হ'য়ে উঠল—দুধের মত সাদা ঘোড়ার মুখে দুধের গাঁজলার মত ফেনা জমতে লাগল—সারা গা তার ভিজে উঠল ঘামে—তার পিঠের সওয়ার বৈদ্যরাজের ব্যায়াম-পুষ্ট দেহেও দেখা দিল ঘামের ধারা—তবু তিনি প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাচ্ছেন উন্মাদের মত।

হঠাৎ ঘোড়া এসে যেখানে থামল, সে একটা পাহাড়তলী;—স্থানটি বেশ ঠাণ্ডা।

● সোনার কমল
অশোকনাথ শাস্ত্রী

...ত পরিশ্রমের অবসাদ যেন কোথায় পলকে মিলিয়ে গেল। দেখলেন—একটা পাহাড়ী ঝরণা তর-তর বেগে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে নদীটাকে সৃষ্টি করেছে। নদীর ঠিক গোড়ার মুখে নদীর দুধারে দুটো বড়-বড় বটগাছ—সেই দুই গাছে ঝুলছে দুটো মানুষের কঙ্কাল—পা তাদের গাছের ডালে বাঁধা—মাথা নীচের দিকে। ঝরণার জলের ছিটে এসে লাগছে তাদের গায়ে—সেই জল টিপ টিপ করে কঙ্কালের গা বেয়ে এসে পড়ছে নীচের নদীর জলে ফোঁটা ফোঁটা—টপ টপ করে। আর তা থেকে জন্মাচ্ছে অসংখ্য সোনার পদ্ম—প্রতি ফোঁটায় একটি করে।

বৈদ্য তরুণচন্দ্র ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন এ বিচিত্র দৃশ্য দেখে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ভাবলেন—কঙ্কালের গা-ধোয়া জলে যদি সোনার পদ্ম জন্মায়, তা হ'লে কঙ্কাল দুটোকে জলে ডুবিয়ে দিলে নিশ্চয় তাল তাল সোনা মিলবে!

যেমন ভাবা অমনি কাজ! পায়ের বাঁধন কেটে দিতেই কঙ্কাল দুটো জলে পড়ে তলিয়ে গেল। কিন্তু আর সোনার পদ্মও জন্মাল না—সোনার তালও পাওয়া গেল না! বৈদ্য তরুণচন্দ্র তখন ত বিশেষ বেকুব! হঠাৎ পিছনে হাসির শব্দে চমক ভেঙে ফিরে দেখেন—রাজা অজয় আর রাণী কমলপ্রভা একই ঘোড়ার পিঠে চেপে এসে উপস্থিত!

রাজা হেসে বললেন—'বৈদ্য তরুণচন্দ্র! আজ তুমি আমার আর রাণীর যথার্থই বন্ধুর কাজ করলে! ও কঙ্কাল দুটো আমাদেরই দু'জনের আগের জন্মের। আমরা আগের জন্মে স্বামী-স্ত্রী ছিলুম। রাজা আর রাণী হবার আশায় আমরা চৈত্রমাসে এই উৎকট তপস্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিই। তার ফলে এজন্মে রাজা রাণী হয়েছি দুজনেই। তবে নদীর ধারে দু'জনে ছিলুম বলে প্রথম জীবনে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। তুমি কঙ্কাল দুটো কেটে ভাসিয়ে দিতেই আমাদের পূর্ব্ব-জীবনের সব কথা মনে পড়েছে—এখন আমরা দু'জনেই জাতিস্মর।

তা দেখ বৈদ্যরাজ! তুমি ভাবছ—তুমি আমাকে রাজা করেছ! তা নয়। রাজা আমি হয়েছি আমার নিজের পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে—তুমি নিমিত্ত-মাত্র! তাই বলি,

● সোনার কমল
অশোকনাথ শাস্ত্রী

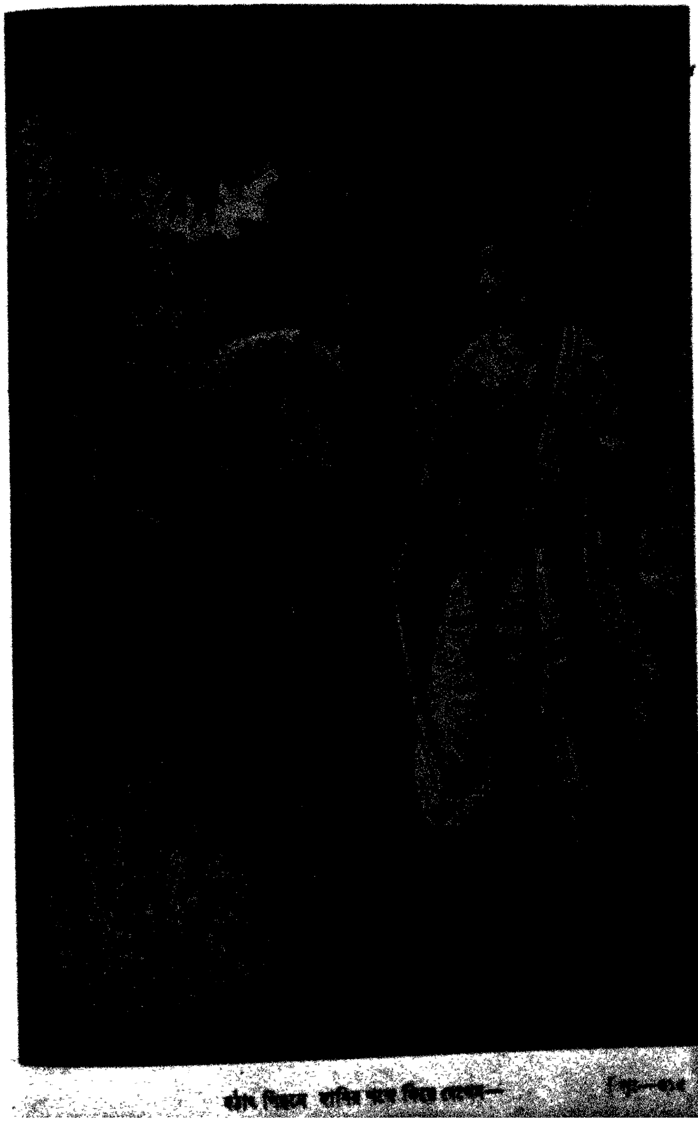
মিছে গোলমাল কোরো না। আমায় হাতের মুঠোয় পুরবার চেষ্টাও ছাড়। বন্ধুভাবে থাকো—তোমাকে পরম সুখে মাথায় করে রাখব।'

বৈদ্য তরুণচন্দ্র বুঝলেন যে—তাঁর অতিলোভের ফল হাতে-হাতেই ফলেছে—সব সোনার পদ্মগুলো পর্য্যন্ত বেহাত হ'ল! অগত্যা তিনি রাজা-রাণীর শত্রুতা করা ছেড়ে দিলেন সেই দিন থেকে।

আঁধারে আলো

● ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে! যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর-খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে! যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান!
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে!

—রবীন্দ্রনাথ



বৌদি শিখলে হাসি মুখে দিয়ে বলেন— [পৃঃ—[illegible]



পুলিটজার প্রাইজ

—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

নোবেল প্রাইজের কথা তোমরা জানো নিশ্চয়। সুইডেনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আলফ্রেড নোবেল উইল করে যান, তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে প্রতি বৎসর পাঁচজনকে পুরস্কার দেওয়া হবে সাহিত্য, রসায়ন প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য। প্রত্যেকেই পুরস্কার-স্বরূপ পাবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের দু'জন মনীষী ঐ পুরস্কার পেয়েছেন। একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ, অপরজন স্যর চন্দ্রশেখর রমন। নোবেল-পুরস্কারের মত আর একটি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা করেছেন আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মালিক জোসেফ পুলিটজার (Joseph Pulitzer)।

জোসেফ পুলিটজারের জন্ম হয় বুডাপেস্ট শহরে ১৮৪৭ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে। জাতিতে তিনি ছিলেন ইহুদী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়িভাবে তিনি বসবাস শুরু করেন ১৮৬৪ সালে। ১৮৭৮ সালে সেন্ট লুই ডিসপ্যাচ (St. Louis Dispatch) নামে একটি পত্রিকার তিনি স্বত্ব ক্রয় করেন এবং ঐ পত্রিকাটিকে ইভনিং পোস্ট (Evening Post) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ক'রে পোস্ট ডিসপ্যাচ (Post-Dispatch) নামে পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে তিনি নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড্ (New York World) পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন এবং ঐ পত্রিকার যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করেন। সাংবাদিকতার উপর তাঁর এমন অনুরাগ ছিল যে, সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি প্রচুর টাকা দান করেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-বিভাগ খোলা হয়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১১ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে।

পুলিটজার-পুরস্কার প্রতিবৎসরেই দেওয়া হয় সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য। গত বৎসর যাঁরা ঐ পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ড্যানিয়েল ডু লিউস্ (Daniel De Luce) অন্যতম। ইনি অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস্ অভ আমেরিকার (Associated Press of America) প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘুরে এসেছেন। জার্মান, ইতালীয়ান ও জাপানী সৈন্যের কামানের মুখে এগিয়ে যেতে ইনি ভয় পাননি, সমুদ্রের মাইন্-পাতা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন ছোট জাহাজে চড়ে, আবার মিত্রপক্ষের 'বম্বারে' (Bomber) দিনের আলোয় হানা দিয়েছেন শত্রুর দেশে। ১৯৪২ সালে, জাপানীরা বর্ম্মা আক্রমণ করার মাত্র দশ দিন আগে, জীপ (Jeep) গাড়ী চড়ে দু'হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে ইনি দিল্লী এসে উপস্থিত হন।

এঁর সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি জার্ম্মান-অধিকৃত যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ করে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। প্রতি পদে মৃত্যুর সম্ভাবনা ষোল আনা থাকলেও, ইনি ইতালী থেকে যুগোশ্লাভিয়ায় যাত্রা করেন আড্রিয়াটিক সাগর পাড়ি দিয়ে এবং সেখানে পৌঁছে মার্শাল টিটোর দেশপ্রেমিক বাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। জার্ম্মানরা যুগোশ্লাভিয়া অধিকার করার পর মিত্রপক্ষের সাংবাদিকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ঐ দেশে প্রবেশ করেন।

ছোট্ট জেলে-নৌকো চড়ে ইনি রওনা হন ইতালী থেকে। ভাগ্যক্রমে যুগোশ্লাভিয়ার তীরের কাছে পৌঁছুতেই এঁর দেখা হয় মার্শাল টিটোর একদল সৈন্যের সঙ্গে। সৈনিকেরা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাদের এক পার্ব্বত্যদুর্গে এবং সেখানে তাদের মুখ থেকে ইনি শোনেন তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্য্য-কলাপের বিস্ময়কর কাহিনী।

জার্ম্মানদের সঙ্গে তাদের দু'একটা লড়াই দেখবার সুযোগও হয়েছিল তাঁর। লিউস্ লিখেছেন, "শরতের সন্ধ্যায়, আমাকে শোনাবার জন্য ওরা যে রণসঙ্গীত গেয়েছিল, তা যে আমার কত ভাল লেগেছিল তা বলতে পারি না! আমার দুঃখ এই যে, আমার ভারাক্রান্ত নোটবইএ ওদের ঐ অপূর্ব্ব গানগুলি লিখে নেবার সুযোগ পাইনি।"

● পুলিটজার প্রাইজ

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

যুগোশ্লাভিয়ার দেশপ্রেমিক বাহিনী সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় ইনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে তার বিশেষ সুখ্যাতি হয়েছে। এই সমস্ত প্রবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

১৯৩৯ সালে লিউস্ যখন লণ্ডনে ছিলেন, সেই সময় জার্মানেরা পোলাণ্ড আক্রমণ করে। যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করার জন্য লিউস পোলাণ্ডের লাও (Lwow) শহরে এসে হাজির হন। জার্মানদের কামান-গর্জনে পোলাণ্ড তখন প্রকম্পিত হচ্ছে, দুঃসাহসিক লিউস্ সেই ভয়াবহ মৃত্যু-তাণ্ডবের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরাঘুরি করে খবর সংগ্রহ করে সংবাদপত্রে পাঠাতে লাগলেন। পোলাণ্ডের যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত লেখা পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি যেমন তথ্যপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। গ্রীসেও শত্রুসৈন্যের খুব নিকটে থেকে তিনি খবরাখবর সরবরাহ করেছিলেন। জার্মান সৈন্য যখন ভীম-বিক্রমে এথেন্সের দিকে এগিয়ে আসছে, সেই সময় ইনি আত্মরক্ষার জন্য ছোট একটা জেলে-নৌকো ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হন তুরস্কের দিকে। প্রতি মুহূর্তেই বিপদের সম্ভাবনা—কখন যে শত্রুপক্ষের নজরে পড়ে যাবেন, কে জানে! এমনি সঙ্কটের মধ্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা সমুদ্রের উপর কাটিয়ে তাঁরা এসে উপস্থিত হন গন্তব্যস্থানে।

১৯৪১ সালে ইংরাজ ও রুশ যখন ইরাণে প্রবেশ করে, তখন লিউসই ছিলেন ওখানে একমাত্র মার্কিণ সাংবাদিক। এর পরই তিনি যান বর্ম্মায়। বর্ম্মা থেকে ভারতবর্ষে এসে তিনি যাত্রা করেন আমেরিকায়; সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর তিনি ফিরে যান লণ্ডনে। তারপর মিত্রপক্ষ যখন উত্তর-আফ্রিকায় অভিযান শুরু করেন, তখন টিউনিসিয়ায় মার্কিণ সৈন্যের সঙ্গে তিনি যোগদান করেন। যুগোশ্লাভিয়ার দেশপ্রেমিক বাহিনীর সঙ্গে যাত্রা ক'রে তিনি ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে এসে মিলিত হন ইতালীতে এবং জীপ গাড়ী চড়ে একশো মাইল পথ অতিবাহন করেন মিত্রপক্ষের অষ্টম ও পঞ্চম বাহিনী যখন মিলিত হয় পরস্পরের সঙ্গে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে ইংরাজ সৈন্য যখন জার্মানির দিকে অগ্রসর হচ্ছে আর জার্মানরা নানারকম ভয়াবহ মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করছে ইংরাজ সৈন্যের অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখার জন্য, তখনও তিনি ছিলেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহের জন্য।

● পুলিট্জার প্রাইজ

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

লিউস্‌এর জন্ম হয় ১৯১১ সালে অ্যারিজোনার জুমা (Juma) শহরে। যখন তিনি লস্ এঞ্জেলেস্ (Los Angeles) শহরে স্কুলের ছাত্র, তখনই তাঁর মনে জেগেছিল সাংবাদিক হবার ইচ্ছা। স্কুলের দৈনিক সংবাদপত্রিকা ও ইয়ার-বুক (Year-Book) এর তিনি সম্পাদক হন এবং স্কুল-পত্রিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পাদকীয় প্রবন্ধরচনার জন্য পুরস্কার পান।

তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয় বৃটিশ-কলম্বিয়ার একটি ব্যবসায়-পত্রিকার (Trade Journal) সহকারী সম্পাদকরূপে। ১৯২৯ সালে অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসে (Associated Press) তিনি যোগদান করেন এবং সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ করেও কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। পাঁচ বৎসর পড়ার পর তিনি ডিগ্রী লাভ করেন এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য Phi Beta Kappa সমিতির সদস্যপদও পান। বৈদেশিক সংবাদদাতা (Foreign Correspondent) হিসাবে তিনি প্রথম নিযুক্ত হন লণ্ডনে—যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছু পূর্ব্বে।

১৯৪২ সালে যখন তিনি আমেরিকায় ফেরেন, তখন তাঁকে তাঁর সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে অনুরোধ করা হ'লে লিউস্ বলেন, "যুদ্ধ-সাংবাদিক (War Correspondent) যখন পেন্সিল ও নোট বই নিয়ে লিখতে ব্যস্ত, তখন নিজেকে তাঁর নিতান্ত অকেজো বলেই মনে হয়। কারণ, সকলেই লড়াই করছে পরম উৎসাহে আর আমি বসে আছি নির্লিপ্তের মত! যোদ্ধার পর্য্যায়ে আমরা পড়ি না—ষ্ট্রেচার-বাহক ও মেডিক্যাল অফিসারদের মত আমরা স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত। তবে হয়তো আমাদের কাজ নিতান্ত নিরর্থক নয়—একদিক দিয়ে এর উপযোগিতা আছে। কারণ, বীরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন করে প্রাণ দিয়েছে, সে কথা আমরাই জানাই জগৎবাসীকে—আর সেই জন্যেই তাদের আত্মত্যাগ বৃথা না হয়ে সকলের মনে সৃষ্টি করে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা!...মানুষের সব চেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হচ্ছে যুদ্ধ, আর এই যুদ্ধের বার্ত্তা আদৌ সুখকর নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব সাংবাদিক বিচরণ করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই এমন সমস্ত বেদনাদায়ক স্মৃতির পুঁজি থাকে, যা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁদের অন্তরকে ব্যথিত ও বিপর্য্যস্ত করে।"



ক্যামেরার কারসাজি

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ওপরে বাঁ-দিকের ছবিখানি এই প্রবন্ধে বর্ণিত ১নং ছবি, আর ডান-দিকেরটি ৩নং ছবি।

ক্যামেরার কারসাজি!—শুনতে একটু অদ্ভুতই শোনায় বটে। কিন্তু ওস্তাদের হাতে পড়লে সত্যি-সত্যি ক্যামেরা আমাদের বেশ ভালো রকমের ফাঁকিই দিতে পারে। সে ফাঁকি যে আমরা সব সময় ধরতে পারি, তাও নয়। আবার কোন-কোন সময় ধরাও পড়ে। ধরা পড়ুক, আর নাইই পড়ুক, এসব ফাঁকির মধ্যে বুদ্ধির বাহাদুরি আছে।

বছর কয়েক আগে এক বিলাতী পত্রিকার আফিসে এক ফটো-এজেন্সি সাপ আর শিকারী বাজের লড়াইয়ের চারখানা ফটো পাঠায়। সঙ্গে জোড়া একখানা চিঠি। তাতে লেখা—

“চারখানা ফটো পাঠালাম। দেখলেই বুঝতে পারবেন, সাধারণতঃ এ ধরণের ফটো মেলা ভার। মিঃ……এর নাম হয়ত আপনারা শুনে—

থাকবেন। বনে-জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে বুনো পশু-পাখীর ছবি-তোলাই ত… একমাত্র নেশা। এর মধ্যেই তিনি জীবনের সেরা আনন্দ পেয়ে থাকেন… এজন্য তাঁকে যে কতবার কত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে, কতবার … তিনি যমের বাড়ী যেতে-যেতে বেঁচে গেছেন, তা' আর বলবার নয়। তবুও তাঁর এ-নেশা কাটেনি, বরঞ্চ দিন-দিন তা' বেড়েই যাচ্ছে! এবার দক্ষি… আমেরিকায় বেড়াতে গিয়ে তাঁর এ ফটো কয়টি নেবার সুযোগ ঘটে। ব… পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের ফলে তিনি সাপ ও বাজের লড়াইকে তাঁর ক্যামেরা… পর্দ্দায় বন্দী করে এনেছেন।"

তোমরা অনেকেই হয়ত জানো, শিকারী বাজ নেউলের মতই সাপের মস্তবড় শত্রু। বাজের চোখে পড়লে সাপ বড় একটা রেহাই পায় না। বাজের ধারালো নখ আর চোখা ঠোঁটের ঘায়ে সাপ বেচারার ভবলীলা সাঙ্গ হতে বড় বেশী দেরী হয় না। অবশ্য সাপও যে নেহাৎ গোবেচারীর মত আত্মসমর্পণ করে, তা'ও নয়। দু' পক্ষেই খুব খানিক ধস্তাধস্তি হয়। একবার সাপটা ছোবল মারবার জন্য ফোঁস করে ফণা তোলে, পর-মুহূর্তেই বাজের ঠোঁটের গোঁচায় মাথা নীচু করতে বাধ্য হয়। কখনও সাপ বাজকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিতে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে বাজও তার ধারালো নখ আর ঠোঁট ব্যবহার করে আপনাকে বাঁচায়। এই হয়ত সাপটা কাবু হয়ে পড়ে, পরক্ষণেই আবার বাজ বেকায়দায় পড়ে হাঁস্‌ফাঁস্ করে। এমনি বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর শেষে সাপই কাবু হয়ে এলিয়ে পড়ে। বাজ তখন মরা সাপটাকে নখে ক'রে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে নিরিবিলিতে মনের স্ফূর্তিতে জলযোগ করে।

বাস্তবিক, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শিকারী বাজ আর সাপের লড়াই দেখে থাকো, তাহলে খুবই দুর্লভ দৃশ্য দেখেছ বলতে হবে। এই লড়াইয়ে পরস্পরের আত্ম-রক্ষার কৌশল, আক্রমণের কায়দা, ক্ষিপ্রকারিতা, বিদ্যুদ্‌গতি—এগুলি সত্যিই দেখবার মত!

জীবনে এ লড়াই দেখবার সুযোগ খুব কমই ঘটে। যদিও বা সে সুযোগ হ'ল, তখনই যে তার ছবি নেবারও সুযোগ হবে, এমন নয়। কাজেই, কোন ফটোগ্রাফারের

● ক্যামেরার কারসাজি
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

যদি সে ফটো নেবার সৌভাগ্য হয়, তবে তার বাহাদুরির সীমা থাকে না। সংবাদপত্রের কর্তারাও সে ছবি পেলে ছাপতে একদিনও দেরী করেন না।

কাজেই, কাগজওয়ালারা তো এমন ধরণের মূল্যবান ফটোগুলি পেয়ে মহা খুসী! পাছে অন্য কোন কাগজে আগে বেরিয়ে যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সেগুলি পরের দিনের সংখ্যায়ই ছাপাবার ব্যবস্থা করে ফেলেন।



২নং

এবার ছোবল থেকে প্রাণ বাঁচাও

ছবি চারখানার মধ্যে দু'খানা ছবি দেখতে পাবে এই প্রবন্ধের হেডিং-ব্লকে : আর দু'খানা প্রবন্ধের মাঝে ক্রমিকভাবে দেওয়া হ'ল। হেডিং-ব্লকের অন্তর্গত বাঁ-দিকের ও ডানদিকের ছবি যথাক্রমে ১নং ও ৩নং ছবি।

১নং ছবি—দেখো, বাজপাখী সাপটাকে দু'পায়ের নখে চেপে ধরেছে। সাপটিও বাজকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

● ক্যামেরার কারসাজি
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

২নং ছবি—বাজপাখী ভারী বেকায়দায় পড়ে গেছে। সুযোগ পেয়ে সাপ বাজকে ছোবল দেবার মতলব করছে। বেগতিক দেখে বাজও দু'পায়ের নখ দিয়ে সাপের পট চিরে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

৩নং ছবি—সাপটি কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। এতে বাজের আরও সুবিধেই হ'ল। সে



৪নং
বিজয়ী বাজপাখী

একদিকে দু'পায়ের নখ দিয়ে সাপকে পিষে মারছে, আর একদিকে ঠোঁটের খোঁচায় সাপের প্রাণ যায়-যায় হচ্ছে!

৪নং ছবি—বিজয়ী বাজ তার শিকার নিয়ে বাসায় ফিরছে। নিজে খাবে, বাচ্চারাও ভাগ পাবে।

ছবিগুলি ছাপতে দিয়ে সম্পাদক-মশাইয়ের কেন যেন হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, এগুলি

নকল ছবি নয়ত ! দুর্লভ ছবি,—ছাপবারও লোভ হচ্ছে, পাঠকদের কাছে বাহবা পাওয়া যাবে। আবার ভয়,—যদি নকল ছবি হয়, তাহলে কাগজের দুর্নাম হবে।

এই উভয় সঙ্কটে পড়ে তিনি তখন এক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের শরণাপন্ন হলেন।

যাঁরা পশু-পাখীর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের বলা হয় প্রাণিতত্ত্ববিদ। সারাজীবন এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তাঁরা এ বিষয়ে এমন অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন যে, ছবি দেখেই তাঁরা বলে দিতে পারেন, তা জ্যান্ত না মরা প্রাণীর ছবি,—আসল, না নকল !

এই চারখানা ছবি দেখে তিনি রায় দিলেন যে, এগুলি সত্যি অসাধারণ, তবে সত্যিকার লড়াইয়ের ছবি বলে নয়, ফাঁকি দিয়ে টাকা রোজগারের ফন্দি হিসাবে।

তিনি বল্লেন, এগুলি বাজে নকল ছবি। ছবির সাপও আসল সাপ নয়, বাজও জ্যান্ত বাজ নয়। তাঁর এ সিদ্ধান্তের কারণও তিনি লিখে পাঠালেন। তা হচ্ছে এই :

"কোন ফটোতেই বাজপাখীর চোখ সাপের উপর নেই, বাজের দৃষ্টি যেন অন্যদিকে নিবদ্ধ ! তা' ছাড়া চোখ যেন নির্জীব। জ্যান্ত পাখীর চোখ কখনও এমন হয় না।

দুই ও তিন নম্বর ফটোতে পাখীর ডানা দুটি ঠিক একভাবেই আছে, বাকী দু'খানা ফটোতে সামান্য একটু তফাৎ দেখা যায়।

চার নম্বর ফটোতে পাখীর ঠোঁট দেখা যায় না। বাকী তিনখানার ঠোঁট ঠিক একভাবেই আছে, একটু অদল-বদল নেই। জ্যান্ত বাজের পক্ষে এ অস্বাভাবিক।

সব কয়খানা ফটোতেই দেখা যায়, বাজ যেন সাপটিকে আলগোছে ধরে আছে ! যেখানে জীবন-মরণের লড়াই, সেখানে এটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। চার নম্বরের ফটোতে এটা আরও ভাল করে বুঝা যায় !

বাজপাখীর ডানা ও পালকের চেহারাও সুস্থ পাখীর মত নয়। মনে হয়, যেন কতদিনের অনাহারী পালক-ঝরা পাখী ! তা' ছাড়া চার নম্বরের ফটো একটু নজর দিয়ে দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ সাপটি আর সব ফটোর সাপের চাইতে ঢের বেশি লম্বা।

বাজের লেজের পালকগুলি সব ফটোতে একই রকম করে গুটানো। জ্যান্ত

পাখীর বেলায় এ-রকম বড় হয় না। চারখানা ফটোর মধ্যে তিন ও চার নম্বর ফটোর কৃত্রিমতাই সব চেয়ে সহজে চোখে পড়ে।”

এর পরও অবশ্য সম্পাদক-মশাই সব ক'খানা ফটোই ছাপিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ফটোগ্রাফারের ফটোগ্রাফির কৃতিত্বের জন্য নয়, তাঁর ফাঁকি সবার চোখে ধরিয়ে দেবার জন্য। কেননা, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মতামতও ফটোর সাথেই বেরিয়েছিল।

এবার তোমরা ছবিগুলি আর একবার বেশ ভাল করে দেখো দেখি! এখনও কি 'জীবন্ত' মনে হয়? নিশ্চয়ই নয়।

কি করে এমন 'জীবন্ত' নকল ফটো নেওয়া হয়েছিল, এবার তা'ও জেনে রাখ।

মরা বাজের পালক জুড়ে-জুড়ে বাজপাখীর একটা মডেল তৈরী হ'ল। চোখ দুটো হ'ল কাঁচের। তারপর একটা মরা সাপের ভেতরে লম্বালম্বি একটা লোহার তার ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। ব্যস্, তারটাকে বেঁকিয়ে সাপটাকে ইচ্ছামত যে-কোন ভাবে রাখবার আর অসুবিধে রইল না। অবশ্য বাজ আর সাপের এই মডেল তৈরী করতে অনেকখানি কারিগরী চাই। এটা হয়ে গেলে ফটো নেওয়া—সে আর এমন কি শক্ত?

● ক্যামেরার কারসাজি
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত



এবং
প্রজাপতির দুধ খাওয়া!

এবার পাঁচ নম্বর ছবিখানা দেখো। একটা রঙীন প্রজাপতি মানুষের হাতে বসে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে পরম আনন্দে বোতল থেকে দুধ চুষে খাচ্ছে। ফটোখানা এসেছিল এক চিত্র-প্রদর্শনীতে। অনেকের কাছ থেকেই এ তারিফও পেয়েছিল—অসাধারণ ফটো হিসাবে।

কিন্তু কোনদিন শুনেছ কি, প্রজাপতির এত লম্বা শুঁড় থাকে? আসলে ওটা একটা সরু রবারের নল। একটা মরা প্রজাপতির মুখে বসিয়ে এ কাণ্ডটি করা হয়েছে। অথচ দেখলে মনে হয়, সত্যি বুঝি প্রজাপতিটি দুধই খাচ্ছে।



৬নং

বিড়াল চুমো খাচ্ছে ব্যাঙকে।

এবার ছয় নম্বর ছবিখানা দেখো। এটা পাঠানো হয়েছিল এক এমেচার ফটো-কম্পিটিশনে। একে একটা প্রাইজ দেওয়া হবে বলেও ঠিকঠাক, এমন সময় কি করে ফাঁকি ধরা পড়ে যায়!

বাঘের মাসী ব্যাঙটাকে এমন আদর করে চুমো খাচ্ছে, আর ব্যাঙও চুপ করে বসে আছে—বিড়ালের মুখের কাছেও ভয়-ডর নেই—এটা আশ্চর্য্য নয় কি? আসলে কি জানো? ব্যাঙটা মাটির তৈরী, তার মুখে একটু মাংসের ঝোল মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ব্যাঙের ওপর বাঘের মাসীর এমন দরদ উথলে উঠেছে!

● ক্যামেরার কারসাজি
[illegible]

তোমাদের মধ্যে যারা কৃষ্ণনগর গিয়েছ, বা সেখানকার কারিকরদের হাতের কাজ দেখেছ, তারা জানো, ওখানকার কারিকররা নানা রকম ফল, ফুল, পশু, পাখী কি রকম চমৎকার তৈরী করে! খুব ভালো কারিকরের হাতের মাটির তৈরী এক ফালি তরমুজ বা একটা কলা যদি তোমার খাবার টেবিলে অন্যান্য ফলের সাথে রেখে দেওয়া হয়, তাহ'লে হাতে না ধরে বুঝবার উপায় নেই যে, এগুলি মাটির তৈরী। কাজেই, রকমারি করে সাজিয়ে এসব জিনিষের ছবি তুলে তোমরাও অনেককে ধোঁকা দিতে পার!

ক্যামেরার ফাঁকি যে শুধু ওদেশেই চলে, তা' নয়। আমাদের দেশেও প্রেস-ফটোগ্রাফিতে (সংবাদ-পত্রের জন্য ছবি-তোলার কাজ) অনেক রকম কারচুপি চলে। একবারের একটি গল্প বলছি। সত্যিকার গল্প।

বছর বারো আগের কথা। আমি তখন এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা-আফিসে কাজ করি। সেবার বাংলাদেশের এক স্বনামধন্য দেশ-নেতার মৃত্যু হয়। তাঁর শবদেহ হাওড়া থেকে বিরাট শোভাযাত্রা করে কেওড়াতলায় নেওয়া হ'ল। সে শোভাযাত্রার ফটো অনেক কাগজেই বের হয়েছিল, আমাদের কাগজেও হয়েছিল। তবে আমাদের কাগজের ফটোর বিশেষত্ব এই ছিল যে, শবাধারে শায়িত দেশ-নেতার পরিষ্কার প্রশান্ত মুখ দেখা যাচ্ছিল। অথচ হাওড়া-পুল না পেরুতেই শবাধারের ওপর এত ফুল আর ফুলের তোড়া পড়তে থাকে যে, দূর থেকে ফটোতে মুখ ওঠা দূরে থাক, কাছে গিয়েও মুখ দেখবার উপায় ছিল না!

তাহলে আমাদের ফটোতে মুখ কি করে উঠল, জানতে চাও? বল্‌ছি, শোনো।

শব-যাত্রার যে কয়খানা ফটো নেওয়া হয়েছিল, তার একখানার মধ্যে দেশ-নেতার জীবিত অবস্থায় তোলা একখানা ফটো থেকে তাঁর মুখটুকু কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে, জোড়ার মুখে একটু কালো কালির তুলি বুলিয়ে দেওয়া হ'ল, যাতে জোড়াটা টের না পাওয়া যায়। তারপর ঐ ছবির ব্লক করে যখন পরদিন কাগজে ছাপা হ'ল, তখন কেউ এই কারসাজিটুকু ধরতে পারেনি।

● ক্যামেরার কারসাজি
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তোমরা যে প্রতিদিন সিনেমা দেখো, আসলে তার বেশীরভাগই ফাঁকির ব্যাপার। অথচ, যখন একটা লোক বাঘের পেটে যায়, সাগরে ডুবে প্রাণ হারায়, হাজার-হাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে লাফ মারে বা আগুনে ঝাঁপ দেয়, তখন কি রকম রুদ্ধশ্বাসেই না



৭ নং

কী সাংঘাতিক ! [illegible]

তা' দেখো! ভাবছো, সত্যি-সত্যি তাই হয়! আরে রাম, এ শুধু ক্যামেরার ফাঁকি! নকল মডেলের ফটো নিয়ে আসল বলে দর্শকদের ধোঁকা দেওয়া। এসব ফটোকে ইংরেজীতে বলা হয় Trick photo. অবশ্য, যেমন দু'কথায় বলা হ'ল, আসলে কাজটি তেমন সহজ নয়। এর জন্য নানা রকমে মাথা খাটাতে হয়, নানা কল্পি-

● ক্যামেরার কারসাজি
[illegible]

ফিকির করতে হয়, আর টাকা-খরচের ত কথাই নেই! সে কাহিনী বলবার জায়গা এ নয়। তবে এখানে একখানা Trick photo (৭নং) দেওয়া হ'ল।

দেখলেই চমকে উঠবে! বাপরে, এ আবার কি? ঘাড় থেকে মাথা আলগা করে মেয়েটির বাঁ-হাতের ওপর কেমন শুইয়ে রাখা হয়েছে! এ যে রীতিমত খুনোখুনি ব্যাপার!

মোটেই তা' নয়। এও ক্যামেরার কারসাজি। পুরীর বেলা-ভূমিতে দু'টি মেয়ের ছবি। ডান-পাশের মেয়েটির মাথাটি ছাড়া বাকী শরীর বালিতে ঢাকা। আর বাঁ পাশের মেয়েটির মাথা পেছনদিকে এমনভাবে হেলে আছে যে, তা' আর ক্যামেরায় ধরা পড়েনি। অথচ, এর ফলে কি সাংঘাতিক ছবিই না হয়েছে!

তোমাদের মধ্যে যাদের ক্যামেরার সখ আছে, তারা মাথা খাটিয়ে এমন দু'চারখানা ছবি তোলবার চেষ্টা করে দেখো না? এতে বুদ্ধি আর কৌশলের চর্চ্চাও হবে, বন্ধু বান্ধবদের ঠকাবার আনন্দও পাবে।

আঁধারে আলো

● আমি যেন লৌহ-শৃঙ্খলের ভার এবং মণিবন্ধে হাতকড়ির স্পর্শ অনুভব করিতেছি। ইহা পরাধীনতার বন্ধনের বেদনা। সমস্ত ভারতবর্ষই এক বৃহৎ কারাগার।

—দেশবন্ধু সি, আর, দাশ



নীলগগনের ছুটি

—কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নীল গগনের ছুটি আজি সোনার শরত ভোরে,
নীল ঝর্ণার সোনার ধারা—পড়ছে ঝরে ঝরে।
সোনার লিখন নিয়ে এলো সোনার দেশের রাণী।
সোনায় সোনায় উঠলো ভরে শ্যামল ভুবনখানি।

ছুটির খবর আসে
গন্ধ-ভেজা মিষ্টি হাওয়ায়
শিউলি বনের পাশে।

ওই ছুটিতে রাখাল ছেলে বাজায় গোঠের বাঁশি,
ওই ছুটিতে সন্ধ্যা-মেঘে জাগলো রাঙা হাসি।
চাঁপার ডালে উঠলো ফুটে সাতটি সোনার মুখ,
দিদির স্নেহে পরশ-পাওয়া তিন ভুবনের সুখ।

ছুটির হাওয়ায় ভেসে
মধুকরের সপ্ত ডিঙা
যায়রে ছুটির দেশে!

নীল গগনের ছুটি এলো সবুজ বনের কোলে,
কাদের কোমল নীল নয়নে ছুটির মায়া দোলে ?
কাদের হাসির সোনার দেশে সোনার শরত জাগে ?
ভুবন-মাঝে স্বর্গ রাজে কাদের স্নেহের রাগে ?

কাদের ভালবেসে
সোনার আসন মা পেতেছেন
শ্যামল ধরায় এসে ?

তাদের ছুটি ফুলের বনে, তাদের ছুটি মাঠে,
তাদের ছুটি কাশের বনে বেণু-বাজা বাটে।
তাদের ছুটি ঘর-আঙিনায় পূজার দালান-কোণে,—
তাদের ছুটি ভালবাসায় ভাই-বোনেদের মনে।

তাদের হৃদয় লুটি'
মধুর মধু করলো ধরা
নীল গগনের ছুটি !

আঁধারে আলো

● যে ব্যক্তি মহত্তের অযথা কুৎসা করে, কেবল যে সেই পাপী—এমন নহে ; পরন্তু, যে সেই মিথ্যা অপবাদ বিনা প্রতিবাদে শ্রবণ করে, সেও তুল্য দোষী।

—মহাকবি কালিদাস



উচ্চৈঃশ্রবা

—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

সাতকড়ি সরকারের এম্নি কাণ্ড বটে! কথা দিয়ে কথা না রাখাই তার স্বভাবগত স্বভাব। স্কুলে, কলেজে কোনদিন সাতকড়ির কথা কেউ বিশ্বাস করত না। সেবার পূজার সময় ভাবলুম, সাতকড়ি যখন এত করে এতবার লিখছে, প্রায় এক বছর ধরে চিঠি-পত্তর চলছে, এবার সাতকড়ি নিশ্চয় তার দেশের বাড়ীতে থাকবে। এবার যাওয়া যাক্ তার দেশে।

লোভও অনেক: দহেতে মাছ ধরা হবে, বিলেতে পাখী শিকার, গ্রামের পূজা, যাত্রা, ভাসানের দিনে নদীতে বাচ-খেলা—তাছাড়া সাতকড়ির মায়ের হাতের রান্না। সাতকড়িদের জমিদারীও বেশ বড় শুনেছি।

দু'বার ট্রেণ বদল করে, ভিড়ে বস্তা-ঠাসা হয়ে সন্ধ্যেবেলায় সাতকড়ির গ্রামের ছোট ষ্টেশনে এসে পৌঁছালুম। গাড়ী থেকে নামতে নামতেই ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

আসবার আগে চিঠি দিয়েছিলুম, টেলিগ্রাফও করেছিলুম। প্লাটফর্মে সাতকড়ির কিন্তু কোন চিহ্ন নেই! ময়লা পাগড়ী-পরা এক বুড়ো দরওয়ান এসে সেলাম করলে।

লোকটা তালগাছের মত লম্বা, শুকনো সাদা-দাড়ির রাশি, শুকনো খড়ির মত কাঁপছে, হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়।

তাকে জিজ্ঞেসা করলুম,—জমিদারবাবু কোথায়?

আর একটা সেলাম করে সে নিবেদন করলে,—দাদাবাবু ত কল্‌কাতা গেছেন!

অবাক হয়ে বল্লুম,—কল্‌কাতা গেছেন কি! আমি যে কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছি। টেলিগ্রাম আসেনি?

দরওয়ান মাথা নেড়ে জানালে,—চিঠি এসেছে। টেলিগ্রাম আসতে দু'দিন লাগে, বড় পোস্টাফিস ঘুরে আসে কিনা! তা, দাদাবাবু সাতদিন বাদে ফিরবেন, বড় জরুরী



"কষ্টো হবে না, গাড়ী তৈয়ার।"

দরকার; এ ক'দিন কোন কষ্টো হবে না, বুড়ো মা-জী আছেন। আর কেউ নেই।

বল্লুম,—কতদূর যেতে হবে? ফেরবার ট্রেণ ত আজ রাতে নেই!

রূপা-বাঁধান হাতের লাঠি কাঁপিয়ে দরওয়ান বল্লে,—বেশীদূর নয়, এখান হতে চার মাইল। কষ্টো হবে না, গাড়ী তৈয়ার।

ষ্টেশন হতে বাহির হয়ে দেখি, বুড়ো দরওয়ানেরই মত প্রাচীন একটি অদ্ভুত গাড়ী দাঁড়িয়ে, পাল্কী-গাড়ী ও ফিটনের মাঝামাঝি অপূর্ব্ব বাহন! তার সঙ্গে ময়লা লাগাম-জোড়া ঘোটকদ্বয় আরও চমৎকার!

ঘোড়া দু'টি এক সাইজের নয়। একটি যেমন বেঁটে, তেমি মোটা ও কালো।

ঘোড়া যাচ্ছে, কি মোটা শুয়ার যাচ্ছে, বোঝা শক্ত; আর একটি যেমন লম্বা, তেমনি রোগা ও সাদা; হাড়-জিরজিরে চেহারা, বেঁকে দাঁড়িয়েছে যেন ক ডুঁগলে পাখী!

ওই গাড়ী করে চার মাইল পথ যেতে হবে! উপায় নেই। এখানে হোটেলও নেই, রাতে ট্রেণও নেই। 'মা দুর্গা', বলে গাড়ীতে উঠে পড়লুম।

ডিষ্টিক্ট-বোর্ডের ভাঙা রাস্তা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে গাড়ী হেলে দুলে চলতে লাগল। কখনও গাড়ী ডান পাশে হেলে পড়ে; ভাবি, এখুনি বুঝি উল্টে পড়বে, বাম পাশের দিকে ঝুঁকি। গাড়ীও বামপাশে হেলে পড়ে। প্রথমে ভয় হয়েছিল, তারপর মরীয়া হয়ে চেপে বসে রইলুম। চার চাকার ঝনৎকার দুই কানে তালা লাগিয়ে দিলে, যেন কে ক্ষেপে গিয়ে খত্তাল বাজাচ্ছে, ঝকঝং ঝকঝং!

ট্রেণের ভিড়ের চাপে দেহের হাড়-পাঁজরা কে যেন ঠেসে প্যাক করে দিয়েছিল, এখন গাড়ীর ঝাঁকুনিতে শরীরের হাড়গুলি কে যেন ছড়িয়ে ফেলে নাচাতে লাগল! যাক্, হাড়গোড় আস্ত রেখেই সে-যাত্রা সাতকড়ির বাড়ীতে পৌঁছলুম।

চার-মহলা বৃহৎ বাড়ী! কিন্তু সব জীর্ণ, পরিত্যক্ত, অন্ধকারময়। দেওয়াল ফেটে অশ্বত্থ গাছ উঠেছে, উঠানে ঘাস গজিয়েছে, জানলার গরাদ ভেঙে পড়ছে, ভাঙা কটকের রকে একটি হ্যারিকেন টিম্‌টিম্ জ্বলছে। ময়লা সাদা-কাপড় পরে সাতকড়ির মা দাঁড়িয়ে, এই প্রাসাদের পূর্ব্বগৌরবের বিষাদময়ী স্মৃতির মত!

—এসো বাবা, এসো, কি-যে আনন্দ হল তোমায় দেখে! বলে তিনি আমায় অভ্যর্থনা করলেন, তারপর বোধহয় অতীতের জাঁকজমকের দিনের কথা ভেবে চোখ মুছতে লাগলেন।

রাতে খাওয়াটা হল খুব পরিপাটি, পথের সকল কষ্ট-পাওয়া পুষিয়ে গেল। তিন পুকুর হতে তিন রকম মাছ, বাড়ীর গরুর দুধের তৈরি পায়েস, মিষ্টি! নিরামিষ তরকারী যে, এত রকম ও এত সুস্বাদ হতে পারে, তা-ও কখনও ভাবিনি!

রাতে শোবার ব্যবস্থা হল বড় বৈঠকখানা ঘরে। মস্ত বড় লম্বা ঘর, তার সামনে ঘেরা বারান্দা। তারপর লম্বা ঘেরা উঠানের একদিকে ঠাকুর-দালান, একদিকে

চণ্ডীমণ্ডপ। সেটি ভেঙে পড়েছে, পাশে টিন ঘিরে অশ্বশালা তৈরি হয়েছে। চারিদিক নিঝুম, অন্ধকার, জনমানবশূন্য।

ওই বড় ঘরে প্রকাণ্ড তক্তপোষের এক কোণে একা শুতে গা ছম্‌-ছম্‌ করতে লাগল। বুড়ো দরওয়ান লাঠি ঠক্‌-ঠক্‌ করে জানিয়ে গেল, কোন ভয় নেই, সে বাহিরে দেউড়িতে আছে। চোর-ডাকাত আসতে সাহস করে না এ বাড়ীতে। ভাবলুম, ভয় ত চোর-ডাকাতের নয়, ভয় হচ্ছে অন্য কিছুর!

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা কমিয়ে দিলুম, একেবারে নিভিয়ে দিতে সাহস হল না। দরজা-গুলি বন্ধ করতে গিয়ে দেখলুম, বেশীরভাগ দরজার খিল ভেঙে খুলে গেছে। সুতরাং দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা বৃথা। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, টিপ্‌টিপ্‌ বিষ্টি পড়তে লাগল। গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ বড় সুন্দর শুনতে! কিন্তু সে-রাতের অন্ধকারে একা বড় বৈঠকখানা ঘরে সেই শব্দ খুব মধুর শোনাচ্ছিল না, বরং গা মাঝে মাঝে শির্‌-শির্‌ করে উঠছিল! জোরে চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, একটা অদ্ভুত শব্দে যেন ঘুম ভেঙে গেল!

—চিঁহি! চিঁহি!

চম্‌কে উঠে বল্লুম,—কে?

মনে হল, ঘেরা বারান্দার দিকে দরজা ঠেলে কে প্রবেশ করছে। চাদর মুড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে বল্লুম,—কে?

উত্তর এল—চিঁহি, আমি উচ্চৈঃশ্রবা।

—উচ্চৈঃশ্রবা! কে তুমি? সমুদ্র-মন্থন আবার আরম্ভ হল নাকি!

নিজের গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখলুম, বেশ লাগছে। মনে হল, খোলা দরজায় এক সাদা-মূর্ত্তি ঘোড়ার মুখের মত! যে লম্বা হাড়-পাঁজর-বাহির-করা সাদা ঘোড়া ষ্টেশন হতে আমাকে গাড়ী টেনে নিয়ে এল,—সেই ঘোড়াটা দরজায় দাঁড়িয়ে!

বালিশ ঠেসান দিয়ে উঠে বসলুম। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা উস্কে দিলুম, কেরোসিনের উৎকট গন্ধ ও ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

হেসে বল্লুম,—কি বল্লে ? তুমি উচ্চৈঃশ্রবা ! কিন্তু আজ স্টেশন হতে আসবার সময় গাড়োয়ানটি তোমাকে ত ও-নাম ধরে ডাকছিল না, যে সব কথায় ডাকছিল, সেগুলি ভদ্র-সমাজে উচ্চারণ করা যায় না।

ঘোড়াটি আরও এগিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বল্লে,—কেন, আমার উচ্চৈঃশ্রবা নাম হতে পারে না ?

বল্লুম,—হতে পারবে না কেন ? অতি দুরন্ত ছেলের নাম সুশান্ত, অতি কালো মেয়ের নাম কনকলতা, অতি বদমাইস জুয়াচোরের নাম মধুসূদন হতে পারে, আর তোমার নাম উচ্চৈঃশ্রবা হতে পারবে না কেন ?

—চিঁ হিঁ ! আচ্ছা ওই যে বুড়ী-গিন্নীকে দেখলে, মনে করতে ত পারো, একদিন তিনি বেনারসী শাড়ী পরে, কানে হীরের দুল দুলিয়ে, গলায় মুক্তোর মালা পরে, কপালে টিপ দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, লক্ষ্মী-প্রতিমার মত।

বল্লুম,—হাঁ, তা একদিন সত্যি ছিল।

মেজেতে খুর ঠুকে ঘোটক বলে উঠল,—তাহলে শোন, আমারও এমন সুদিন ছিল যে, আমার সাজ দেখলে তোমার চোখ ঝলসে যেত, আমার গলায় মোতির মালা দুলত !

হেসে বল্লুম,—হাঁ, ঝুটা মতি !

—চিঁ হিঁ ! শোন আমার গল্প, তারপর হেসো। শাস্ত্রে বলেছে, জানো ত সুখ ও দুঃখ জীবনে চাকার মত ঘুরছে ! জীবনে প্রথম ভাগ সুখ তারপর দুঃখ, এই আমার ভাগ্যে ঘটেছে ; তার চেয়ে প্রথম ভাগ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে শেষের ভাগ সুখই ভাল।

বল্লুম,—তুমি তত্ত্বকথাও জান দেখছি ! তার চেয়ে তোমার গল্প বলো, আজ রাতে আর ঘুম হবে না। আর এই বৃষ্টি-ভরা অন্ধকার রাতে এ-ঘরে জেগে থাকতে বড্ড একা মনে হবে, তার চেয়ে তোমার গল্প শুনি !

—চিঁ হিঁ ! কলকাতায় বাবুবাগানে শেঠদের জানো ত ? মস্ত জমিদার ! তার ওপর তেলের কল, কাটা-কাপড়ের দোকান, নানা ব্যবসা ! সেই বুড়ো শেঠজী ছিলেন আমার মালিক, আমি ছিলুম তাদের বড় জুড়ির ঘোড়া। সাহেব-বাড়ীর তৈরি তাদের বড় ঝকঝকে জুড়ি-গাড়ী টেনে টগ্‌বগ্ করে যখন তাদের বড় গেট দিয়ে বাহির

হতুম, সামনে সাজ-পরা সহিস ছুটত 'রক্ষে' বলে। লম্বা গোঁফ পাকিয়ে মুস্তাক আলি জোরে রাশ টেনে ধরে রাখতো, আমার নতুন পালিশ-করা সজ্জা ঝকঝক করত সোনার সাঁজোয়ার মত, তখন আমায় দেখলে তোমার তাক লেগে যেত!

জুড়ি করে বুড়ো শেঠজী সাদা-দাড়ি আঁচড়ে, আতর মেখে, তাঁর ছোট নাত্‌নীকে মখমলের সাজ পরিয়ে, রোজ হাওয়া খেতে যেতেন গঙ্গার ধারে। তাঁর ফুট্‌ফুটে নাত্‌নীর নাম ছিল চন্দ্রা। সে আমাকে খুব ভালবাসত, আমিও তাকে খুব ভালবাসতুম। রোজ সকালে সে আস্তাবলে এসে আমায় খাওয়াত,—ঘাস-ছোলা নয়, তার মায়ের কাছ থেকে নানা রকম মজার খাবার নিয়ে আসত!

বিকেলে যখন সহিস আমায় সাজ পরাত, সে এসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ত। কোথাও একটু ময়লা থাকলে চলবে না, আয়নার মত সব ঝক্‌ঝক্ করবে! সাজপরা হয়ে গেলে হাততালি দিয়ে বলে উঠত, বাঃ, কি সুন্দর দেখতে!

আমি তখন এম্নি রোগা ছিলুম না, আমার ধপ্‌ধপে সাদা রঙ্ দেখে কত সাহেব আমায় কিনতে চেয়েছে!

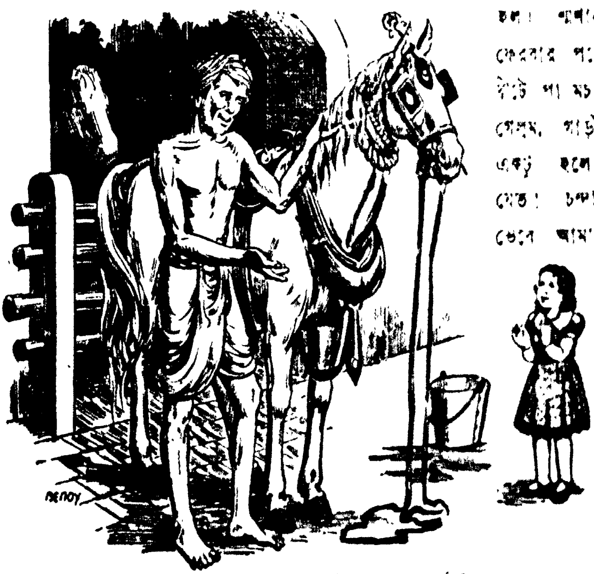
চন্দ্রা যখন বিকেলে ইডেন-গার্ডেনে বাজনা শুনতে যেত, আমার খুব ভাল লাগত! ব্যাণ্ডের তালে তালে আমি মাথা নাড়তুম, পা দোলাতুম, মুস্তাক আলি হাঁক দিয়ে উঠত, আর চন্দ্রার মজা লাগত। কিন্তু যেদিন তারা সার্কেস দেখতে যেত গড়ের মাঠে, আমার মন খারাপ হত। রাস্তার ধারে ভিড়ের মধ্যে আমাকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

ভেতরে তাঁবুতে আলো জ্বলছে, নানা রঙের সাজে কত সুন্দর ঘোড়া নেচে বেড়াচ্ছে, ক্লাউনদের সঙ্গে খেলা করছে, চন্দ্রা হাততালি দিয়ে উঠছে, আর বাহিরে আমি টিনের দেওয়ালে-মারা ঘোড়ার ছবিগুলির দিকে চেয়ে ছটফট করতুম্। তারপর বাড়ী ফেরার সময় গাড়ীতে চন্দ্রা সার্কেসের ঘোড়াদের গল্প, তাদের খেলার প্রশংসা করত; শুনে আমার ভয়ানক ঈর্ষা হত! ভাবতুম, আমিও তাদের চেয়ে ভাল খেলা দেখাতে পারি। রেগে খুব জোরে গাড়ী টেনে ছুটতুম্, মুস্তাক আলি রাশ টেনে রাখতে পারত না!

চিত্রকর
শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

আমার সুখের দিন কিন্তু বেশীদিন রইল না। চন্দ্রার অসুখ করল। ডাক্তার ডাকতে ঔষধ আনতে গাড়ী বাহির হত। আমাকে জুতলে, আমি পাগলের মত গাড়ী টেনে ছুটতাম। মুস্তাক আলি ছিপ্‌টি চালিয়ে বলত, আরে এ ঘোড়ারও দুখারে হল নাকি? এ পাগলা হয়ে যাচ্ছে! আমার আর ভাল লাগত না, ভাল করে খেতে পারতুম না।

চন্দ্রার আর অসুখ সারল না। তার মৃত্যুর সঙ্গে আমার পরম দুঃখের দিন আরম্ভ হল। শ্মশান হতে ফেরবার পথে বিশ্রী ইটে পা মচকে পড়ে গেলুম, গাড়ী আর একটু হলে উল্টে যেত! চন্দ্রার কথা ভেবে আমায় কেউ



হাততালি দিয়ে বলে উঠত, বাঃ, কি সুন্দর দেখতে! [পৃঃ ৩৬৮]

মারপিট করলে না। পা সারলো, কিন্তু জুড়ি-গাড়ীর চাল রইল না! বুড়ো শেঠজী মনের দুঃখে জুড়ি-গাড়ী চড়াও ছেড়ে দিলেন। তাঁর ছেলেরা বল্লে, এবার ও গাড়ী-ঘোড়া সব বেচে দাও। শেঠজী রাজী হলেন। ছেলেরা ত এতদিন তাই চাইছিল! জুড়ি বেচে এল মস্ত আমেরিকান্ মোটর-কার্।

● চিত্রলেখা
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বসু

করিম মিঞা নামে এক ছ্যাকরা-গাড়ীর গাড়োয়ান আমাকে কিনলে। আমাদের কোচমান মুস্তাক আলি কোথায় গেল, এখনও তার তেমনি লম্বা সরু গোঁফ আছে কিনা জানতে ইচ্ছা করে!

জুড়ির ঘোড়া হতে হলুম কলকাতার ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়া! কি অবস্থা হল, বুঝতেই পার! লক্ষপতি যেন রাতারাতি দেউলে হয়ে গেল! কলকাতার ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়া, ভাল করে দেখেছ কি? তারা খাটে সবচেয়ে বেশী, খেতে পায় বড় কম; রোদে-জলে, দিনে-রাতে, বড় রাস্তায়, গলিতে সারাক্ষণ তাদের চরতে হয়!

আচ্ছা বলতে পার, সে ধর্ম্মঘট হয়েছে কি? কি ধর্ম্মঘট জিজ্ঞাসা করছ? ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়াদের ধর্ম্মঘট—ষ্ট্রাইক্!

না, সে রকম কিছু হয়নি! আমি চলে এলুম কলকাতা থেকে। আর কে করবে বল! আমি জুড়ি-গাড়ীর ঘোড়া বলে ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়ারা প্রথমে আমাকে সমীহ করে চলত, আমিও তাদের একটু ঘৃণার চক্ষে দেখতুম। তারপর, কিছুদিন পরে খাটুনি ও খাদ্যাভাবে আমিও আকৃতি-প্রকৃতিতে ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়া হয়ে গেলুম।

মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠত! ঘোড়াদের মধ্যে ধর্ম্মঘট করবার মতলব আমার-ই। আমাদের আস্তাবলে বড় রাস্তার মোড়ের গাড়ীর আড্ডায়, নানা স্থানে আমি ঘোটক-ঘোটকীদের দলবদ্ধ করবার, ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত করবার জন্যে বক্তৃতা দিলুম। এ সব ব্যাপারে, জানই ত, নানা মত ও নানা দল হয়।

একদল বল্লে, ধর্ম্মঘট করে কি হবে? স্বাধীনতা চাই! এস, একদিন এক সময়ে আমরা সবাই গাড়ী উল্টে দেব, লাগাম ছিঁড়ে বাহির হয়ে যাব, পথে এমন ছুটোছুটি করবো!

আর একদল বিদ্রূপ করে বল্লে, তাতে স্বাধীনতা হচ্ছে কোথায়? এ মানুষের সহর। সহর ছাড়িয়ে যে-গ্রামে, পথে, প্রান্তরে যাও না কেন, সব জায়গায় মানুষের প্রভুত্ব, মানুষের রাজত্ব; মানুষদের সঙ্গে একটা রফা-বনিবনা করেই আমাদের চলতে হবে। এখানে মধ্য-এসিয়ার বা অষ্ট্রেলিয়ার সে দিগন্তবিস্তৃত মানবহীন প্রান্তর কোথায়? আমাদের সে স্বাধীন বন্য জীবন বহুদিন শেষ হয়ে গেছে!

● উচ্চৈঃশ্রবা
শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

আর একদল বল্লে, আমরা ভারতবর্ষের ঘোড়া, অহিংস অসহযোগ করে আমাদের ন্যায্য অধিকার পাবার চেষ্টা করব ; নরহত্যা, রক্তপাত করতে পারব না। এসো, একদিন সবাই মিলে ঠিক করি—আমরা গাড়ী টানব না, পথে গাড়ী জোতা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকব !

তাতে আমাদের হয়ত খুব মার খেতে হবে, সে মার সহ্য করতে হবে। রোজই ত চাবুকের মার খাচ্ছি, একদিন নয় বেশী করে খাব। আর এম্নি মার খেয়ে আমরা জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারব ; জনসাধারণ আমাদের পক্ষে হলেই, তবে আমাদের অবস্থার উন্নতির আশা আছে। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে খাবার পাবার অধিকার, গ্রীষ্মের রোদে বিশ্রামের অধিকার, বর্ষায় গায়ে ওয়াটারপ্রুফ ও শীতে কম্বল পাবার অধিকার, আমাদের আস্তাবল মাছি-মশাহীন পরিষ্কার রাখার অধিকার, আমাদের নানা দাবী আছে। জনসাধারণকে আহত করে গাড়ী উল্টে ফেলে দিলে, কে আমাদের পক্ষ সমর্থন করবে ?

যাক্, এই নানা দলাদলিতে আর ঘোড়াদের ধর্মঘট হল না। তারপর একদিন আমার নতুন মনিব করিম মিঞা মাতাল হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তার জ্ঞান আর ফিরে এল না ! তার বিধবা স্ত্রী আমাকে বিক্রি করে দিলে। তোমার বন্ধু সাতকড়ি সরকার মহাশয় আমাকে কিনলেন।

তিনি যে আমাকে এই অজ-পাড়াগাঁতে নিয়ে আসবেন জানলে, আমি হয়ত বিদ্রোহ করতুম ! কিন্তু এখন একেবারে ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়া বনে গেছি, আর বিদ্রোহ করবার শক্তি বা ইচ্ছা নেই। তুমি কলকাতা থেকে এসেছ, সেজন্য তোমায় দুঃখের কথাগুলি বলতে এলুম !

চিঁহি ! চিঁহি !

তুরঙ্গবরের হ্রেষাধ্বনিতে চমকে উঠলুম ; বল্লুম,—তোমার গল্পটি বন্ধ করুন ; বিষ্টি বোধ হয় থেমে এল, অথবা ভোর হয়ে এল বুঝি !

ঘোড়াটি মেজেতে খুর ঠুকে বলে উঠল,—হাঁ, ভোর হয়ে আসছে, আমায় যাবার

সময় হল, আর কিন্তু আমি ওই ভাঙা আস্তাবলে ফিরছি না! আচ্ছা বলতে পারো, ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়া মরে গিয়ে আবার কি হয়ে জন্মায়?

গম্ভীরভাবে বল্লুম,—বোধ হয় বাংলাদেশে সওদাগরী আফিসের কেরাণী হয়ে জন্মায়!

ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল; হতাশ সুরে বল্লে,—বড় ইচ্ছে, মুস্তাক আলির মত কোচোয়ান হয়ে জন্মাই, গোঁফে তা দিয়ে জোরে রাশ টেনে চাবুক চালাই। চিঁহি!

সশব্দে বড় দরজাটা নড়ে উঠল। চমকে চেয়ে দেখলুম, একটা সাদা ছায়া দরজা দিয়ে সরে গেল!

জানলা দিয়ে ভোরের আলো আসছে, শুকতারা কালো মেঘগুলির ফাঁকে চেয়ে আছে পথ-হারা শিশুর মত! আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

যখন ঘুম ভাঙল, ঘর আলোয় ভরে গেছে। বুড়ো দরওয়ান লাঠি ঠুকে বলছে,—উঠে পড়ুন হুজুর, চা তৈয়ার!

চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে-ভাজা, মিষ্টি, অনেক রকম খাবার এল।

চা খেয়ে বল্লুম,—আজ দুপুরের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।

দরওয়ান সেলাম করে বল্লে,—আজ তো যাওয়া হবে না হুজুর, গাড়ী যে নেই!

বিস্মিত হয়ে বল্লুম,—কি হয়েছে?

দরওয়ান মাথা নেড়ে বল্লে,—একটা ঘোড়া মরে গেছে হুজুর, রাতে মরে গেছে।

লাফিয়ে উঠলুম,—মরে গেছে! কোন্ ঘোড়া? কখন? কোথায়?

দরওয়ান থতমত হয়ে বল্লে,—সেই যে লম্বা রোগা সাদা ঘোড়া, কাল গাড়ী টেনে আনল হুজুর! আমি তখনই বলেছিলুম, ও কলকাতার বাবু-ঘোড়া, এ গাঁয়ের কাজ পারবে না, ও বেশীদিন টিকবে না। কাল রাতে মরেছে, যখন খুব বিষ্টি হচ্ছিল। অশ্বশালায় নেই, দূরে মাঠে মরে পড়ে রয়েছে!

পা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল, হাত-পা কাঁপতে লাগল, এক ভাঙা চেয়ারে বসে পড়লুম!

দরওয়ান আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে,—আপনার কি ম্যালেরিয়া আছে হুজুর? জ্বর এল?

● উচ্চৈঃশ্রবা
মণীন্দ্রলাল বসু

—না, ম্যালেরিয়া নয়! দরওয়ান, আমাকে আজই ফিরতে হবে, এখানে আর এক রাতও বাস করা চলবে না ; হেঁটেই স্টেশনে যাব!

সাতকড়ির মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলুম। সেদিনকার রান্নার আয়োজনের দীর্ঘ তালিকা দিয়েও তিনি আমায় ভুলিয়ে রাখতে পারলেন না।

পরে সাতকড়ি ক্ষমা প্রার্থনা করে, অনেক অনুনয় করে তার দেশে আবার যেতে লিখেছিল, কিন্তু আর কখনও যাইনি! মাঝে মাঝে ছ্যাকরা-গাড়ীর কোন ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনলে এখনও চমকে উঠি!

আঁধারে আলো

● পরীক্ষা পাশ করাই যেখানে ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের স্থান কোথায়? পরীক্ষা পাশ করিবার এইরূপ হাস্যকর উন্মাদনা আর কোন দেশে দেখা যায় না! আর পাশ করিয়াই সরস্বতীর নিকট চির-বিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ বাসনা ও মনোবৃত্তি আর কোন দেশেই নেই! আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, ভিতরের রত্নরাজি ফিরিয়াও দেখি না!

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

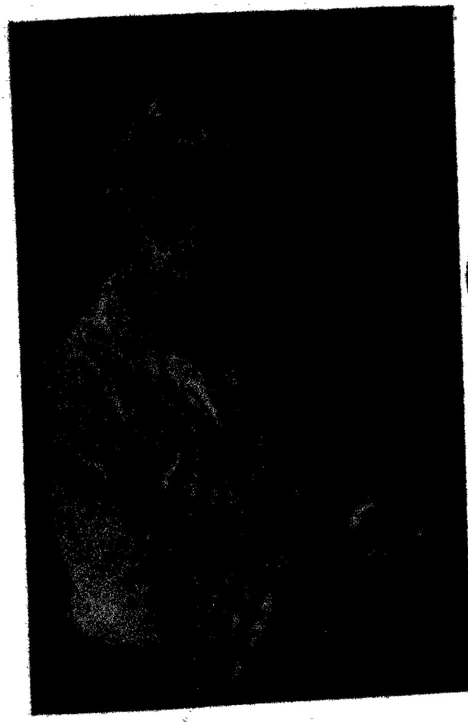
সুদূরের বাণী

অযোগ্যতার কারণ

ভারতবর্ষ যে নিজেকে শাসন করিবার উপযুক্ত, সেরূপ পাঁচ হাজার বৎসরের সুন্দর নজীর রহিয়াছে। ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভারতের ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া দেখ, তুলনায় ভারতবর্ষের লজ্জিত হইবার কোন কারণ আছে কি? অনুপযুক্ত হইয়াও অন্যান্য জাতি স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত হইয়াও ভারতবর্ষ অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, তাহার বশ্যতা।

● অ্যানী বেশান্ত

আলপনা—



প্রতীচি ঘুরিয়া আমি যেথায়,
প্রাচ্যের তরে ভাবিনা কভু।
তাই গো জননি, চরণে তোমার
ভারতবর্ষ ভকতি-নত।



—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

নাঃ, বিয়ের নেমন্তন্ন পেলে আর ছাড়া নয়। [illegible], একবেলা খাই গেছি বলে যে লুচির পাতাতেও বসবার জো হবে, এমন কোনো [illegible] আমার [illegible] নেই না। বরং, যতদূর সাধ্য খাদ্যাখাদ্যের ওপর দিয়েই তার শোধ তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমার মত।

অতএব, বটকেষ্টর বিয়ের নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে দ্বিধা করলাম না।

কাজেই, শ্রীরামপুরে বিয়ে। ঘড়ি ধরে শেষ লোকাল ধরতে গিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম, গাড়ী আমার ধরাধরির অপেক্ষা রাখেনি। আমিও পৌঁছেছি, আর উনিও ছেড়েছেন। কামরাগুলি একে-একে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে—কামরা তো নয়, কাম্য দ্রব্যের জিনিস সব—[illegible]গুলি পায়েস-পিষ্টক-সন্দেশ-মিষ্টি নাগালের বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছে—এ দৃশ্য চোখে দেখা দুঃসহ।

এমন অবস্থায় লোক মরীয়া হয়ে ওঠে, প্রাণ দিয়েও [illegible] পরোয়া করে না। অদম্য ইচ্ছার বশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আমিও অচিরে চলমান ট্রেনের ওপরে [illegible] নিজেকে নিক্ষেপ করেছি।

একেশ্বর নেতাকে (কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর সম্বল করে) জন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছ? না দেখে থাকলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ওপরে লক্ষ্য রেখো—শ্রদ্ধা ও আনন্দ দুইই একত্র লাভ হবে। জন-সমুদ্রকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় এক-এক সময়ে—একমাত্র ফুটবল-রেফারির ওপরে। কিন্তু আমার বেলায় যেন উভয়ের যোগাযোগ ঘটল। আমিও লাফিয়ে পড়লাম, আর [illegible] সেই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এল। হাতাহাতি হয়ে জানালা ভেদ করে কি করে যে কামরার মধ্যে পদার্পণ

করলাম, জানিনে! ...(জীবনের ক'টা রহস্যই বা অন্তিম দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগের পূর্ব্বে জানা যায়? কিন্তু হায়, তখন জানা গেলেও আর জানান যায় না!)

কামরার মধ্যে পা দিয়েই, আমার পায়ের দিকে নজর পড়ল। আর অমনি আমি চীৎকার করে উঠলাম—"হ্যাঁ? আমার জুতো গেল কোথায়? আরেক পাটি আমার?"



আমিও লাফিয়ে পড়লাম আর অসংখ্য হাতও ঝাঁপিয়ে এল।
[পৃঃ [illegible]

বলতে না বলতে অসংখ্য পাটি বেরিয়ে এসেছে—পদতল থেকে নয়—আর সবার মুখ গহ্বর হতে।

"ও! আপনার আরেক পায়েও জুতো ছিল বুঝি? কিন্তু, কই দেখচিনে তো!" বল্লেন কামরার একজন।

"জুতো ছিল তার মানে? আমি কি এক পায়ে জুতো পরে ইষ্টিশনে এসেছি নাকি?"

লোকটার কথার ধরণে অবাক্ না হয়ে পারা যায় না: "কেউ কি এক পায় জুতো নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে যায় নাকি?"

"খাবেন তো মুখে, তার পায়ের সঙ্গে কি? কিন্তু তা বল্‌ছিনে, আপনার এক পায়েই আপাতত দেখা যাচ্ছে কি না, তাই বল্‌ছিলাম।"

"তাই কী বল্‌ছিলেন শুনি? আমার আরেক পাটি জুতো ছিল না—নাকি?" এবার আমার রাগ হয়ে যায়।

"না, না—তা নয়, আপনি দু পায়ে জুতো পরেই বেরিয়েছিলেন তো? মনে আছে তো ঠিক?"

"মনে আছে, তার মানে?"

ভদ্রলোকের রসিকতা থেকে উঠে আমার মনের মধ্যে পাক লাগায়, আমার মুঠোর মধ্যে ঘুষির মত আকার ধরতে থাকে।

"ধরেন তো, এই হতে আপনাকেও মনে পড়িয়ে দিতে পারি, দেখ?"

● [illegible]
শিবরাম চক্রবর্তী

"আহা, চটছেন কেন? দুপাটি জুতোই এক সাথে কেন খইতে পাকে, এই ভেবে কেউ-কেউ আলাদা-আলাদাও তো পরতে পারে! আপনিই যে সেই সুবিবেচকদের একজন হবেন না, তার কি কোনো মানে আছে?"

এ-কথায় আমি কোনো কথা বলিনে, আপন মনে গজরাতে থাকি:

"যেমন আপনাদের কাণ্ড! বলা নেই কওয়া নেই, হৈ হৈ করে জানালা দিয়ে টেনে তুললেন— যেন বেওয়ারিশ একটা লাশ পেয়েছেন! এমন তাড়াহুড়ো লাগালেন যে, চোখে-কানে দেখতে দিলেন না! কোনোদিকে যে একটু তাকাবো, তার ফুরসৎ দিলেন না পর্যন্ত! তাইতো এমন কাণ্ডটা ঘটল! কেন মশাই, অমন করে ধরে-বেঁধে টানা-হ্যাঁচড়া করে টেনে তোলবার কি দরকারটা ছিল শুনি? জানালা দিয়ে ওইভাবে আমাকে আমদানি না করলে কি চলত না? আর, অমন করে অত কষ্ট করে জানালা দিয়েই বা আমি আসব কেন? আসতে যাব কেন? কেন, আমি কি নগদ পয়সায় টিকিট কাটিনি নাকি?"

"আপনি নিজেই কাটা পড়তেন যে! টিকিটের মতই ঠিক কাটা পড়তেন। গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল কি না!" জানালেন ওঁদের একজন।

"কাটা পড়তাম, সেও আমার ভালো ছিল। তাহলে তো আমার জুতোটা এভাবে খোয়া যেত না। নতুন কেনা বোম্বে-স্লিপার মশাই, ছ' টাকা ন-আনা দাম!"

আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে থাকে: "তার ওপর একুশ পয়সা সেল-ট্যাক্স। কতো বার কতো বাড়ী নেমন্তন্ন খেলে তবে যে টাকাটা উঠবে, কে জানে!"

"আরে মশাই, দুঃখ করছেন কেন? কাটা পড়লে ল্যাঠা চুকে যেত তা ঠিক, জুতোর শোকটা আর আপনার লাগত না; কিন্তু ভগবানের আপনার ওপর নেক্‌নজর থাকতে পারে তো? আছে কি না বলা তো যায় না! সে রকম টান্ আপনার ওপর তাঁর থাকলে, নিজের ল্যাঠা তিনি ল্যাজের দিকেও কাটতে পারতেন। মাথায় কাটা না গিয়ে, মাথায় মাথায় বেঁচে, পায়ের দিকেও কাটা যেতে পারতেন তো?"

অপর একজন তস্যাবহতর অঘটনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল: "জুতো খোয়া যাওয়ার চেয়েও সেটা বেশি খোয়ার হোতো নাকি?"

"আর, পা খরচ হয়ে গেলে জুতো পরতেনই বা কোথায়?" আরেকজনের অনুযোগ শোনা গেল।

"পরতুম আমার মাথায়!" বিরক্ত হয়ে বলি, এবং জানালার বাইরে ক্রক্ষেপ করি; কিন্তু এখন তাকানো বৃথা। গাড়ী কখন্ প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, লাইনের গোলকধাঁধা এড়িয়ে, সিগ্‌ন্যাল-

● চটির সঙ্গে চটাচটি
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

সমারোহ পার হয়ে শিমুয়ার পথে এসে পড়েছে! এখান থেকে সেই পলাতক স্লিপারের টিকি দেখার চেষ্টা করা দুরাশামাত্র।

তাহলে আর এই আরেক পাটি বজায় রেখে কি হবে? কোন্ কাজে লাগ্‌বে এ? পায়েও লাগবে না, লেগেও লাগবে না। মাঝখান থেকে মনে লাগবে কেবল। জুতোর কাঁটার মতই খচ্‌খচ্‌ করবে মনের মধ্যে। না, কাজ নেই।



"আহা-হা! করেন কি! করেন কি!"

অন্যটিকেও জানালা গলিয়ে আগেরটির অনুসরণে পাঠাতে যাচ্ছি, গাড়ীর সবাই হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লেন।

"আহা-হা! করেন কি! করেন কি!! অমন করে কাউকে তাড়িয়ে দিতে আছে? যাকে রাখো সেই রাখে—এ কথাটাও কি জানেন না?"

জানি তো, কিন্তু যে আমাকে পায়ে রাখবে না—তাকে রেখে লাভ? এ বরং সাম্‌নে থেকে, হারানো আরেকজনের কথা মনে করিয়ে দেবে—বারবার আমার পুরানো শোক উথলিয়ে তুল্‌বে, সেই কি ভালো? ...এই কথাটাই, যুতমতো ভাষায়, জুতোর দুষ্ট স্মৃ সামনে রেখে বলি তাঁদের। হাতের জুতো হাতে রেখেই বলি।

"ফেল্‌তে চান ফেলুন! আপনার জিনিস আপনি ফেল্‌বেন, আমরা না বলবার কে? আমরা কোনো বাধা দিতে চাই নে। তবে আরেকবার আরেক পাটি জুতো ঠিক এইভাবেই গেছল—আর তার মালিককে একদিন চোখের জল ফেল্‌তে হয়েছিল তার জন্তে। সেই কথাই বল্‌ছিলাম।" ওদের মধ্যে প্রবীণ গোছের একজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লেন।

সেই কথা শুনে—কাহিনী না শুনেই—আমি তড়কে গেলাম। হাতের জুতো হাতেই থেকে গেল আমার।

● ছবির সঙ্গে চটাচটি
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

"কথাটা কি শুনি ?" বলতে গিয়ে, গাড়ীশুদ্ধ সবার গলা থেকে নিজের প্রশ্নটাই শুনতে পেলাম যেন ! সমবেত কণ্ঠে যুগপৎ একই জিজ্ঞাসা।

"সেও ঠিক এই রকম ব্যাপার। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে গিয়ে—কিংবা, সঠিক ভাবে বলে, পায়ের লক্ষণ হাতে ঠেলতে গিয়ে—শেষটায় আপসোস !" এই বলে ভদ্রলোক একটু জিরিয়ে, আমাদের কৌতূহলের অধিকতর উদ্রেক করে—সুরু করলেন :

"শরৎচন্দ্রের নাম শুনেছেন তো ? সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র ? তাঁরই গল্প।"

সুরু হোলো ভদ্রলোকের বর্ণনা :

"শুনুন তাহলে। তাঁর গল্প বটে, কিন্তু তাঁর লেখা কোনো গল্প নয়, তাহলে তো তাঁর গ্রন্থাবলীতেই পেতেন। এ হচ্ছে তাঁর নিজের জীবনে ঘটিত এক গল্প।

শিশিরকুমারের থিয়েটারে শরৎচন্দ্র তাঁর নিজেরই কি একটা বইয়ের অভিনয় দেখতে গেছলেন। অভিনয় তো দেখলেন, অভিনয় দেখা আর এমন কি কষ্টকর ? তবে কষ্টের ব্যাপার ঘটল তার পরে—নিজের পাম্পশুর একপাটি অভিনয়-শেষে আর দেখতে পেলেন না !

পদচ্যুত পাম্পশুর একপাটি আবার যাবে কোথায় ? পায়ের কাছাকাছিই তো পড়ে থাকবার কথা—কিন্তু তার ত্রিসীমানাতেও সে নেই। কুশন্ চেয়ারের এধারে ওধারে নানা ধারে পা দিয়ে যতোটা হাতড়ানো যায়, তার তিনি ত্রুটি করলেন না, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে হাতানো গেল না। কাজেই, বিরক্ত হয়ে শরৎচন্দ্র আর যে-পাটিটাকে হাতের কাছে পেলেন, তাকেই হস্তগত করে উঠে পড়লেন।

শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা থিয়েটারের বাইরে এসে অবাক্ হয়ে গেল। দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের খালি পা এবং খালি এক পাটি পাম্পশু ! তাও আবার তাঁর যথাস্থানে নেই—পায়ে নয়—হাতেই বিরাজ করছে ! অবাক্ হবার কথাই নয় কি ?

'এ কি দাদা ? আপনার জুতো কোথায় ? আরেক পাটি দেখচিনে যে ?' চেঁচিয়ে উঠলেন একজন।

'দেখতে পেলে শ্রীচরণেষুই দেখতে !' বল্লেন শরৎচন্দ্র : 'কষ্ট করে আর শ্রীহস্তে দেখতে হোতো না।'

'তবে ওটাকে আর কেন হাতে করে রেখেছেন ? ফেলে দিন্। জুতো আপনার হাতে মানায় না।' জানালেন একজন। দৃষ্টিকটু ওই দৃশ্য বোধ হয় তাঁর অসহ ঠেকছিল।

সখিদ নেত্রে চারধারে তাকালেন শরৎচন্দ্র। তারপর বল্লেন : 'উঁহু, সেটি হচ্ছে না। বাইশ

● চটির সঙ্গে চটাচটি
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

টাকা দামের সেদিনের কেনা এই দামী পাম্প এইখানে ফেলে যাবো তুমি ভেবেচ? চোর ব্যাটা এখানেই কোথাও আড়ালে আছে। তক্কে তক্কে রয়েছে! একপাটি রেখে কী আর হবে এই ভেবে বৈরাগ্যবশে যেই না আমি এটিকে ফেলে দিয়ে যাব, অমনি উনি এসে মজা করে এটিকেও হাতাবেন—পুরো জোড়াটাই হাত-সাফাই করবেন! সেটি হচ্ছে না। আমার পাম্প নি'খরচায় উনি পরে আরাম করে বেড়াবেন, সেটি আমি হতে দিচ্ছি নে। এ আমি বাড়ী নিয়ে যাব।'

এই বলে সন্নিহিত চোরের আশায় ছাই দিয়ে সঙ্গিহীন পাম্পটাকে বগলদাবাই করে বাড়ীর দিকে তিনি রওনা হলেন।..."

"তারপর কী হ'ল? তারপর কী হ'ল?" গাড়ীশুদ্ধ সবাই আমরা কৌতুহলী হয়ে উঠলাম।

ভদ্রলোক একটু দম নিচ্ছিলেন।—"শুনুন না বলি। সেই কথাই তো বলচি!—

চোর হচ্ছে অনেকটা চোর-কাঁটার মত। কাপড়-চোপড়ের কোথাও যদি একবার লাগে তো ছাড়ান দায়। সে সময়ে তিনি কলকাতার পরপারে—হাওড়া পেরিয়ে—বাজে শিবপুরে থাকতেন। তখন ছিল পুরাণো হাওড়ার পুল। গঙ্গার ওপর দিয়ে ট্রামের যাতায়াত ছিল না, হেঁটে পুল পেরুতে হ'ত। হাওড়া-পুলের মাঝামাঝি এসে শরৎবাবুর মনে হ'ল, জুতোর লোভে-লোভে চোরটা তাঁর পাছু-পাছু আসছে না তো? শেষটায় একটা জুতোর খোঁজে এসে তাঁর আর সব দামী জুতোদেরও না ফাঁক করে চলে যায়! বেনোজল ঘরে টেনে এনে ঘরের জল বার করে দেয়া কোন কাজের কথা নয়, এই কথা তিনি ভাবলেন।

ডিটেক্‌টিভ বই টই শরৎচন্দ্রের পড়া ছিল নিশ্চয়ই—চোর যে অলক্ষ্যভাবে তাঁকে 'ফলো' করে আসছে, সে-বিষয়ে তাঁর অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আরো 'ফলো' করে তাঁর বাড়ী-টাড়ী জেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাটার বরাতে আরো বেশি ফলোদয় হোক, এটা তিনি পছন্দ করলেন না।

বাজে শিবপুরে কাজের লোকের আমদানি কেন যে বাপু? তিনি করলেন কি, হাওড়া-ব্রিজ পেরুনোর কালে, মাঝ-গঙ্গায় খুব ঘটা করে (চোরকে দেখানোর খাতিরেই—বুঝতেই পারছেন?) সেই অবশিষ্ট অসহায় একমাত্র পাম্পটিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন। দিয়ে, চোরকে কলা দেখিয়ে, তবেই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরতে পারলেন তিনি।"

"বাঃ! বাঃ! শরৎচন্দ্রের তো খুব বুদ্ধি ছিল!" তারিফ দিল গাড়ীর সবাই।

"বাঃ, বুদ্ধি থাকবে না? কতো বড়ো ঔপন্যাসিক তিনি! অতো বড়ো মনস্তাত্ত্বিক এদেশে আর

আলেপতা

জন্মেছে নাকি কখনো? সবার মনের খবর ওঁর নখদর্পণে থাকত। চোরকে দেখতে না পেয়েও, তার মনের কথা তিনি জলের মত পরিষ্কার দেখেছিলেন।” সায় দিলেন সেই ভদ্রলোক।

কিন্তু বলতে কি, অতো বড়ো মনস্তাত্ত্বিক না হয়েও, চোরকে যেন আমি চোখের ওপর দেখছিলাম! ওই গল্প-বক্তার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছিলাম যেন! তা নইলে, শরৎচন্দ্রের জুতো বিসর্জনের অত ঘটা উনি দেখলেন কি করে? ডিটেক্‌টিভ বই-টই কি আমারও এক-আধখানা পড়া নেই নাকি?

আমি কুটিল নেত্রে কথকের দিকে তাকাতেই তিনি জুতোর কথাটা চাপা দিলেন অন্য কথায়—

“পরের দিন শিশিরকুমারের আগমন হ’ল শরৎচন্দ্রের বাড়ী। তাঁর হাতে একটি প্যাকেট এবং মুখে প্রশ্ন: ‘বলতে পারেন শরৎদা’, কী আছে এর ভেতর?’

এখন, শরৎচন্দ্রের মত মনস্তত্ত্ববিদ্ দুনিয়ায় খুব বিরল ছিল। আপনারা যদি তাঁর গ্রন্থাবলী পড়ে থাকেন, তাহলে তার এন্তার পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর বইয়ের নায়ক-নায়িকাদের মনের কথা তিনি গণৎকারের মত বলে দিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্যাকেটের মন বলে কোনো বস্তু নেই—প্যাকেট্ তো আর প্রাণী নয়—মনস্বীও না—অতএব, তার অন্তরের কথা তিনি বাৎলাবেন কি করে? কাজেই, অত্যন্ত স্বভাবতই, তাঁর নিজের মনে তখন যে-তত্ত্বের উদয় হয়েছিল, প্যাকেটের মনস্তত্ত্বরূপে সেই কথাই প্রকাশ পেল।

‘কোনো খাবার-দাবার বুঝি?’ বল্লেন শরৎচন্দ্র।

‘না দাদা, আপনার সেই জোড়ক পাটি! কোন্ ফাঁকে আপনার কুশনের তলায় গিয়ে সেঁধিয়েছিল, আজ চেয়ারগুলো তোলা-নাড়ার সময়ে ধরা পড়ে গেছে। ফেরারী আসামীকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে পাকড়ে নিয়ে এলাম।’

এরপর শরৎচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব কিরূপ হয়েছিল, তা অনুমান করার ভার আপনাদের ওপর রইল। তাঁর গ্রন্থাবলী যদি পুনঃ পুনঃ আপনাদের পড়া থাকে, তাহলে তা টের পেতে আপনাদের খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।…”

এই বলে উক্ত ভদ্রলোক নিরস্ত হলেন।

আমি জুতো হাতে উঠে পড়লাম। গাড়ীর মধ্যে, এধারে-ওধারে চারধারে খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিলাম। এর-ওর বোঁচ্‌কা, পুঁটুলি, ট্রাঙ্ক, তোরঙ্গ, লটবহর নড়িয়ে-সরিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম। এমন কি, ঐ কথক ভদ্রলোককেও একবার তুলে দেখতে দ্বিধা করলাম না। কিন্তু নাঃ, কোথাও নেই—ঐ ভদ্রলোকের তলাতেও না!

● চটির সঙ্গে চটাচটি
শিবরাম চক্রবর্তী

একধারে গোটাকতক শিশি-বোতল জড়ো করা ছিল। সেগুলোকেও নেড়ে-চেড়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে দেখলাম। শরৎচন্দ্র শিশির-সৌজন্যে তাঁর হারানো মাণিক ফিরে পেয়েছিলেন, আমিও যদি এইসব শিশির দৌলতে পেয়ে যাই!

কিন্তু হায়, হাওড়া ষ্টেশনেই যে হাওয়া হয়েছে, তাকে উত্তরপাড়া পেরিয়ে কামরার মধ্যে বাগাতে যাওয়া বৃথা!

অগত্যা আর উপায়ান্তর না দেখে, এবং সেই একমাত্র স্লিপারকে বারম্বার দেখে-দেখে অসহ্য হয়ে উঠল। "ধুত্তোর!" বলে হতভাগাকে সবেগে জানালার বাইরে উধাও করে দিলাম। কারো আবেদন-নিবেদন, বাধা-নিষেধ, বাদ-প্রতিবাদে কর্ণপাত করলাম না।



"ধুত্তোর!"

শু-জুতোর সঙ্গে আমার ছোটবেলা থেকেই আড়ি। তাদের পরলেই আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে। তাই আধুনিক চটি—এই স্লিপারদের বরাবরই আমি ভালোবাসতাম। এভাবে চটাচটি করবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু এ রকম ব্যাভারের পর আর কাঁহাতক ভাব রাখা যায়?

যাক্ গে, বিয়ে-বাড়ীতে যখন যাচ্ছি, তখন জুতোর ভাবনা নেই—জুতোর অভাব হবে না। খালি পায়ে ফিরতে হবে না এটা ঠিক; এমন কি, কপালে থাকলে, শরৎবাবুর মতন দামী নরম পাম্পশুও পেয়ে যেতে পারি, চাই কি! সবাই কিছু এখনো এতো চালাক হয়ে যায় নি যে, ছেঁড়া ক্যাম্বিস পায়ে দিয়ে, আত্মরক্ষা করে আত্মীয়তা-রক্ষা করতে বেরিয়েছে!

শ্রীরামপুর ইষ্টিশনে নামলাম। ওমা, একি! গাড়ীর পাদানির ওপরে বসে—এ কে? শ্রীমান্ সেই স্লিপারই নয়?

চিনতে দেরি হ'ল না। তারই অপর পাটি!

———



পালোয়ানের দঙ্গলে

লেখক স্বয়ং একজন উচ্চশ্রেণীর মল্ল এবং ইংরেজী ও বাংলা বহু গ্রন্থের লেখক। শারীরিক ব্যায়াম-চর্চায় তিনি অতি উৎসাহী ও উৎসাহদাতা। এখনো বহু প্রতিযোগিতায় তাঁহার উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

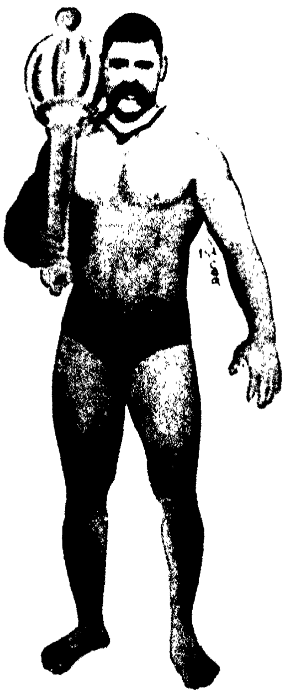
—শচীন্দ্র মজুমদার

১৯৪০ সালে যুদ্ধসহায়ক অর্থ-ভাণ্ডারের জন্য চারিদিকে নানা উপায়ে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা তোলবার ব্যবস্থা হতে লাগল। লোকের মনোরঞ্জন করে টাকা তোলার প্রথম উপায় হলো কুস্তি। কেননা এ প্রদেশের ইতর-ভদ্র সর্ব্বশ্রেণীর লোক কুস্তি দেখতে ভালবাসে, বিশেষ করে সাধারণ লোকেরা এর জন্য যথেষ্ট পয়সাও খরচ করে, কাজেই সরকারী লোকদের কুস্তির দিকেই নজর গেল।

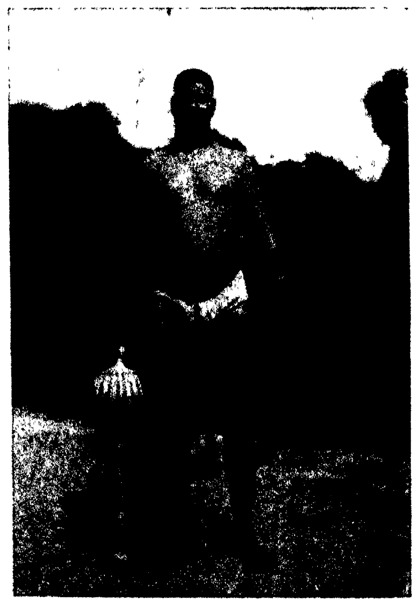
এলাহাবাদে এই রকম একটা দঙ্গলের ব্যবস্থা করবার জন্য আমাদের ডাক পড়ল। আমি স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধ-কাণ্ডের সচিব হলুম। টাকা-তোলা আমার লক্ষ্য ছিল না, আমার লক্ষ্য ছিল পালোয়ান-চরানো আর কুস্তি দেখার লোভ।

পালোয়ান সম্প্রদায়কে ডাক দেওয়া হলো আর **গামাকে** তাঁর দলবল নিয়ে আসবার জন্য তার করলুম, কিছু পাথেয় পাঠানোও হলো।

গামা এলেন আর তাঁর সঙ্গে এলেন **ইমাম**, **ছোট গামা**, **সাহাবুদ্দিন**, **হামিদা**, **লাল** বলে



গামা



ইমাম

গামার এক নবীন শিষ্য, ইমামের বড় ছেলে **ভোলো** এবং আরো পাঁচ ছেলে। অন্য দিক থেকে মন্দ-ভাল আরো অনেক মল্ল এল।

● পালোয়ানের দঙ্গলে
শচীন্দ্র মজুমদার

আহূত যারা, তারা ত' এলই,—রবাহূত মল্ল যা এসে জুটল, তাদের সংখ্যাও অল্প নয়।



হামিদা

তার ওপর স্থানীয় কুস্তিগীরের দল ত' ছিলই। দঙ্গল আরম্ভ হবার তখনো কয়েকদিন

দেরী, সারা শহরটা বলবান পুরুষে ছেয়ে গেল। ধর্ম্মশালা, রেল-ষ্টেশনের ছাউনি, এমন কি গাছতলাতেও কেবল পালোয়ানী পাগড়ী দেখা যেতে লাগল।



সাহাবুদ্দিন ও হামিদা

গামার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। চমকে গেলুম দেখে! একি বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ, না নব-যুবক! পূর্ণ-প্রস্ফুটিত গোলাপের মত মুখ, তেম্‌নি স্বাস্থ্যের রং আর চমৎকার স্বচ্ছ চোখ! চোখ দু'টি হীরের মত উজ্জ্বল!

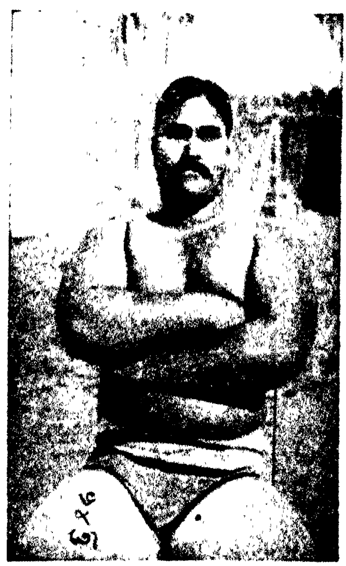
পালোয়ানদের জোড় ঠিক করা অতিশয় কঠিন কাজ। এ কাজ যার-তার নয়, বিরাট-চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা না থাকলে, এই যাচাই করা কাজ অসম্ভব। আমার সহায়ক ছিল বৃদ্ধ মজফ্‌ফর পালোয়ান। সে-ই আমার ডান হাত ছিল সর্ব্ব-বিষয়ে। মজফ্‌ফর Master of Ceremonies, Announcer, সহকারী বিচারক—সবই ছিল। আখড়ায় উঠে কুস্তি চালাত।

মজফ্‌ফরের কথা আমার লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এই বৃদ্ধটির কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি, অনেক ধমকানি ও কটু কথা শুনেছি। সে আমাকে অনেক সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ভুলের ও বিধার হাত থেকে রক্ষা করেছে অনেকবার।

এই দুর্ম্মুখ কটুভাষী লোকটিকে গামা পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কারণ, মজফ্‌ফর

এ-অঞ্চলের নাম-করা খলিফা। আটাত্তর বছর বয়সেও সে আমার Master of Ceremonies-এর কাজ করেছে, যদিও আমার ধারণা ছিল তার বয়স বছর ষাট। গত বছর বিরাশি বছর বয়সে এই ক্ষিপ্রগতি অতিশয় কর্মঠ মানুষটির মৃত্যু হয়েছে।

এ দঙ্গলে আমার নতুন কিছু করবার ইচ্ছা ছিল, করলুমও তা। আমার মনে চিরদিন দুঃখ ছিল, যে আখড়া আমরা নির্ম্মাণ করি, তাতে আর সব জাতির ছেলে মাটি মেখে যায়; মাখে না কেবল বাঙালীর ছেলে, তারা কেবল পাউডার-স্নোই মাখে!



ভীম ভবানী

অথচ সাহসে বা শক্তিতে বাঙালীও যে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ **ভীম ভবানী, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোবরবাবু।**

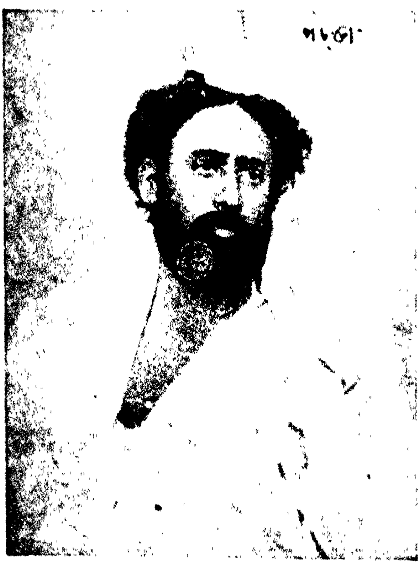
আমি এঁদের সকলকেই দেখেছি। শ্যামাকান্তবাবুকে দেখেছি আমার শৈশবে; ভীম ভবানীকে দেখেছি এমন বয়সে যে-বয়সে আমার বুকের ভেতর বলবান্ হবার স্পৃহা উঁকিঝুঁকি মারতে সুরু করেছিল। আর গোবর-বাবু? তিনি তো আমার সহপাঠী, বাল্যবন্ধু, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বেশী-কিছু পরিচয় একেবারেই অনাবশ্যক।

অস্ত্রহীন শ্যামাকান্ত যে [illegible] সাহসে পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করে গিয়েছেন, আজও তা পৃথিবীর এক [illegible]ম বিস্ময় হয়ে আছে! আর দুটি বিরাটকায় হস্তীকে বুকে চড়িয়ে ভীম ভবানী বলীদের জগতে এক ঈর্ষ্যার সৃষ্টি করে গিয়েছেন!

● পালোয়ানের দঙ্গলে
শচীন্দ্র মজুমদার

এ দু'জনের কেউই আজ জীবিত নেই। কিন্তু গোবরবাবু আজও কলিকাতা সহরে জীবিত থেকে শক্তি-পূজারী বাঙালী যুবকদের গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন।

হাতী বুকে-তোলা বা আরো অনেক খেলায় ভীম ভবানী অবশ্য প্রসিদ্ধ মাদ্রাজী পালোয়ান রামমূর্ত্তিকে অনুসরণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রামমূর্ত্তিকে অনুসরণ করলেও, ভীম ভবানী অনেক বিষয়ে তাঁকে ছাড়িয়েই গিয়েছিলেন!



শ্যামাকান্ত

আমাদের দর্শকদের দলেও বাঙালীর সংখ্যা ছিল নামমাত্র। মনে পড়ে, একবার দশ হাজার দর্শকের মাঝে আমি একা বাঙালী ছিলুম, তারজন্য আমার এক স্কচ্‌ বন্ধু টিট্‌কারি করে বলেছিলেন—Mazumder, are you representing your community? Have you no young men among the Bengalees here?

বাংলাদেশে এক সময় ব্যায়াম-চর্চ্চা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তারপর কিছুকাল বাংলার বুকের ওপর দিয়ে যেন একটা বিস্মৃতির যুগ চলে গেছে! সুখের বিষয়,—আজকাল তবু কিছু বাঙালী ভদ্রসন্তান মাটি মাখতে শিখছে!

সে যাহোক, আমি কয়েকটা শৌখিন অর্থাৎ অ্যামেচার কুস্তির ব্যবস্থা করলুম। এখানকার পক্ষ হলো এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছেলে, আর একটি কাশী হিন্দু



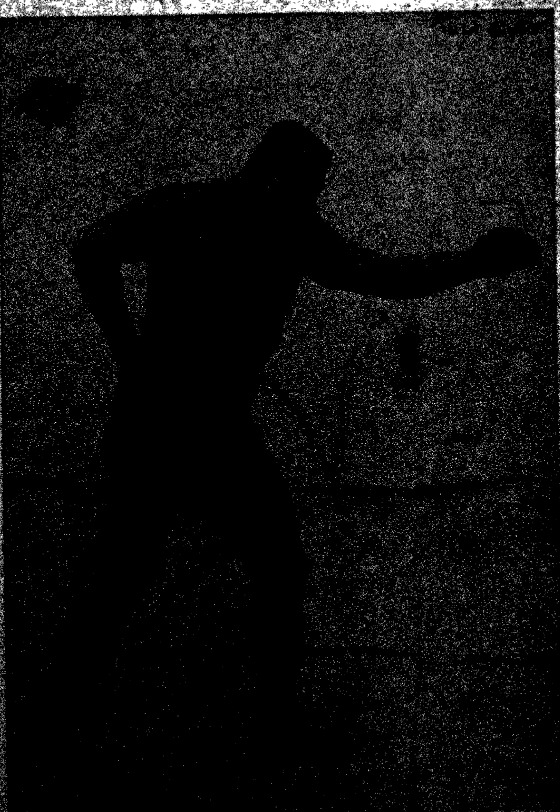
বিশ্ববিদ্যালয়ের। বন্ধু গোবরবাবুই এ বিষয়ে আমার একমাত্র ভরসা। তাঁকে লিখলুম, তাঁর ছেলে **মাণিককে** পাঠাতে; কেননা, মাণিক ভারতের শ্রেষ্ঠ অ্যামেচার, তার লড়াইয়ের ধরণ পেশাদারী পালোয়ানের মত সম্পূর্ণ আর নিখুঁত। আমি জানতুম, তাকে দিয়ে শুধু আমার মর্য্যাদা থাকবে না, বাঙালীরও মুখরক্ষা হবে।



রামমূর্ত্তি

গোবরবাবু দেশভক্ত মানুষ; মাণিককে পাঠালেন না, পাঠালেন বনমালীর ভ্রাতুষ্পুত্র **অনাদিকে**। তাকে লড়তে দেখেছিলুম অনেকবার, আর তাদের বংশেও কুস্তির চর্চ্চা আছে; আমি অনাদিকে স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু তাকে আমি যখন-তখন জিজ্ঞাসা করতুম—"বাবাজী, আমার মুখ রাখবে ত'? যে আখড়ায় তুমি উঠবে

[illegible] গোবরবাবু [illegible] কোটি-কোটি [illegible]
[illegible]।



শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে, এই বৃদ্ধ বয়সেও গামা ও ইমামের দেহ ও দেহযন্ত্র যে কত নিখুঁত, তা একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায়। গামার ব্লড-প্রেশর—যুবকের ব্লড-প্রেশর, মাত্র ১৩৫ ; শ্বাস প্রশ্বাসের হিসাব ১৮, তাও যুবজন-বাঞ্ছিত ; নাড়ীর গতি ৭৮, সেটাও যুবকদের হার মানায়। এর মানে, গামার দেহাভ্যন্তরে আছে নিবিড় যান্ত্রিক সামঞ্জস্য আর শান্তি। ইমামের ব্লড-প্রেশর ১৫৫।

ইমামের ষোল বছর বয়সের ছেলে ভোলোকে দেখে আমার চক্ষু জুড়িয়ে গিছল। কি চমৎকার গঠন এই সুদর্শন ছেলেটির! ইতিমধ্যেই সে পাঁচশো টাকার জোড় লড়বার উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল! কি রক্ত তার দেহে বইছে, তা এ-কথায় জানানো হবে যে, আমাদের দঙ্গল হবার কিছুকাল আগে ভোলো ভাওয়ালপুরে পাশ্চাত্ত্য মল্ল **জিবিস্কো ম্যালিনোভিচ্‌কে** পাঁচ মিনিটে হারিয়েছিল। ভোলো **হামিদার** সঙ্গে ভাওয়ালপুরে প্রায়ই থাকে। হামিদা এই রিয়াসতের মাইনে-করা মল্ল।



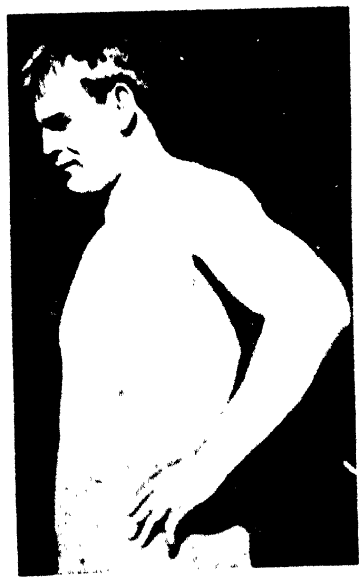
জন্‌ জেম্

আর একটি ছেলেকে দেখে আমার চোখ জুড়ল, তার নাম **লাল**। তখন তার আঠার-উনিশ বছর বয়স। লাল আমার আত্মীয় ও শিষ্য। ছেলেটি খুব ভদ্র। গামার দলের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকেই ওস্তাদের মত বিনয়ী ও সজ্জন। প্রত্যেকেই আখড়ায় অকুতোভয় দুর্দ্ধর্ষ মল্ল, কিন্তু বাইরে নম্র ভদ্রলোক।

প্রথম দিন বোধ করি, লালের সঙ্গে এক বিরাটকায় জাঠের কুস্তির ব্যবস্থা করে-ছিলুম। জাঠ-মল্লটির মুখ আর দেহ আমার মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। লালের দৈহিক গঠন মনোহর ; কিন্তু জাঠটা যে বিশেষ বলবান আর কৌশলী, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ ছিল না। একটু পঁয়তাড়ার পর লাল আক্রমণ করে, তারপর অতবড় মানুষটাকেও নিজের নীচে নিয়ে এল। তার দাঁও এত সাফ্ যে, তাকে দাঁও না বলে

কুস্তির আর্টিস্টের খেলা বলাই ভাল। ধস্তাধস্তির চিহ্ন পর্যান্ত সে যুদ্ধে কোথাও ছিল না ; পাঁচ মিনিটেই লাল জয়ী হল।

চারদিনে ইমামের পাঁচটি সুশ্রী নধরকান্তি ছেলে নিজের-নিজের পালায় অবলীলায় জয়ী হল। তাদের বয়স ছোট হলে কি হয়, বাপ-জ্যাঠার চালচলন ভঙ্গী তাদের বংশগত গুণ আর শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক।



ফ্রাঙ্ক গচ্

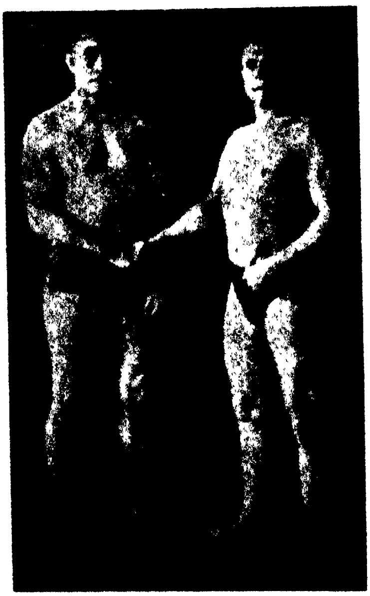
ভোলোকে সেবার লড়াতে পারলুম না ; কারণ, ছোকরা এখানে এসেই জ্বরে পড়ল। সে জ্বর-গায়েই লড়তে প্রস্তুত, আমার কাছে আব্দার করত, কিন্তু গামা তাকে লড়তে দিলেন না।

ভোলোর বয়স এখন একুশ বছর। গত বছরও গামার মুখে তার যা উন্নতির কথা শুনেছি,—**ঘোঁসার** মত পালোয়ানকে হারান অনেকখানি কথা,—তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ভোলো তার পূর্ব্বপুরুষের মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম ভাল করেই রক্ষা করতে পারবে।

আমার মন পড়ে ছিল অনাদির ওপর, অর্থাৎ মনে কিছু আশঙ্কা ছিল। ইমামের মেজো ছেলে যখন লড়ছিল, অনাদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—কিহে, একে বাগাতে পার ?

● পালোয়ানের দঙ্গলে
শচীন্দ্র মজুমদার

সে মাথা নীচু করে ছিল। আমিও তা সম্ভব মনে করিনি অবশ্য। প্রথম দিন এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছেলে অনাদির প্রতিদ্বন্দ্বী হল। এ জোড়টা অসম, কারণ অনাদি ওজন ও গঠনে তার বিপক্ষের চেয়ে অনেক ভারী ও বড় ছিল। যাহোক, আমার ভয় ছিল, এই আবেষ্টনে ছোকরার stage fright না হয়! কলকাতায় ছাত্র-লড়িয়েদের মাঝে অলিম্পিক তোষকের ওপর লড়া এক, এ অন্য ব্যাপার। অনাদির তা কিছু হয়নি। সে সোজাসুজি ঢাক মেরে বিপক্ষকে নীচে এনে সাদামোটা বংলি দিয়ে গায়ের জোরে তাকে চিৎ করে দিলে।



ডাঃ রোলার ও হেকেন্‌স্মিথ

দ্বিতীয় দিনে সে বোধ করি কাশীর ছেলেটির সঙ্গে লড়েছিল। গোড়ার মিনিট-ছয়েক অনাদি সুবিধা করতে পারে নি, এক সময়ে তার অবস্থা সঙ্কটাপন্নই হয়েছিল—তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে নীচেই রেখেছিল। কাশীর ছোকরাটি একবার একটা ভুল নয় প্রমাদ করলে; অনাদি সেই সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল, তারপর তাকে জয় করলে। এ কুস্তিটা মিনিট দশেক হয়েছিল এবং শেষের দিকে অনাদির কুস্তি মন্দ হয়নি। তৃতীয় দিনেও তার জয় হল সহজেই। অনাদির তৃতীয় বিপক্ষ তার শক্তি ও কৌশলের উপযুক্ত ছিল না। বলা বাহুল্য, আমি অনাদির কুস্তির বিচারক ইচ্ছা করেই হইনি, কারণ, সে আমার অতিথি ছিল।

● পালোয়ানের কবলে
শচীন্দ্র মজুমদার

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হলেও অনাদির নাম এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করে আমি খুশি ; কারণ, ভারতীয় মল্লের এই তালিকায় গোবরবাবু ছাড়া অন্য বাঙালীর নাম নেই। আর যাই হোক না কেন, অনাদি প্রকৃত আখড়ার মাটি গায়ে মেখেছে, সেটা মস্ত কথা! প্রকৃত দঙ্গলে যদি ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা থাকে এবং তাতে বাঙালীর ছেলেও জয়-পরাজয়ের মাটি মাখতে পারে, তাতে আর কেউ না পাক্—আমি সত্যই প্রভূত আনন্দ পাব।



বিক্কো

শেষদিনে পূরণ ও হামিদার কুস্তি ; দর্শকে দর্শকে আখড়ার সব গ্যালারী ভরে গেল। দু'জনে ওরা যেমন কালো, তেমনি বিরাটাকার। হামিদার দেহের আগে বেশ আঁট-বাঁধন ছিল ; বিয়ের পর থেকে এই মল্লটি দারুণ মোটা হয়ে গেছেন, বিয়েটাই অবশ্য কারণ। তা হলে কি হয়, তাঁর মত কুস্তিবাজ পালোয়ান এখন আর কেউ নেই।

গামা ও ইমাম বর্তমান থাকতেও হামিদাই যে এখন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত দু'জন এখন গুরুর দলে, প্রতিযোগিতায় কেউ নয়, এবং তাঁদের আর নিজেদের শক্তির প্রমাণ দেবারও কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, পাশ্চাত্য মল্লদের সঙ্গেও তাঁদের পরীক্ষা হয়ে গেছে অনেক আগেই, এবং তাঁরা সগৌরবে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছেন।

● পালোয়ানের সন্ধানে
যতীন্দ্র মজুমদার

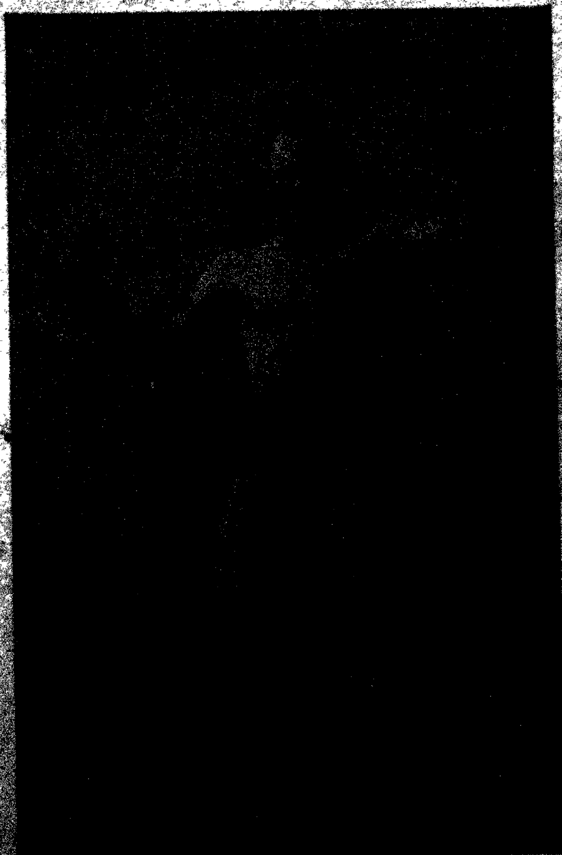
[illegible] বোস, [illegible] বসু, ডাক্তার [illegible], হেবেল মিত্র, [illegible] [illegible], [illegible] ইত্যাদি পাশ্চাত্য [illegible], পরাজিত হয়ে বহু পূর্বেই ভারতীয় [illegible]—[illegible] ও [illegible] [illegible] করেছেন। সুতরাং [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] প্রয়োজন হয় না। ভারতের [illegible] জন্য এখন যদি [illegible] তার



[illegible]

[illegible]

হাসিরা ও পুরো খাবড়ায় ঢুকলেন। সে কি বিরাট ব্যাপার। ইঁদুরের মিছিল



ওজন বোধ করি মণ-ছয়েক হবে। ছোঁয়ামাত্র হামিদা পূরণকে মাটিতে পেড়ে ফেল্লেন। গজযুদ্ধ একেই বলে। কিন্তু পূরণ সেই যে মাটি আঁকড়ে রইল, আর নড়ে না, কিছু করবারও চেষ্টা করে না। কেবল মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে হামিদার কৃপার অপেক্ষা করতে লাগল। যখন কিছুতেই এই মানব-হস্তীকে নাড়ানো গেল না—তখন হামিদা ঘোড়ায় চড়ার মত পূরণের পিঠে সওয়ার হয়ে অপূর্ব্বভাবে তাকে চিৎ করে দিলেন। এত চমৎকার প্যাঁচের কায়দা দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

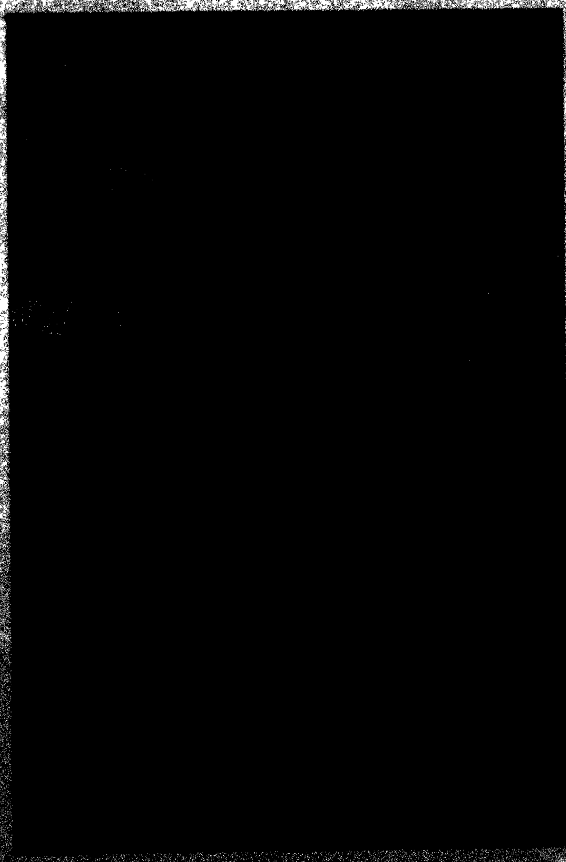
তারপর আরম্ভ হল ওস্তাদদের প্রদর্শনী কুস্তি। ছোট গামা আর সাহাবুদ্দীন আখড়ায় উঠলেন।

এই সাহাবুদ্দীনকে একদিন লড়তে দেখেছিলাম হামিদার সঙ্গে। বিশাল-বপু সাহাবুদ্দীন ও মহামল্ল হামিদার সে লড়াই যাঁরা দেখেছিলেন, একমাত্র তাঁরাই সে বিষয়ে একটু ধারণা করতে পারবেন, অপরের পক্ষে তার কল্পনা করাও অসম্ভব! কিন্তু সেই সাহাবুদ্দীন আর নেই। সাহাবুদ্দীন এখন বুড়ো হয়েছেন, দেহের চামড়া শিথিল হয়ে গেছে, আর পূর্ব্বেকার আঁটসাঁট বিরাটত্ব নেই।

ছোট গামাকে এবার আমি প্রথম দেখলুম। তাঁর কথা আর কি বলব! দু'দিন তিনি একা চেপে আমার বাড়ী এসেছিলেন। শেষদিন একাওয়ালা আর তাঁকে ফেরৎ নিয়ে যেতে চাইলে না, অতবড় বোঝা টেনে তার ছোট্ট ঘোড়াটি হিমসিম খেয়ে গিছল!

এঁরা কিছুকাল দাঁওপ্যাঁচ করবার পর, গামা ও ইমামের পালা এল। আমার পাশে তখনকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বসেছিলেন, তিনি আমার কথা বিশ্বাসই করলেন না যে, গামার বাষট্টি বছর বয়স! তিনি বল্লেন, বছর চল্লিশের বেশি হতে পারে না। সেই আমার গামা-ইমামের শেষ কুস্তি দেখা; জীবনে বোধ করি সে সুযোগ আর কখনো হবে না।

সিংহ দেখেছি চিড়িয়াখানায়, কিন্তু সিংহ-বিক্রম কখনো দেখিনি। মানুষ যদি সে বিক্রম আয়ত্ত করে থাকে, তাহলে আমি বলব, এই দু'টি ভাই তা করেছেন! ইমামের বয়স তখন ঊনষাট, আর গামার বাষট্টি। রাখতে জানলে এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ



আগেকার পাতিয়ালা মহারাজ মারা যেতে তাঁর ছেলে যখন রাজা হন, তখন গদিতে বসেই তিনি রাজ্যের অনেক বৃথা খরচ কমাতে লাগলেন। একদিন তাঁর গামার ওপর নজর পড়ল। গামাকে ডেকে তিনি বল্লেন, ওস্তাদ, তুমি বুড়ো হয়েছ, এবার পেন্সন নাও।

গামা পাতিয়ালা-রিয়াসতের চাকুরে, পাঁচশো টাকা মাইনে পান, ইমামও তাই—তবে ইমামের মাইনে সাড়ে তিনশো টাকা। গামা অকালে তাঁকে বৃদ্ধ বানাবার ফিকির দেখে সবিনয়ে উত্তর দিলেন, বেশ, আমি যে বৃদ্ধ, তা সপ্রমাণ করুন আগে ; আমি পেন্সনও চাইব না, অমনি চলে যাব। ছ'মাস সময় দিলুম, পৃথিবীর যে-কোন স্থান থেকে মল্ল খুঁজে আনুন। হারানো ত' দূরের কথা, আমার সঙ্গে সমান-সমানও যদি কেউ হয়, আমি মহারাজকে সেলাম জানিয়ে হৃষ্টচিত্তে অবসর নেব।

বলা বাহুল্য, গামাকে এখনো পেন্সন নিতে হয়নি। এখন তাঁর বয়স সাতষট্টি বৎসর। পেন্সন নিলেও দু'ভায়ের অন্নচিন্তার কারণ হবে না ; কারণ, দুজনে ওঁরা আট লাখ টাকা রোজগার করেছেন। শিষ্য পোষার খরচ আছে অবশ্য, তা ছাড়া দুজনেই ওঁরা খুবই মিতব্যয়ী।

যুদ্ধ-ফাণ্ডে টাকা তোলবার জন্য এর পর কলকাতায় দঙ্গল হলো। গামার দল সেখানে আহুত হয়েছিল আর উপস্থিত ছিল গুঙ্গার দল। এ দঙ্গলে অনেক গণ্ডগোল হয়েছিল। ইমাম ১৯১৮ সাল থেকে ভারতের রুস্তম, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বীর ; দেশী-বিদেশী কেউ তাঁকে স্থানচ্যুত করা দূরে থাক, নিমেষের জন্যও টলাতে পারেনি। গুঙ্গাকে ত' তিনি আগেই বাতিল করেছিলেন ! নূতন দলের ক্রেমার ও হরবন্স সিংও তাঁর কিছুই করতে পারেনি। অথচ অকারণে বর্দ্ধমানের পরলোকগত মহারাজা প্রভৃতি ইমামকে সম্মানচ্যুত করে, গুঙ্গার গলায় রুস্তমের সোনার মালা দিলেন !

কাজটা অধিকার-বহির্ভূত ও অন্যায় হয়েছিল। গুঙ্গা বোবা হলেও এতে তাঁর লজ্জা হয়েছিল নিশ্চয়ই। গামার দল এ-দঙ্গল পরিত্যাগ করে ভালই করেছিল। আমিও অবশ্য সে সময়ে এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলুম।

গামা ও ইমাম আজও বেঁচে আছেন, কিন্তু গুঙ্গা আর বেঁচে নেই। গুঙ্গার মৃত্যু হয়েছিল বীভৎস ও ভীষণভাবে।

রেল ছাড়া শিয়ালকোট থেকে লাহোরে মোটর-বাসেও যাওয়া যায়, ওদিকে



উপবিষ্ট : বাঁয়ে গামা ; মাঝখানে লেখক শচীন্দ্রবাবু ; ডাইনে ইমাম বক্স।
দণ্ডায়মান : বাঁয়ে হামিদা ; ডাইনে ছোট গামা।

বাসের চলাচল খুবই বেশি। শিয়ালকোট পেরিয়ে লাহোরের পথের ওপর গুঙ্গাদের উগোকী গ্রাম। সেদিন গুঙ্গা ভাইদের সঙ্গে লাহোর যাচ্ছিল। লাহোরের কাছাকাছি একস্থানে গাড়ীটা হঠাৎ উল্টে যায় আর গুঙ্গার একটা পা সেই ওল্টানো

গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে। সে জোর করে নিজের পা'টা টেনে বার করে নেয়; কিন্তু পা বেরোল বটে, উরুর সব মাংসটুকু সে অসীম শক্তিপ্রকাশে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাসের তলায়ই থেকে গেল। পথের ধারেই ভীষণ রক্তস্রাবে এই অসীম বলবান পুরুষটির অকালে শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তার স্থান আর কাউকে দিয়ে পূর্ণ হবে, এ আশা আমার নেই।

গুঙ্গা একদিন ইমামের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। হামিদার কাছে তার টেক্‌নিক্যাল পরাজয় ঘটেছিল বটে কিন্তু সুরা জগতেও আর হামিদার এই মূক-বধির মল্লটির মত কোন বিশিষ্ট প্রতিযোগী রইল না।

মনে পড়ে, একদিন গামার সঙ্গে দেখা করতে গিছলুম, গামা তখন বেড়াতে গেছেন। ইমাম মাংস রান্না করছিলেন, তাঁর সঙ্গেই গল্প জুড়ে দিলুম। গুঙ্গার কথাও হলো।

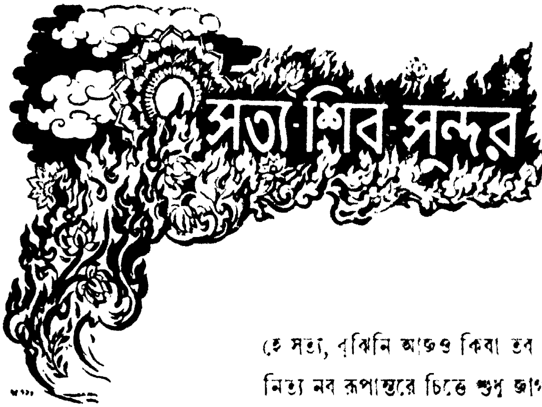
খানিক পরে গামা এলেন, হাসিমুখে কোলাকুলি করলেন। কোলাকুলি করতে বেশ লাগে, দেহে রোমাঞ্চ হয়; কিন্তু মনে হয়, কৈলাস পর্ব্বতকে যেন আলিঙ্গন করছি!

একটু পরে ভোলো ছাড়া ইমামের অন্য পাঁচ ছেলেও এল। তারা এখন বেশ বড়-সড় হয়েছে, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল! মনে ভাবলুম, আমরাও ত' নিজের ছেলেদের খেতে দি, তাদের এমন সুস্থ সুন্দর রাজোচিত রূপ হয় না কেন?

আঁধারে আলো

- বন্ধুদের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠতা করো না যাতে সে যদি কোনদিন শত্রু হয়ে ওঠে, তুমি ব্যথা পেতে পার।

—প্রাচীন পারস্য-উপদেশ



—"বনফুল"

হে সত্য, বুঝিনি আজও কিবা তব সত্য-পরিচয়
নিত্য নব রূপান্তরে চিত্তে শুধু জাগাও বিস্ময়,
সূক্ষ্ম বাষ্প-কণা-তনু, সেই মেঘ, ইন্দ্রধনু,
শুভ্র-কান্তি হিমানী শীতল,
চঞ্চল-তরঙ্গ-ভঙ্গা সেই না কি সিন্ধু, গঙ্গা,
জানি না কাহারে বলি জল !
অনুভবে মনে হয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে থাকি'
শুদ্ধ সন্ধানীর লাগি' জেগে আছ একান্ত একাকী।
বুঝিলাম—নাহি বুঝিলাম,
হে নিশ্চিত, হে বিচিত্র, বহুরূপী, হে ধ্রুব-চঞ্চল,
তোমারে প্রণাম !

●

হে শিব, হে মহেশ্বর, হে সদা-জাগ্রত মহাকাল,
জীবনে করিছ রক্ষা ধ্বংস করি' জীবন-জঞ্জাল।
নীলকণ্ঠ, গঙ্গাধর, প্রসন্ন পুরুষবর,
দগ্ধ করি' প্রমত্ত মদনে
তোমার সৃষ্টির সাম পার্ব্বতীর মনস্কাম
পূর্ণ করে অতীব যতনে,

জন্ম লভে যুগে যুগে কাত্তিকেয় দৈত্য-নিসূদন,
মুক্তি লভে বসুন্ধরা ছিন্ন করি' পাপের বন্ধন,
সৃষ্টি-স্রোত বহে অবিরাম
হে সন্ন্যাসী, হে শঙ্কর, উদাসীন, হে রুদ্র-কোমল,
তোমারে প্রণাম !

●

হে সুন্দর, মনোহর, হে অনন্ত-আনন্দ-কারণ,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত রূপ-নারায়ণ
অপূর্ব্ব বিচিত্র সাজে নিখিলের মর্ম্মমাঝে
রচিয়াছ রূপকথা-লোক,
রূপ ফোটে, রূপ জ্বলে, রূপ হাসে, রূপ গলে,
রূপে রূপে ভ'রে যায় চোখ !
অসুন্দর কিছু নাই—যাহা আছে দেখিবার ভ্রম
অনবদ্য নিষ্কলুষ দিব্যরুচি নিত্য নিরুপম
লীলা-মূর্ত্ত তুমি অভিরাম,
হে আনন্দ, অপরূপ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সত্য-শিবাধার,
তোমারে প্রণাম !

শেষ


CALCUTTA
সূচী-পত্র